প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ (স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

Semester : I PGJMC

কোর কোর্স - 3

CC-3 (মিডিয়া আইন এবং নীতি)

মডিউল	কনটেন্ট রাইটার (Content Writer)	সম্পাদনা (Editor)
মডিউল ১	ড: সৌরভ গুপ্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ , ওড়িশার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী স্নেহাশিস সুর প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা
মডিউল ২	একক ১.২ শ্রী সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	
একক ৩.৪	শ্রী অরিজিৎ ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন),মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল ৩	একক ১.২ শ্রী সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	
একক ৩,৪.৫	শ্রী অরিজিৎ ঘোষ	
মডিউল ৪	ড: রীমা রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, আশুতোষ কলেজ	

PGJMC

স্নাতকোত্তর বিষয়ে সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়
প্রফেসর, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

ড: দেবজ্যোতি চন্দ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন), মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মনন কুমার মণ্ডল
ডিরেক্টর,মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী স্নেহাশিস সুর
প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা

ড: পল্লব মুখোপাধ্যায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

শ্রী অরিজিৎ ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন), মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

কোর কোর্স - 3 (মিডিয়া আইন এবং নীতি)

CC - 3

মডিউল ১ মিডিয়া নীতি

একক	১	গণমাধ্যমের নীতি ও আইন- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা-গণমাধ্যমের	7-15
একক	২	গণমাধ্যম এবং নীতিগত সমস্যা —	16-27
একক	৩	পীত সাংবাদিকতা-চেকবুক সাংবাদিকতা -পেইড নিউজ- ফেক নিউজ-Plagiarism	28-36
একক	৪	গণমাধমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ-ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত আচার সংহিতা - অন্যান্যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আচার সংহিতা — ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত আচার সংহিতা	37-51

মডিউল ২ ভারতের প্রেস / মিডিয়া আইনগুলির ইতিহাস

একক	১	ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক ধারণা	52-60
একক	২	সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন ১৮৬৭, সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭	61-67
একক	৩	আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান; সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা প্রতিরক্ষা	68-72
একক	৪	মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা - ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ	73-80

মডিউল ৩ প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক	১	মানহানি ও সাংবাদিকতা প্রতিরক্ষা - আদালত অবমাননা এবং সাংবাদিকতা প্রতিরক্ষা - রাষ্ট্রদ্রোহের রেফারেন্স সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ	81-85

একক	২	কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫ - মহিলাদের অশোভন প্রতিনিধিত্ব নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬	86-89
একক	৩	ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার আইন, কপিরাইট আইন, ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন সহ - তথ্য অধিকার আইন ২০০৫- হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)	90-97
একক	৪	সিনেমাটোগ্রাফ আইন ১৯৫৩ - প্রসার ভারতী আইন - বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির বিধি-কেবল টিভি রেগুলেশন আইন- ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন - কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি - ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি -আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড -বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ	98-107
একক	৫	বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগের জন্য কোডগুলি	108-113
মডিউল	৪	**সাইবার আইন**	
একক	১	ডিজিটাল সময়ে প্রেসের স্বাধীনতা	114-123
একক	২	ডিজিটাল মাধ্যম ও সংপ্রশ্ন	124-144
একক	৩	মুক্ত মাধ্যম ও সংপ্রশ্ন (চ্যালেঞ্জ)	145-156

মডিউল - ১ : মিডিয়া নীতি

একক : ১ ❐ গণমাধ্যম-এর নীতি ও আইন

গঠন :

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ গণমাধ্যম-এর নীতি ও আইন

১.১.৪ গণমাধ্যম-এর স্বাধীনতা

১.১.৫ গণমাধ্যম-এর সামাজিক

১.১.৬ গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণ

১.১.৭ সারাংশ

১.১.৮ অনুশীলনী

১.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে সেগুলো হলো :

- গণমাধ্যমে নীতি এবং আইনের তাৎপর্য
- গণমাধ্যমের নীতি এবং আইন-এর পার্থক্য
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতার তাৎপর্য
- গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা
- গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণের পরিধি

১.১.২ প্রস্তাবনা

যোগাযোগ জ্ঞাপন-এর প্রাথমিক চাহিদা থেকেই জ্ঞাপন-এর প্রক্রিয়া মানুষ অবলম্বন করে। শরীরী ভাষা একসময় বিকশিত হয় কথ্য, ভাষায় এবং লিখিত রূপে। মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন-এর সাথে সাথেই জ্ঞাপন পরিণত হয় গণ জ্ঞাপনে; ক্রমে ক্রমে আসে গণমাধ্যম-এর বিভিন্ন রূপ। যেমন সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেতার, টেলিভিশন এবং বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়া। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক মিশনারী আদর্শে প্রাণিত হয়ে সম্পাদক ও সম্পাদিকা তাঁদের কাজ করেছিলেন। ক্রমে শিক্ষা এবং তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে এক পেশা ও বৃত্তি। সংবাদপত্র

এক শিল্পের আকার নেয়। জ্ঞানার্জনের সাথে সংঘর্ষ জুড়ে আদর্শের নীতি তৈরি হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্র সংবাদত্র ও সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নিরন্তর চালায়। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা সরকার বিরোধীতাকে রুখতে একের পর এক আইন প্রণয়ন করে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সংবাদ শিল্পের ধরন–ধারণ করায় এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মেলাতে এবং গণমাধ্যমের সাথে দেশ রাষ্ট্র ও সামজের বাকি অংশের ভারসাম্য রাখতে প্রণয়ন হয়েছে আরো আইন। ব্যবসায়ীক প্রতিষংান হিসেবে সংবাদমাধ্যমের উত্থানের সাথে সাথে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো নীতি ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার আদর্শবাদী ভাবনা ও নীতি এখন এক ইতিহাস। 'মিশন' অনেক ক্ষেত্রেই 'কমিশনে' পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু নীতির সাথে জড়িত রয়েছে দায়বদ্ধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা। নীতির প্রশ্নে, মূল্যবোধের প্রশ্নে নমনীয়তা সংবাদ মাধ্যমের অস্তিত্বের উপর এই প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিতে পারে। তাই, এর সবিশেষ পর্যালোনা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন যা এই এককের মূল উপপাদ্য।

১.২ গণমাধ্যম-এর নীতি ও আইন

এথিক্স (Ethics) অথবা নীতির জন্ম সভ্যতার গোড়াপত্তনের দিন থেকেই। কারণ তা মানুষের একক তথা সমাজের যৌথ চরিত্রের সাথে জড়িত। সভ্যতার বিকাশে সমাজজীবনের পরিকাঠামোও প্রসারিত হয়েছে। জ্ঞান ও দর্শনের অন্যতম শাখায় যুগে যুগে পণ্ডিতদের ভাবনাচিন্তার হাত ধরে বিকশিত হয়েছে নীতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা। নীতির যেমন এক তাত্ত্বিক রূপ আছে, তেমনি ব্যবহারিক রূপও আছে। প্রতিদিন ব্যক্তি মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে নানা রকমের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন যেমন হয়, তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজকে যুক্ত করে জীবন ও কর্মকারড পরিচালনার জন্য নীতিগুলো অনুসরণ করতে হয়। নানা পরিস্থিতি, দেশ-কাল-সীমানার পরিস্থিতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিবর্তিত হয় নীতি।

প্রাচীন গ্রিসে দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে নীতিশাস্ত্রেরও আলোচনা শুরু হয়। সক্রেটিস প্রশ্ন ও বিতর্কের উপরে জোর দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য ছিল যে প্রতিটি মানুষের ভেতরে নিজস্ব সত্ত্বা আছে যাকে বিতর্ক পর্যালোচনার মাধ্যমে আবিষ্কার করতে হবে। রাষ্ট্রের বলে দেওয়া নীতির প্রতিবাদে এক ব্যক্তিগত নীতি ন্যায় বোধ গড়ে তোলা উচিত।

বলাবাহুল্য সক্রেটিস দেবদেবীদের অস্তিত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এথেন্সের শাসকদের রোষে পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণিহত হন।

সক্রেটিসের সুখোযাগ্য ছাত্র, এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, প্লেটো নীতির প্রশ্নে যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে নীতি গণিতের মতোই পৃথিবীতে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং তা রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সমান, কিন্তু আলাদা নয়। তার সুগঠিত বৈপ্লবিক গ্রন্থে প্লেটো এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তারছাত্র আরেক বিখ্যাত দার্শনিক তাত্ত্বিক, অ্যারিস্টোটল কিন্তু নীতির প্রশ্নে অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। অ্যারিস্টোটল মনে করতেন দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি ও পরিস্থিতি অনুসারে নীতির প্রণয়ন করে থাকেন। তিনি মানুষকে নিজের কর্মের প্রতি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ থাকার কথা বলেছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের থেকে অনেক প্রাচীন। ঋকবেদে আমরা ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মের বিস্তারিত আলোচনা পাই। হিন্দু পুরাণে, বিশেষতঃ শ্রীমৎভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণেরর মুখনিঃসৃত বাণী 'কর্মণ্যেবাদিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন', মহাভারতের সৌজন্যে খুবই জনপ্রিয়। মূলত হিন্দু শাস্ত্রে নীতির ভিত হিসেবে ধর্ম, কর্ম, কর্তব্যকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পেশা ও নীতির প্রশ্নে গোড়ার দিকে অন্যতম তত্ব হিসেবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উল্লেখ্য। মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তকে অধিষ্ঠিত করে রাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তার প্রধান উপদেষ্টা বিষ্ণুগপ্ত চাণক্য এই আকর গ্রন্থের রচনা করেন।

নিজে নিজে কর্মে এবং পেশায় সততা ও নিষ্ঠার অবলম্বনে ধর্মচারণ, একথা চাণক্য, অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন। এই গ্রন্থে দুর্নীতির কথাও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মে নীতির নানা রকম পরিভাষা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে তার পরিবর্তন হয়েছে। নীতির ধর্মীয় ব্যাখ্যা কখনো কখনো খুবই বিভ্রান্তকারী, কখনো কখনো বৈপরীত্যে ভরপুর। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ থেকে হজরত মোঃ, যীশুর থেকে গুরু নানক, নীতির প্রশ্নে বহুলাংশেই একমত। ধর্মাচরণের প্রশ্নে হিউম্যানিজম বা মানবকল্যাণের কথা সবাই বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, ''...ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই'', কার্ল মার্ক্সও কমিউনিজমের তত্ত্বে জনকল্যাণকেই আধার করেছেন।

অতএব, ব্যক্তিগত নীতি, সামাজিক নীতি, পেশাদারী নীতি এক অর্তে ভিন্ন হলেও কোথাও হয়তো একে অন্যের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। পরবর্তী অংশে আমরা সংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

১.২.১ সাংবাদিকতার নীতি ও আইন—

তুলনামূলক আলোচনা : পুরাকাল থেকেই শাসক গণমাধ্যমকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। রাজতন্ত্রে রাজার আজ্ঞাবহ কর্মচারীরা ঢেঁড়া পিটিয়ে জনগণকে খবর পৌঁছে দিতেন। রাজার আদেশেই শিলালিপি তৈরি হতো। দেওয়ালে বার্তা খোদাই করা হতো। রাজা তার সভায় মাইনে করা লেখককে দিয়ে উপন্যাস, কবিতা লেখাতেন এবং পাঠ করাতেন। কখনো কখনো নাটকের দলকে দিয়ে স্বচ্ছন্দ মতো স্ক্রিপ্ট লিখিয়ে অভিনয় করাতেন। এসব সৃষ্টি মোটামুটি আগের থেকেই প্রশংসার সুরে বাধা এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। ফলে এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই এবং স্বাধীনতার সাথে নিয়ন্ত্রণের সংঘাত নেই। কিন্তু যখন সংবাদমাধ্যম এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিসরে আত্মপ্রকাশ করতে চাইল তখন সে সৃজনশীলতার জোরে জনপ্রিয় হলো এবং এই জনপ্রিয়তা শাসককে বাধ্য করলো তাকে নিয়ন্ত্রণ করার নতুন উপায় খুঁজতে। এই ভাবেই আইন প্রণয়নের পথে চলল সাংবাদিকতা।

আইন ও নীতির মূল পার্থক্রগুলি হল :

(১) আইন শাসকের দ্বারা প্রণীত, নীতি ব্যক্তি মানুষের দ্বারা।

(২) আইনের মূল উদ্দেশ্য রাজধর্মের পালন, নীতির মূল উদ্দেশ্য স্বধর্মের পালন।

(৩) আইন সব পরিস্থিতিতে সবার জন্যই এক। নীতি, স্থান ও সংস্কৃতির পার্থক্যে তারতম্য ঘটতে পারে। ভারতীয় সমাজে যা নীতিবিরুদ্ধ, মার্কিন সমাজে তা নীতিবিরুদ্ধ নাও হতে পারে।

(৪) আইনের লঙ্ঘন শাস্তির বিধান আছে নীতির লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান নেই।

(৫) আইন রাষ্ট্র বলবৎ করে থাকে। নীতির রূপায়ণ ব্যক্তির নিজস্ব পরিসরের সীমাবদ্ধ।

(৬) আইন লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু নীতি কোথাও সেভাবে লেখা থাকে না। বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

আইন ও নীতির মধ্যে একাধিক মিল রয়েছে :

(১) আইন ও নীতি ব্যক্তিগত জীবন চর্চার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগ হয় তেমনি কাজের ক্ষেত্রে, পেশাদারি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(২) আইন ও নীতির দুইয়ের লক্ষ্য সমাজ ও মানুষের হিত-সাধন, শান্তি ও সাম্য আনা।

১.২.২ গণমাধ্যমের আইন ও নীতির তুলনামূলক পর্যালোচনা—

নীতি ও আইনের যে পার্থক্য ও মিলগুলি ইতিপূর্বে আলোচিত আর সবকটি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে খাটে তবে একটু পরিবর্তিত ভাবে। গণমাধ্যমের ক্ষমতা আছে মানুষের কাছে তথ্য নিয়ে যাওয়ার এবং মানুষকে প্রভাবিত করার। সেই জায়গা থেকে রাষ্ট্রের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম হলো আইন। গণমাধ্যম যখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, সে ক্ষেত্রেও আইন প্রযোজ্য। অপরদিকে পেশাগত নীতির প্রয়োজন রয়েছে সব পেশাতেই। সাংবাদিকতার পেশাগত নীতিমালা সাংবাদিকদেরে জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাথমিক স্তরে যখন শুধুই মুদ্রিত মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল গণমাধ্যম অর্থাৎ তখন মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং ছাপার বিষয়বস্তু অর্থাৎ বই, সংবাদপত্র ও সাময়িকী বিষয়বস্তু থেকে আপত্তিকর ও আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রভাব নির্মূল করাই ছিল আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গণমাধ্যমের চরিত্র বদলালো, তখন প্রয়োজন হলো নতুন আইনের। বস্তুতঃ, ইলেকট্রনিক/বৈদ্যুতিন মাধ্যমের, টিভি-র এবং সাম্প্রতিককালে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে যে আইনগুলি প্রণয়ন হয়েছে তার বেশিরভাগটাই প্রযুক্তি সংক্রান যেমন সম্প্রচার, স্যাটেলাইট, স্পেক্ট্রাম, সিগন্যাল, ব্যান্ডউইথ ইত্যাদি বিষয়গুলি আসছে মূল প্রকরণ হিসেবে। নীতির ক্ষেত্রে খুব একটা বিশেষ হেরফের কিন্তু হয়নি। বস্তুনিষ্ঠতা, ন্যায়-পরায়ণতা, রাষ্ট্রদ্রোহ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, উচিত-অনুচিতের ঘেরাটোপেই এই নীতির ঘোরাফেরা। শুধু, মাধ্যম অনুযায়ী জনগণের হেরফের। সাংবাদিক নিজের পেশায় নীতিনিষ্ঠ থাকছেন কিনা তার বিচার এখন অন্য মাত্রা পেয়ে গেছে। 'নাগরিক সাংবাদিকতার' যুগে যখন প্রতিটি গণমাধ্যমের উপভোক্তা এখন নিজেরাই। 'কনটেন্ট প্রডিউসার' অর্থাৎ বিষয় উৎপাদনকারী, সৌজন্যে 'ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়া', ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি। সমাজের মূল্যবোধের সীমারেখা বা 'parameter' দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। পাশ্চত্যের প্রভাবে দেশীয় মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটছে। সুতরাং নীতিরও পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। গত ৩০ বছরে ভারতবর্ষে গণমাধ্যমের আইন ও নীতি অনেক পাল্টেছে এবং আরো পাল্টাবে বলাই বাহুল্য।

১.১.৪ গণমাধ্যম-এর স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি। ইতিপূর্বে আলোচিত যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার রাষ্ট্রে এবং শাসককুলকে বারংবার অস্বস্তিতে ফেলেছে। প্রেস আইনগুলি মূলত এই স্বাধীনতা প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় থেকেই প্রণীত। ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়া শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ নেমে আসা থেকে শুরু। মধ্যযুগে ভারতের ধ্রুপদী শিল্পচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রথমে সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সম্পাদক জেমস হিকি তো তার স্বদেশীয় সরকারের রোষানলে দগ্ধ হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে থাকবে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশের' ছবিতে হীরক রাজার লোক গায়ক চরণ দাসের 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটি শুনে তাকে বন্দি করেছিলেন। এ ছিল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা। কিন্তু একথাও ঠিক যে স্বাধীনতার সাথেই আসে দায়িত্ব এবং কর্তব্য বোধ। আর কোনো স্বাধীনতাই অবাধ হতে পারে না। কিছু যুক্তিযুক্ত নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই থাকে। এই দুটি বিষয় কিন্তু সাংবাদিকতা নীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই নীতি রক্ষার অনেকাংশ সাংবাদিকদের নিজেদের ওপরেই বর্তায়।

বিশ্বের কিছু দেশের সংবাদমাধ্যম বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একটি স্বীকৃত অধিকার। ভারতের সংবিধানের ১৯(১)এ ধারায় ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এক মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত এবং এ থেকেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার আসে। এখানে প্রশ্ন উঠে আসে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে মূলত ব্যক্তির সাংবাদিক অথবা সম্পাদকের স্বাধীনতাকেই বোঝানো হচ্ছে। অবশ্য এই নিয়ে কিন্তু আধুনিক ব্যাখ্যা আছে যে যেহেতু সংবাদমাধ্যম বর্তমানে

সম্পাদকের নয় মালিকের অঙ্গুলিহেলনে চলে ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে মালিক বা মালিক গোষ্ঠির স্বাধীনতাকে বোঝাচ্ছে। যাইহোক না কেন সাংবাদিক বা সমপাদক, মালিক সবাই সংবাদমাধ্যমের লোক অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত লোকেরাই স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং তাদের দায়িত্ব এই স্বাধীনতার যোগ্য ব্যবহার এবং সর্বোপরি পেশাদারি নীতিসম্মত কাজ করার। এখানে সংবাদমাধ্যমের সামাজিক দায়-দায়িত্বের আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১.১.৫ গণমাধ্যম-এর সামাজিক দায়বদ্ধতা

গণমাধ্যম বিশেষত সংবাদমাধ্যম ও জনগণের মধ্যে এক নির্ভরযোগ্যতা ও পরিষেবামূলক সম্পর্ক আছে। জনগণ সঠিক কাজের জন্য সংবাদমাধ্যমের ওপর এই বিশ্বাস রাখেন, নির্ভর করেন। তবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা ব্যাপারে, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষ তাকিয়ে থাকেন সংবাদমাধ্যমের দিকে। সংবাদমাধ্যমও সঠিক, সময়োচিত তথ্য এবং বিশ্লেষণ প্রস্তুত করে জনগণকে সঠিক পথে চালিত করেন। এই ভূমিকার জন্যই তাকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক দেশে জনকল্যাণের ব্যবস্থায় আইনসভা, আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সবচাইতে কাছের, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যা, অন্যায়-অবিচারের কথা মানুষের প্রতিনিধি ও কণ্ঠস্বর হয়ে সোচ্চারে বলার কাজটি সংবাদমাধ্যমের করার কথা। এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক বাধ্যবাধকতা, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং কখনও কখনও নীতির আস্ফালন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে যে নীতি আলোচনা আসে সেগুলি হল :

(১) **বস্তুনিষ্ঠতা** — সংবাদ হবে বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ সত্য, সঠিক, পক্ষপাতহীন। নৈবর্ত্তিক ভাবে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে সাংবাদিককে একটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং সে ঘটনার সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে মানুষ ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংবাদ একপেশে হবে না এবং কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে ভারাক্রান্ত হবে না, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যে তুলে ধরে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তা না হলে নীতিগতভাবে সংবাদটি যথার্থ হবে না।

(২) **চেকবুক সাংবাদিকতা বা পেইড নিউজ** — যে সংবাদের সাথে বৃহৎ ব্যবসায়িকভাবে ও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেখানে কায়েমী স্বার্থবাদীকে বস্তুনিষ্ঠতা থেকে সরে আসতে প্রভাবিত করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সাংবাদিক অর্থ তথা অন্যান্য প্রলোভন এড়াতে পারবেন যদি তার নীতিবোধ সুদৃঢ় হয়। অর্থের বিনিময়ে পক্ষপাতদুষ্ট খবর সরবরাহ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার এই অবলম্বন থেকেই 'চেকবুক জার্নালিজম' বা 'পেইড নিউজ' শব্দগুলির জন্ম।

(৩) **গোপনীয়তা** — গোপনীয়তা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত। জনপ্রিয়তার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনেক গণমাধ্যমই ব্যক্তির গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে থাকে যা আদৌ নীতিসম্মত নয়। এ ব্যাপারে পরবর্তী এককে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

(৪) **সংবাদপত্রের আয় কাঠামো** — বিক্রি বা জনপ্রিয়তা নয়, বিজ্ঞাপনই গণমাধ্যমের আয়ের মূলস্রোত। বিশেষতঃ বহুজাতিক, ব্যবসায়িক সংস্থা বা কর্পোরেট বিজ্ঞাপনই গণমাধ্যমের জীয়নকাঠি। কর্পোরেট সংস্থাকে খুশি রাখতে গিয়ে নীতির সাথে আপস করতে হয় গণমাধ্যমকে। এইভাবে সংবাদমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণও পরোক্ষভাবে

কর্পোরেটের হাতে চলে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশাদারী সততা ও স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে; যদিও নীতিগতভাবে এগুলি সমর্থনযোগ্য নয়।

(৫) **রুচি ও শালীনতা** — রুচি ও শালীনতা এগুলি কোন নিয়ম-কানুনের খাতায় সরকারি কাগজে লিপিবদ্ধ নেই। সমাজের মনন, রুচি, সংস্কৃতি মানুষে, মানুষে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এবং একেক সমাজ, দেশ সাপেক্ষে ভিন্নতাও থাকে। মার্কিন মূল্যবোধ, রুচিবোধ ইংরেজের সাথে মেলে না, ইংরেজেরও ভারতের সাথে মিলে না। চুম্বন দৃশ্য ভারতে অশ্লীল হলেও বিলেতে সহজভাবে নেওয়া হয়। ভালো ছবি এমনই হবে যা সামাজিক স্বার্থ ও রুচিবোধকে আঘাত না করে। অবশ্য সময়ের সাথে দ্রুত এই বিষয়গুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। তাছাড়া শালীনতার সাথে কিন্তু আইনগত দিক জড়িত, এক্ষেত্রে নীতিগত জায়গাটা বজায় রেখে সুস্থ রুচিসম্পন্ন কনটেন্ট মানুষকে দিতে পারলে আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। শালীনতার মাত্রা পেরিয়ে যাওয়ার প্রলোভন এড়ানো আজকের গণমাধ্যমের কাছে এক কঠিন নীতিগত চ্যালেঞ্জ। একদিকে সস্তা জনপ্রিয়তার হাতছানি, অপরদিকে নীতি লঙ্ঘনের বিষয় — যা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

(৬) **দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব** — গণমাধ্যমকে সমাজ ও দেশের গণ্ডিতর মধ্যেই কাজ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে তাকেও দায়িত্বশীল হিসেবে তুলে ধরতে হয়। সংবাদ পরিবেশন যেন সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি না করে, বিভ্রান্তি বা আতঙ্ক না ছড়ায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ না করে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি যাতে না ঘটে, দেশে সুরক্ষা শান্তি যাতে বিঘ্নিত না করে, সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন না করে এবং দেশের শত্রুদের হাত শক্ত না করে অথবা সন্ত্রাসবাদকে পুষ্ট না করে এই বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে কারণ এ ব্যাপারে নীতিভ্রম হলে তা দেশ ও দেশবাসীকে বিপদে ফেলবে।

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় ছাড়াও নীতি সংক্রান্ত পেশাদারি আরো বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলি পরবর্তী অংশে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১.৬ গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশ নিজের ইউরোপীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। রুশ বিপ্লব, চিনা বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এরকম নানাবিধ প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক পরিসরে আলোচিত হয় এবং স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম তার মধ্যে অন্যতম এবং সর্বজনসম্মত। স্টুয়ার্ট মিলের মতো দার্শনিক তার 'অন লিবার্টি' গ্রন্থে জোরালো সওয়াল করেছেন যে মুক্ত গণমাধ্যমই গণতন্ত্রের বিকাশের পথ। কিন্তু গণমাধ্যমের শক্তিও তো অপার, জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে সে। তাই তার স্বাধীনতা তো সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবাধ হতে পারেনা। এইখান থেকেই গণতন্ত্রে গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণের তত্ব উঠে আসে অর্থাৎ গণমাধ্যম নিজেই নিজের ওপর নজরদারি করবে এবং নীতির পালন করবে এবং নীতি লঙ্ঘন করবে না।

গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ-এর দার্শনিক ভিত্তি হলো এক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়া। এর দ্বারা মুক্তি, স্বাধীনতার অভাবের বিষয়কে এক সম্মানজনক সীমানার মধ্যে আনা যায়। একদিকে যেমন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে মতপ্রকাশের, তেমনি মানুষের অধিকার আছে সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়ার। সুতরাং এই স্বাধীনতাও অধিকারের ভারসাম্যে আনতে নিয়ন্ত্রণ-এর ভূমিকা কার্যকর। রাষ্ট্রযন্ত্র ও বাজার সমাজের এই দুই নির্ণায়ক শক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যম স্বনিয়ন্ত্রণের দ্বারাই বাণিজ্য ও গণতন্ত্রের মধ্যে নিজের অবস্থান ঠিক করবে।

অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রণের মূল প্রতিপাধ্য হলো যে গণমাধ্যম ও তার প্রতিনিধিরাই নিজেদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন

করবে। অনেক দেশেই গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া হয়েছে স্বনিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা Regulatory Body। এই সংস্থাই নৈতিক বিচ্যুতির বিচার করবে, বিচ্যুতি ঠেকাবে নজরদারি দিয়ে এবং নীতিগতভাবে গণমাধ্যমের কাজ সঠিক না গর্হিত তার নিদান দেবে। স্বনিয়ন্ত্রণ দুই প্রকারের—

(ক) অভ্যন্তরীন স্বনিয়ন্ত্রণ

(খ) বাহ্যিক স্বনিয়ন্ত্রণ

অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি গণমাধ্যম সংস্থা একজন 'নজরদার বা ওমবুদসম্যান' নিয়োগ করতে পারেন। বিদেশে 'দ্য গার্ডিয়ান' 'RE' বা 'Reader's Editor' পদ সৃষ্টি করে। ওমবুদসম্যান হিসেবে পরবর্তীতে ভারতে 'দ্য হিন্দু' ও একই পথে হাঁটে।

অভ্যন্তরীন ওমবুদসম্যান সংস্থাকে অনৈতিক পথে যাওয়ার থেকে আটকায় এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পেশাদারিত্বের দিকে পরিচালিত করে। জনপরিসরে ও বাজারে প্রকাশিত হওয়ার আগে, নজরদারদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার আগে প্রথম 'চেকপোস্ট' হল ওমবুদসম্যান। এখনো বেশিরভাগ গণমাধ্যম সংস্থা কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন।

বাহ্যিক স্বনিয়ন্ত্রণ

বাহ্যিক স্বনিয়ন্ত্রণ সরকার দ্বারা গঠিত অথবা সরকারি আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি সংস্থা গণমাধ্যমের নীতিগত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা বিমর্ষ করবে। সাধারণত গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের সংস্থায় গণমাধ্যমের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরাই থাকেন। অর্থাৎ এই শিল্পের সাথে যুক্ত লোকেরাই নীতিগত ব্যবস্থাপনা ও নজরদারি চালান। যাতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বহুলাংশ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং মান বজায় থাকে, অপ্রয়োজনীয় সরকারি হস্তক্ষেপ এড়ানো যায় এবং আইনি পাঁচ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

ভারতীয় গণমাধ্যম ও স্বনিয়ন্ত্রণ

যখন সংবাদপত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠল তখনই ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের খাঁড়া নেমে এলো সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ওপর। সংবাদপত্রকে হাতিয়ার করেছিলেন গান্ধীজী, তিলক, সুভাষচন্দ্র এবং নেহরুর মতো নেতারা। স্বাধীন ভারতে নেহরু সরকার ১৯৫২ সালে গঠন করে প্রথম প্রেস কমিশন। এই প্রেস কমিশনের সুপারিশে ১৯৫৬ সালে সংসদে প্রেস কাউন্সিল বিল পেশ করা হয়। ১৯৬৫ সালে বিলটি দ্বিতীয়বার সংসদে পেশ করা হয়, গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালে ভারতের প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়। জরুরি অবস্থা জারি হলে ১৯৭৫ সালে প্রেস কাউন্সিল বাতিল হয়। ১৯৭৮ সালে পুনরায় প্রেস কাউন্সিল বিল গৃহীত হয়। একজন চেয়ারম্যান এবং ২৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং বাকিরা গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট বিদ্বজন। মূলত এই প্রেস কাউন্সিলের কাজ নজরদারি করা, অনৈতিক কাজ করলে সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা এবং বিচ্যুতির জন্য ভৎর্সনা করা। কিন্তু খুব গুরুতর শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা এই আধা বৈচারিক (quasidjicial) সংস্থার নেই। কিন্তু এই সংস্থার সবচেয়ে বড় অবদান সাংবাদিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আচার সংহিতা (Code of Ethics) প্রণয়ন। সরকার যদি সাংবাদিক ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন বেআইনি বা অনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় এই কাউন্সিল তাও পর্যালোচনা করে।

বৈদ্যুতিন গণমাদ্যম

ভারতের বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ক্ষেত্রটি দীর্ঘদিন ধরেই আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের দখলে ছিল। এই দুটি সরকারি সংস্থারই 'public service broadcasting' বা জনকল্যাণমূলক সম্প্রচারের তত্ত্বে নিয়োজিত। এবং এর ওপর ভিত্তি করেই নিজস্ব আচার সংহিতা মেনে চলে।

'৯০-এর দশকে ভারতীয় অর্থনৈতিক উদারনীতি চালু হলে গণমাধ্যমের বাজারে ঢুকে পড়ে বেসরকারি ও বিদেশী টিভি, রেডিও চ্যানেলগুলি। এরপরে বিপন্ন হয় নীতিগত আচরণ কারণ প্রেস কাউন্সিলের আওতায় বৈদ্যুতিন মাধ্যম পড়ে না। পরবর্তীতে তথ্য প্রযুক্তি, নির্ভর সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যায়। IT Act প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে সরকার নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে তৃতীয় প্রেস কমিশন তথা মিডিয়া কাউন্সিলের দাবি উঠেছে। বৈদ্যুতিন চ্যানেলগুলি সম্প্রতি নিজস্ব উদ্যোগে ব্রডকাস্টিং কনটেন্ট কমপ্লেটস কাউন্সিল BCC-এর মত স্বনিয়ন্ত্রণধর্মী সংস্থা তৈরি করে নীতির প্রশ্নে সদিচ্ছা দেখিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান বিনোদনমূলক টিভি চ্যানেলের শীর্ষ সমিতি ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং ফেডারেশন দ্বারা পরিচালিত। এটি বাহ্যিক হলেও সরকারি নয়। সংবাদ প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নিউজ ব্রডকাস্টারস অ্যাসোসিয়েশনেরও এ ধরনের সংস্থা রয়েছে, তা হল ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি (এনবিএসএ)

১.১.৭ সারাংশ

নীতি মানুষের নিজস্ব দায়, সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যম শিল্পেও তাই। আইন ভাঙলে শাস্তি আছে, নীতি ভাঙলে শাস্তি নেই। অর্থাৎ নিজেকে নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সজাগ হতে হবে। গণমাধ্যম মানুষকে প্রভাবিত করে তাই তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সেজন্যই আসে নীতিপরায়ণতা। পেশাদারি মান এবং নীতিগত মূল্যবোধ বজায় রাখা আজ গণমাধ্যমের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বাজার, রাজস্ব, গণতান্ত্রিকতা ও মূল্যবোধ-এসব একে অন্যের সাথে যুক্ত। রাষ্ট্র সর্বদা গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারে। বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে গণমাধ্যম নীতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। স্বনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চেষ্টা হচ্ছে নতি ধরে রাখার। মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরবর্তী সময়ের প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও রাজস্বের এক বহুমাত্রিক অথচ প্রয়োজনীয় সমীকরণ এসবের জন্য গণমাধ্যমের নীতিবোধ আজ বিপন্ন। এই একক নীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে।

১.১.৮ অনুশীলনী

(১) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

ক. রাষ্ট্রী ও গণমাধ্যমের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করো।

খ. নীতির মূল প্রতিপাদ্য ভিত্তি আলোচনা করো।

গ. সাংবাদিকতার নীতি ও আইনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

ঘ. গণমাধ্যম-এর নীতির অন্তর্গত মূল তথা মুখ্য বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করো।

চ. গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

(২) টীকা লেখ :

ক. আইন ও নীতির পার্থক্য

খ. বিভিন্ন প্রকারের নীতি

গ. ওমবুডসম্যান

ঘ. নীতি আচার সংহিতা

ঙ. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

চ. গোপনীয়তা

ছ. গণমাধ্যমে আয় কাঠামো

জ. গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা

ঝ. চেকবুক সাংবাদিকতা, পেইড নিউজ

১.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. Media and ethis — S. K. Agarwal (Shipra Fub)

২. সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত — ডঃ নন্দনাল ভট্টাচার্য্য (লিপিকা)

৩. আধুনিক গণমাধ্যম — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক - ২ ❐ গণমাধ্যম ও নীতিগত সমস্যা

গঠন :

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকার এবং গণমাধ্যমের নীতিগত সমস্যা

১.২.৩.১ স্টিং অপারেশন

১.২.৩.২ প্রত্যুত্তরের অধিকার

১.২.৩.৩ সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিবেদন

১.২.৩.৪ নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১.২.৩.৫ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১.২.৪ সারাংশ

১.২.৫ অনুশীলনী

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.২.১ উদ্দেশ্য

এর আগের এককে গণমাধ্যম ও প্রেস সংক্রান্ত নীতির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নীতি ও আইনের পার্থক্য নিয়েও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নানারকমের অসুবিধা, দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতার সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে জনপ্রিয়তার চাপ অন্যদিকে নীতির ভ্রুকুটি — পেশাদারি ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনা ঘটে যা আমাদের নীতিগত সমস্যাকে পুনর্বিচার করতে বাধ্য করে। সময়, প্রযুক্তি, রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাংবাদিকদের সমস্যাগুলিও পরিবর্তিত হয়, নতুন চেহারায় প্রকাশ পায়, তার পেশাদারি দৃষ্টিকোণও পাল্টে যায়। বর্তমান এককে এরকমই কিছু সমস্যা উদাহরণ ও কেস স্টাডি সহ আলোচিত হয়েছে। আশা করা যায় যে এই এককটি পড়ে কর্মরত সাংবাদিক তথা সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং কর্মক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

১.২.২ প্রস্তাবনা

১৭৮০ সালে যখন হিকি সাহেবের গেজেট দিয়ে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। তখনই নীতির প্রশ্নে সংকট দেখা দেয়। হিকির সংবাদপত্রটি ইংরেজি ভাষায় ছিল এবং এর পাঠক মূলতঃ ছিলেন ইয়োরাপ থেকে জীবিকার সন্ধান্তে আগত বিলাতি মানুষ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকগণ এবং তাদের পরিবার। বেঙ্গল গেজেটকে জনপ্রিয় করতে হিকি উচ্চপদে আসীন ইংরেজ অফিসারদের ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা ছাপতে শুরু করলেন। গভর্নর জেনারেল

ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রীর সাথে অরেক আধিকারিক-এর তথাকথিত বিবাহবহির্ভূত প্রণয় সম্পর্কের কথা প্রকাশ পেতে লাগলো বেঙ্গল গেজেটে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের রোষানলে পড়ে বেঙ্গল গেজেটের যেমন অপমৃত্যু ঘটে তেমনি হিকিও ব্যক্তিগতভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ বহুল কথিত ঘটনাটি সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে একসাথে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়। যথা—

১। রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক

২। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

৩। ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার

৪। সংবাদমাধ্যমের নৈতিকতা

উপরোক্ত ৩টি বিষয়ের মধ্যে ২ ও ৩নং বিষয়টি যেন একে অন্যের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আছে, বা বলা ভাল যে এ দুটির মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি জায়গা সৃষ্টি হয়েছে। আবার ২ ও ৩ দুটিই ৪নং বিষয়ের সাথে জড়িত। যতদিন সংবাদপত্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল বা সমাজসংস্কারের মাধ্যম ছিল। যতদিন জনকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণের পবিত্র অনুপ্রেরণায় প্রাণিত হয়ে রাজা রামমোহন রায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো সম্পাদকেরা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন ততদিন কখনোই উপরে বর্ণিত দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয়নি। সমস্যাটা দেখা দিল স্বাধীনতার পরে যখন সংবাদপত্র ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীক শিল্পে পরিণত হল। বিলাতে ততদিনে 'পীত সাংবাদিকতা' এবং 'ট্যাবলয়েড জার্নালিজম'-এর বাড়বাড়ন্ত এবং রাজপরিবারের সদস্য, হলিউড তারকা, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রবেশ এক জনপ্রিয় ও নিয়মিত 'কনটেন্ট' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ প্রভাব ভারতীয় গণমাধ্যমেও পড়তে বেশি সময় লাগল না। বিশেষতঃ, বিশ্বায়নের ফলে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলি যখন নিজেদের মধ্যে টি.আর.পি-র লড়াইয়ে মেতে উঠল, তখন জনপ্রিয়তার স্বার্থে তারা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করল না। এবং ব্যক্তির গোপনীয়তার যে অধিকার তা বারংবার লঙ্ঘিত হতে লাগল। সাংবাদিকতার নতুন শাখা তদন্তমূলক সাংবাদিকতা এবং তার অন্যতম হাতিয়ার 'স্টিং অপারেশন'-এর শিকার হল ব্যক্তি গোপনীয়তা। বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটল যা নতুন করে আমাদের ভাবতে বাধ্য করল গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিধি এবং ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকারের পরিধি-র মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে কিভাবে ভারসাম্য আনা যায়। এর পরের অংশে বিষয়টি বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.২.৩ ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকার এবং গণমাধ্যমের নীতিগত সমস্যা

মানুষের অধিকার মূলতঃ দুই প্রকারের — স্বাভাবিক অধিকার বা Natural Rights এবং আইনগত আইনসিদ্ধ অধিকার বা Legal Rights। স্বাভাবিক অধিকার জন্মগত এবং দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে চিরশাশ্বত অর্থাৎ সব অবস্থাতেই এ অধিকার সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। আইনসিদ্ধ অধিকার বা Legal Rights আইন প্রদত্ত অধিকার যা দেশ বা রাজ্য বিশেষে পাল্টাতে পারে কারণ বিভিন্ন দেশের আইন বিভিন্ন রকমের। গোপনীয়তার অধিকার স্বাভাবিক বা Natural Rights-এর মধ্যে গণ্য হয়।

১৮৯০ সালে 'The Right to Privacy' প্রবন্ধে আমরা গোপনীয়তার অধিকার আলোচিত হতে দেখি। মার্কিন জার্নাল 'The Hardward Law Review'-এ প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন স্যামুয়েল ওয়ারেন ও লুই ব্র্যান্ডেস। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একা থাকার অধিকার ছিল এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

পরবর্তীকালে ব্র্যান্ডেস মনে করেছিলেন যে সরকার এবং রাষ্টযন্ত্র ব্যক্তি গোপনীয়তার লংঘনকারী হতে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে সরকার প্রযুক্তির অপব্যবহার করে থাকে বলেও তিনি মনে করেন। 'ফোন-ট্যাপিং' বা 'ফোনে আড়ি পাতা' ও 'কল

রেকর্ড' ইত্যাদি তত্ত্ব বিষয়গুলি এখান থেকে উঠে আসে। আমরা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের হামেশাই অন্য রাজনৈতিক বিপক্ষের বিরুদ্ধে 'ফোন-ট্যাপিং'-এর অভিযোগ আনতে শুনি।

অ্যালান ওয়েস্টিন, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মনে করেন যে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে গোপনীয়তা ও প্রকাশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় কারণ প্রযুক্তি সর্বদাই চেষ্টা করে গোপনীয়তাকে লংঘন করার। ব্যক্তি মানুষও নিজের মতো করে, নিজেকে প্রকাশ করার অথবা মনের কথা জ্ঞাপন করা বা না করা, মনের কথা ও জীবন গোপন রাখার মধ্যে এক ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে চলে, নতুন প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে নিয়ে।

তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট সিগন্যাল নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা আদতে গোপনীয়তাকে বিপন্ন করে, এ কথা বহু তাত্ত্বিক মনে করেন। তাঁরা একথাও মনে করেন যে এই উন্নত তথ্য প্রযুক্তিকে রাষ্ট্রে নজরদারির ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এঁদের আশংকা যে অমূলক নয় তা বোঝা গেছিল যখন ২০১৩ সালে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা NSA-র কর্মী এডওয়ার্ড স্নোডেন যখন Global Curvillence Disclosure-এর মাধ্যমে ফাঁস করে দেন যে আমেরিকা বহু দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপরে নজরদারি চালাচ্ছে। রাষ্ট্রের নজরদারি এবং গোপনীয়তার প্রসঙ্গটি সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা হয়। বিষয়টি বর্তমান আদালতের বিচারাধীন।

ফিরে আসা যাক গণমাধ্যম ও গোপনীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত তুঙ্গে ছিল যোসেফ পুলিতজারের 'নিউ ইয়র্ক জার্নাল' বনাম উইলিয়াম হার্স্ট-এর 'নিউ ইয়র্ক জার্নাল'-এর জনপ্রিয়তার লড়াই। এই দুটি সাংবাদপত্রকেই আবশ্যক উত্তেজনা সৃষ্টি করার দায়ে বা সংবাদকে 'Sensationalize' করার দায়ে দুষ্ট চিহ্নিত করা হয় এবং সাংবাদিকতার এক নতুন ধারা — 'পীত সাংবাদিকতা' বা 'Yellow Journalism'-এর উদ্ভব ঘটে এই লড়াই থেকে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদক আরউইন ওয়ার্ডম্যান এই বাক্যবন্ধটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। সংবাদকে অহেতুক উত্তেজনাপ্রবণ, মুখরোচক ও রোমাঞ্চকর করতে গিয়ে অনেক সময়ই বস্তুনিষ্ঠতা থেকে সরে গিয়ে গুজবের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ পরিবেশন হচ্ছিল। এই প্রবণতাই বিপজ্জনক হয়ে উঠল যখন নতুন খবর জোগাড় করার তাগিদে সাংবাদিকরা ব্যক্তির গোপনীয়তা ভঙ্গ করতে শুরু করলেন অথবা ব্যক্তির ,কান্ত গোপন পরিসরে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য হতে লাগলেন সেলিব্রিটি ও গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত মানুষেরা — রাজনৈতিক নেতা, রাজপরিবারের সদস্যরা, খেলোয়াড় এবং চলচ্চিত্র তারকারা। তাঁদের জীবনের গোপন কাহিনী ও কেচ্ছা হু হু করে বিকোতে লাগল এবং এখান থেকেই সংবাদপত্রের পাশাপাশি ট্যাবলয়েড উঠে এল। এখনও পর্যন্ত নব-নব রূপে পীত সাংবাদিকতা ফুলে ফেঁপে উঠছে। প্রযুক্তির কল্যাণ ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়াও এই পীত সাংবাদিকতায় মেতে উঠেছে।

১৯৪৮ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা প্রকাশিত মানবাধিকার সনদ বা Universal Charter of Human Rights। এই নথিতে গোপনীয়তার অধিকারকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গোপনীয়তার অধিকার এক অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমকে নিজেদের কার্যপ্রণালী যথা আইন প্রণয়ন এবং সংবাদ সংগ্রহ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হয়। সময়ের সাথে সাথে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা এই বিষয়টির সাথে গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে বারবার আলোচনায় নিয়ে আসে এবং নানা তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার মধ্যে বিষয়টি চলছে।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা কেস স্টাডির মতো নিম্নে দেওয়া হল বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য।

১। **অটো শংকর** — গো পেনীয়তা এবং ভারতীয় সংবিধান ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১২-১০-১৯৯৫ তারিখ সম্বলিত এক পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে জানান যে সরকারি আধিকারিকদের মর্যাদা/মান হানীকর কিছু ছাপার ক্ষেত্রে সরকার

সংবাদমাধ্যমকে বাধা দিতে পারে না। তামিল পত্রিকা নকীরণ কুখ্যাত অপরাধী 'অটো' শংকর-এর আত্মজীবনী প্রকাশ করছিল এবং সেখানে শংকর তাঁর সাথে অনেক সরকারি আধিকারিকের যোগাযোগ আছে বলে জানান। সুপ্রীম কোর্ট জানাল যে ঐ আত্মজীবনীতে 'পাব্লিক রেকর্ডস্' বা সর্বজনীন তথ্যভাণ্ডার থেকে নেওয়া যে কোনও তথ্য বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা যাবে এবং তাতে কোনওরকম মানহানি বা গোপনীয়তা লংঘন বলে গণ্য হবে না। তবে এ ছাড়া যদি কিছু লেখকের বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত হয়, তাহলে তা গোপনীয়তার লংঘন বলে গণ্য করা হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারা

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণে ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারা উল্লেখ করে মহামান্য আদালত বলেন যে প্রত্যেক নাগরিকের নিজের, পরিবারের এবং পারিবারিক বিষয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করার অধিকার আছে এবং কেউ তাঁর বিনা অনুমতিতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করলে গোপনীয়তা ভঙ্গের দায় তথা তৎসংক্রান্ত পরিণতির সম্মুখিন হবেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোপনীয়তার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত তো বটেই, বিচারব্যবস্থাও তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। '৯০-এর দশকে বিশ্বায়নের জেরে ভারতের গণমাধ্যম বাজারে প্রচুর বেসরকারি সংবাদ চ্যানেল-এর আবির্ভাব হয়। ইন্টারনেট নিউজ পোর্টল-ও আবির্ভাব হয়। ইন্টারনেট নিউজ পোর্টাল-ও শুরু হয় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে। শুরু হয় টি আর পি বা জনপ্রিয়তার ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। এর ফলে এক্সক্লুসিভ বা সম্পূর্ণ নতুন সংবাদের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে সংবাদমাধ্যমগুলি এবং সংবাদ সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি উঠে আসে।

১.২.৩.১ স্টিং অপারেশন

শ্রী তরুণ তেজপাল এবং অনিরুদ্ধ বহল-এর নেতৃত্বে তহলকা পত্রিকা ভারতীয় সাংবাদিকতায় এক নতুন মোড় নিয়ে আসে। ইতিপূর্বেও বোফর্স ইত্যাদি বিখ্যাত কুকাণ্ডে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার দ্বারা অনেক সাংবাদিকই বড় বড় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং তা নিয়ে বিতর্কও যথেষ্ট হয়েছিল। যেমন 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রে সাংবাদিক এন.রাম-এর বোফর্স সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক, মামলা — মোকদ্দমা ইত্যাদি হয়। প্রথাগত তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় কোথাও যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণের অভাবে প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যায় বা মানহানি অথবা নীতিভ্রষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত হয়। ঠিক এই ফাঁক ভরাট করতেই তহলকা নিয়ে আসে এক নতুন অস্ত্র — স্টিং অপারেশন।

২০০০ সালে ক্রিকেট ম্যাচ ফিক্সিং দিয়ে তহলকার স্টিং অপারেশনের যাত্রা শুরু। ২০০১-এ 'অপারেশন ওয়েস্ট এন্ড'-এ এই পদ্ধতি বিপুল সাফল্য পায় এবং জনমানসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বরাত পাইয়ে দেওয়ার জন্য তহলকার প্রতিনিধিরা সামরিক বাহিনী, সরকার ও রাজনীতির প্রভাবশালীদের ঘুষ দেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সেই ঘুষ গ্রহণ করে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে মধ্যস্থতা করতে রাজিও হন। এই পুরো কথোপকথন এবং ঘুষের লেনদেন গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড করে পরে প্রকাশ করে তহলকা। এই গোপন ক্যামেরার ব্যবহার করে যাঁর বক্তব্য রেকর্ড হচ্ছে তাঁর অজান্তে রেকর্ড করাকেই 'স্টিং অপারেশন' বলে অভিহিত করা হয়।

পরবর্তীকালে তহলকা তো বটেই, স্টিং অপারেশন পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে আরও বহু সংবাদসংস্থা, চ্যানেল ও পত্রিকা। এই 'স্টিং' বা দাঁড়ে বিদ্ধ হতে থাকেন বহু বড় বড় রাজনৈতিক দল ও অন্য জগতের ব্যক্তিত্বরা। কিন্তু স্টিং অপারেশন যত বৃদ্ধি পেয়েছে তত বিতর্ক হয়েছে এর নীতিগত দিকটি নিয়ে। একদিকে এই পদ্ধতি সত্য উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করে এবং প্রতিবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণও যোগায় কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়, যথা—

১। কাউকে না জানিয়ে তার বক্তব্য রেকর্ড করা কি সঠিক? এতে কি তাঁর গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছে না?

২। কারুর অজান্তে রেকর্ড করা বক্তব্যকে কি জনসমক্ষে আনা উচিত?

৩। ঘুষ বা অন্য প্রলোভন দিয়ে একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কারুর প্রতিক্রিয়াকে কি তার মানসিকতার প্রকৃত প্রতিফলন বলা যায়?

এই সমস্ত ঘটনাক্রম এবং তদ্দজনীত মামলা-মোকদ্দমায় মাননীয় আদালত পর্যবেক্ষণ এবং সাংবাদিকতা ও আইন জগতের নানা আলোচনা থেকে মূলত দুটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় উঠে আসে :

(ক) গোপন ক্যামেরার ব্যবহার বা স্টিং অপারেশন কখনোই প্রথমে করা উচিত নয়। সত্য অনুসন্ধান ও প্রমাণ যোগাড়ের ক্ষেত্রে সবকটি চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর যদি কাঙ্খিত ফল না মেলে, তখন এটি শেষ প-হা হতে পারে।

(খ) স্টিং অপারেশনের প্রয়োজনীয়তার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত জনস্বার্থ। যে সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য সাংবাদিককে কারুর গোপনীয়তা লংঘন করতে হচ্ছে, সে সত্য/তথ্য যেন উদ্‌ঘাটনযোগ্য হয়, সমাজ ও বহু মানুষের স্বার্থসিদ্ধি করে। না হলে নিছক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য স্টিং অপারেশন করা অত্যন্ত গর্হিত ও সাংবাদিকতার নীতি-বহির্ভূত হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে নীতি ভঙ্গে কোনও শাস্তি হয় না। কিন্তু নীতি স্খলন যদি মানহানীর পর্যায়ে যায় তাহলে কিন্তু সংবাদমাধ্যম বা সম্পাদক বা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে আদালতের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র জনস্বার্থই তার ঢাল হতে পারে। তাই সর্বদাই ভেবে চিন্তে স্টিং অপারেশনের পথে এগোনো উচিত। পাঠক বা দর্শকরাও কিন্তু প্রতিবেদনে নিজের স্বার্থ খুঁজে না পেলে, তাকে বর্জন করবেন। কিছু অল্পসংখ্যক হয়তো বা উত্তেজনার আগুনের আঁচ নিতে পারেন কিন্তু তাদের নিয়ে গণমাধ্যম সংস্থা বাজারে টিকে থাকতে পারবে না। বহু মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, তথ্য উদঘাটন প্রকৃত অর্থেই সবার (দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র) হিতসাধন করবে, সেক্ষেত্রেই 'স্টিং অপারেশন'-এর কথা ভাবা যেতে পারে। এই বক্তব্যের প্রতিফলন ভারতের প্রেস কাউন্সিল দ্বারা প্রকাশিত ২০১০ সালের আচার সংহিতায় ১২, ১৩, ৩৯ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় আছে।

১.২.৩.২ প্রত্যুত্তরের অধিকার

দুটি ঘটনা দিয়ে এই অংশটি শুরু করলে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে সুবিধা হবে। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-তে ১৯৭৮ সালের ২২ অক্টোবর সত্যজিৎ রায় নির্দেশিত 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক রাজবন্‌স খন্না সত্যজিৎ-এর চিত্রায়নের ওয়াজেদ আলি শাহকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ ঐ পত্রিকাতেই সত্যজিৎ-এর বিশাল এক চিঠি ছাপা হয় এবং তার প্রত্যুত্তরে মন্নার-ও আরেকটি চিঠি ছাপা হয়, ঐ একই দিনে। এইরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল 'চারুলতা' ছবিটিকে নিয়েও। সমালোচকের সাথে দীর্ঘ পত্রাচার চলে এক সংবাদপত্রে। এমনকি, মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' ছবিটি নিয়েও তাঁর সাথে পত্রযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সত্যজিৎ।

যে কোনও স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দেশে নিজের মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা সব নাগরিকেরই আছে। বিশেষতঃ যদি তাকে নিয়ে গণমাধ্যমে কিছু প্রকাশিত হয় যাতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে অথবা তা সত্য নয়, সে ক্ষেত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উত্তর দেওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। একেই 'Right to reply' বা প্রত্যুত্তরের অধিকার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এই অধিকার মূলতঃ দুরকমের—

(ক) ব্যক্তির প্রত্যুত্তরের অধিকার

(খ) সংস্থার প্রত্যুত্তরের অধিকার

উপরোক্ত দুইটি ঘটনা 'ক'-এর উদাহরণ। অনেক সময় রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ীক সংস্থা, ধর্মীয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যা আংশিক সত্য বা সেই সংস্থার ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে অবমাননাকর বামানহানীকর। এমনকি দেশ, রাষ্ট্র ও সরকারকেও এই সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। যেমন, কিছু বছর আগে সহারাশ্রী সুব্রত রায় ব্যবসা সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন। এই সময় 'সহারা' সংস্থাকে নিয়ে এতরকমের ভ্রান্ত সংবাদ প্রকাশ হচ্ছিল, যে তা সংস্থার শেয়ারের বাজারমূল্য চড়চড় করে নামিয়ে দিচ্ছিল। তখন সহারা সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভ্রান্ত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং হৃত সম্মান ও ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে।

২০১৮ সালে বেশ কিছু সংবাদপত্রে/চ্যানেলে খবর আসে যে ভারত ও চিনের মধ্যে ডোকলাম সীমান্তে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। এই ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশনার ফলে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রককে একটি প্রত্যুত্তর দিতে হয়। গণমাধ্যকে একটি চিঠির মাধ্যমে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান যে সীমান্তে স্থিতাবস্থা বা 'Status ' বজায় আছে।

উপরোক্ত দুটি ঘটনায় — সহারা এবং বিদেশ মন্ত্রক জ্ঞাপনের যে মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন, তাকে বলা হয় Rejoinder অর্থাৎ একটি/একাধিক প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে প্রত্যুত্তর গণমাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। 'Re' কথাটির তাৎপর্য এখানে যে এই জিনিসটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিবেদন প্রকাশের পরে এসে তথ্যকে সম্পূর্ণতা দেয় অথবা ভুল তথ্যকে সংশোধন করার চেষ্টা করে অর্থাৎ 'join' তাই একে 'rejoinder' বলা হয়।

এই অংশের গোড়াতে ব্যক্তি প্রত্যুত্তর এবং তারপরের উদাহরণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যুত্তর দুটি-র যে দর্শনটি এখানে কাজ করছে তাহল প্রত্যুত্তরের অধিকার। এখন প্রশ্ন হল, সংবাদমাধ্যম এখানে জনগণ এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যুত্তর-এর অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া গণমাধ্যমের নীতিগত পবিত্র কর্তব্য। গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোনও বিষয়ে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কোনও বক্তব্য থাকে তাকে/তাদের সেই বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া এবং জগণের কাছে সেই বক্তব্য তুলে ধরা সংবাদপত্র/চ্যানেলের কর্তব্য। সাংবাদিকতার নীতি সর্বদাই সত্য ও বস্তুনিষ্ঠতার কথা বলে থাকে। প্রত্যুত্তরের অধিকার সত্য অন্বেষণের প্রক্রিয়াকেই জোরদার করে এবং নীতিনিষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

তবে, এক্ষেত্রে একটা কথা বলা দরকারযে যদি কোনও ঘটনা খুব বেশি বিতর্কের জন্ম দেয়, জনগণকে নাড়া দেয় তাহলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা চলতেই থাকে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল সত্যজিৎ রায় বনাম মৃণাল সেন 'আকাশ কুসুম' বিতর্কের সময়ে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্বাধীনতা থাকে নিজ বিচার-বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান দিয়ে ঠিক করার যে তিনি কতদিন অথবা কতবার এই চিঠিগুলি প্রকাশ করবেন এবং কোথায় এই পালায় ইতি টানবেন কারণ কোনও কিছুই সংবাদপত্রের পাতায় বা টেলিভিশনের পর্দায় অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। এই বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রকাশিত সাংবাদিকদের আচার সংহিতার (২০১০)১৭৯৮ নং পৃষ্ঠায় পাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৬২ সালে সংশোধনের আন্তর্জাতিক অধিকার শীর্ষকে এক কনভেনশনের আয়োজন করে এবং সেখানে এই অধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরের অধিকার সংশোধনের অধিকারেরই নামান্তর। ২৪ অগস্ট ১৯৬২ থেকে এই অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলবৎ আছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, এমনকি আকাদেমিক জার্নালও নিজস্ব সংশোধন/প্রত্যুত্তর সংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করেছে। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন গণমাধ্যম সংস্থার সম্পাদকীয় নীতি বলে—

''যদি আমাদের প্রকাশিত কোনও প্রতিবেদনে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনও সমালোচনা করে যাতে তার

কোনও ক্ষতিসাধন হয়, সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যুত্তরের সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে তিনি/তারা তাদের প্রতি ওঠা অভিযোগের সাফাই দেওয়ার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পান।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ন্যায়পরায়ণতা, নীতিসম্পন্নতা, বস্তুনিষ্ঠতা প্রত্যুত্তরের অধিকারের সাথে জড়িয়ে আছে এবং এক মানবিক অধিকারের সমগোত্রীয় যাকে কোনওভাবেই সংবাদমাধ্যম অবহেলা করতে পারে না। করলে, তা নীতিভ্রষ্টতার পর্যায়ে পড়বে।

পাশ্চাত্যের বহু দেশে প্রত্যুত্তরের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতে সমানতার অধিকার এবং ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার আওতায় এই অধিকার চলে আসে। ২০০৫-এ বলবৎ হওয়া তথ্যের অধিকার আইন এই অধিকারকে পুষ্ট করেছে। ১৯৯৪ সালে 'The Right to Reply in the Press Bill 1994' রাজ্যসভায় পেশ হয়েও পরবর্তীকালে তুলে নেওয়া হয়। ভারতের প্রেস পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত সাংবাদিকদের পেশাদারী আচরণবিধি (Norms of Journalistic Conduct)-এ ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় প্রত্যুত্তরের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা সুপারিশ করা আছে।

১.২.৩.৩ সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিবেদন

ভারতবর্ষ বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশ। ঐতিহাসিক ভাবে ভারতে সব ধর্মের মানুষ, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-শিখ মিলেমিশে শান্তিতে থেকেছে। কিন্তু অশান্তিও হয়েছে প্রচুর। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষতঃ ইংরেজরা ভারতের শাসক হওয়ার পর ধর্মীয় ভেদাভেদকে নিজেদের 'Divide and rule' নীতির অন্যতম হাতিয়ার করে।

এই ধরনের ঘটনাগুলিকে কভার করে প্রতিবেদন রচনা যে কোনও সাংবাদিকের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভাষা অথবা বিশ্লেষণের সামান্য বিচ্যুতি বা তারতম্যে প্রতিবেদনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, ঘটনাকে আরও তীব্রতর করতে পারে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে সেই প্রতিবেদন অন্য সম্প্রদায়কে হিংসা ও প্রতিহিংসাপ্রবণ করে তুলতেও পারে এবং গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। এছাড়া দাঙ্গার মতো স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাকাও গণমাধ্যমের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এবার দেখা যাক সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও পরিস্থিতির রিপোর্টিং সম্পর্কে সাংবাদিকতার নীতি কি বলে। ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নীতিমালায় (২০১০) আছে :

১। গুজব, সন্দেহ এবং অপ্রত্যয়িত তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন করা উচিত নয়।

২। ভাষা সংযত রাখা উচিত।

৩। প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

৪। সমস্যার অতিরঞ্জন করা ঠিক নয়।

৫। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে অহেতুক আক্রমণ করা ঠিক নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করাও ঠিক নয়।

৬। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত আছেন এমন ঘটনায় মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রং লাগানো উচিত নয়।

৭। যে সমস্ত বিষয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, তিক্ততা অবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে সেই সব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা/ঘটনা-র ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার ও সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিল কিছু আচরণবিধি সুপারিশ করে :

(ক) উস্কানিমূলক শিরোনাম বর্জনীয়। শিরোনামের সাথে মূল বক্তব্যর যেন সামঞ্জস্য থাকে।

(খ) মন্তব্য এবং রায়দান থেকে বিরত থাকা উচিত।

(গ) মৃত ও হাতহতের সংখ্যার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যথা সরকারি তথ্য বা উপযুক্ত প্রমাণসহ সংখ্যা বলা উচিত। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে, সংখ্যা কম বলাই ভালো।

এছাড়াও কাউন্সিল রাজ্য সবকোরকেও সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিহিংসামূলক আচরণ না দেখাতে সুপারিশ করেছে।

১.২.৩.৪ নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

নারীনিগ্রহ গোটা পৃথিবীতে বটেই বিশেষ করে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এক পরিচিত সামাজিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রথম বিশ্বের দেশের নারীর অধিকার সম্মানের সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিনিয়ত ভারতে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানী, কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছনা, বাড়িতে অত্যাচার, অ্যাসিড আক্রমণ, যৌন নিপীড়ন, লিঙ্গবৈষম্য, নারীপাচার এরকম নানাবিধ নিগ্রহের শিকার হয়ে চলেছেন ভারতীয় নারীরা। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে গণমাধ্যম তথা সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে তারা নারী নিগ্রহের ঘটনাগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে নিগৃহীত নারীকে যে শুধুমাত্র প্রতিকারের রাস্তা দেখাবে শুধুমাত্র তা নয়, বরং এ বিষয়ে বৃহত্তর সমাজকে জাগ্রত করবে, সচেতন করবে এবং নারী নিগ্রহকে হ্রাস করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। অনেকেরই মনে থাকার কথা জেসিকা লাল হত্যাকাণ্ড এবং আরও সাম্প্রতিক নির্ভয়া ধর্ষণ কাণ্ড, যা শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। গণমাধ্যমের তৎপরতায় এবং প্রশাসনের সক্রিয়তায় বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হয়। কিন্তু দেশের প্রতিটি কোণায় জেসিকা ও নির্ভয়াদের ছড়াছড়ি। গণমাধ্যমের কাছে তাই আরও বেশি সক্রিয়তা আর সদর্থক ভূমিকার প্রত্যাশা মানুষের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সাংবাদিক এই জাতীয় প্রতিবেদন লেখার সময় নীতিনিষ্ঠ থাকছেন না এবং প্রকারান্তরে তা নিগৃহীতার ক্ষতিসাধন করছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা নানাবিদ আলোচনাসাপেক্ষে মতামত দিয়েছেন। আমরা একবার এই জাতীয় সুপারিশগুলি দেখে নেবো।

(ক) রাষ্ট্রপুঞ্জ

রাষ্ট্রপুঞ্জ সর্বদাই নারী নিগ্রহ, বিশেষতঃ লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গ হিংসার ব্যাপারে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে যার পোষাকি নাম— 'Declaration on the Elimination of Violence Against Women'। এটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহিত হয়। এর দ্বারা সারা বিশ্বে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রের দর্শন ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার সনদের অনুসারী। ১৯৯৯-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণসভা ২৫ নভেম্বরকে ''নারীনিগ্রহ নিশ্চিহ্ন করার আন্তর্জাতিক দিবস'' হিসেবে ঘোষণা করে। Gender Based Violence বা GBV রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্ভাবিত একটি টার্ম এবং বিভিন্ন সময়ে যখনস পৃথিবীর কোনও প্রান্তে কোনওরকম বড় যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদির মতো ঘটনা ঘটেছে। নারীদের বিষয়গুলিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা এবং আলোচনার মাধ্যমে, নানা সনদ-নথি প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। এই রকমই একটি নথি, 'Ethical Guidelines for Journalist' বা সাংবাদিকদের নীতিসংহিতা যা ডিসেম্বর ২০১৬-য় 'United Nations Communication Group, Afghanistan' দ্বারা প্রকাশিত। এর ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে—

''গণমাধ্যমে মহিলাদের বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা নারী নিগ্রহে লিপ্ত তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। যারা নিগ্রহের শিকার, তারা যাতে সুযোগ-সুবিধা পান সেটাও দেখতে

হবে; এই ধরনের ঘটনা আটকাতে 'শূন্য সহিষ্ণুতা' (Zero tolerance)-কে উৎসাহ দেওয়া সাংবাদিকদের কর্তব্য, তা সে ঘটনা নারী, পুরুষ নাবালক যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন।"

GBV সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

(১) **যথার্থতা** — সাংবাদিকতার প্রাথমিক শর্তই হল সঠিক তথ্যের পরিবেশন। GBV-র ক্ষেত্রেও তাই। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগুলি খুবই স্পর্শকাতর হয় কিন্তু সাংবাদিককে তার প্রতিবেদন তথ্যের যথার্থতা আনতেই হবে। অনেক সময়ই ভাষার সামান্য তারতম্যে তথ্যের বিকৃতি ঘটে।

(২) **পক্ষপাতহীনতা** — যারা যৌন হয়রানি বা নারীনিগ্রহের শিকার, তাদের সাথে কথা বলার সময়, সাংবাদিককে fair অথবা পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং যে সব তথ্যের সূত্র প্রকাশ হলে বিপদে পড়তে পারে, তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাকে জানানো দরকার যে গণমাধ্যমে তার বক্তব্য প্রকাশিত হলে তাকে কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই নারী নিগৃহিতা গণমাধ্যমে এসে পরবর্তীকালে সামাজিকভাবে একঘরে হয়েছেন অথবা প্রতিহিংসামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে এই বিষয়গুলি তাকে আগেই বুঝিয়ে বলা উচিত।

(৩) **বস্তুনিষ্ঠতা** — সাংবাদিক কোনও নিগ্রহের ঘটনাকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করবেন না। বরং তাকে নির্মোহভাবে বিষয়টি প্রকাশ করতে হবে। এমন কোনও কথা লেখা উচিত না যাতে ঘটনায় এমন কোনও রং লাগে বা দৃষ্টিকোণ যোগ হয় যাতে নিগৃহিতাকে দায়ী করা হয়।

(৪) **জনস্বার্থ** — সাংবাদিককে বুঝতে হবে যে নারীনিগ্রহের কোনও ঘটনাটি লোকগোচরে আমলে জনস্বার্ত ও জনহিতকর হবে। কিছু ঘটনা ঘটে যেখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেক গোপন তথ্য থাকে, তা জনচিত্তবিনোদনকারী হলেও সর্বদা জনকল্যাণকর নাও হতে পারে।

(৫) **গোপনীয়তা** — কোনও ভাবেই যেন নিগৃহিতার গোপনীয়তা ক্ষুরণ বা লংঘন না হয়। কারণ, পাঠক/ দর্শকরা কিন্তু কৌতূহলীভাবে বোঝার চেষ্টা করেন পরিচয়। কিন্তু নিগৃহিতার পরিচয় রক্ষা করা সাংবাদিকের নীতিগত দায়িত্ব। সাধারণতঃ ছবি, বা ভয়েস ভিডিও তোলার আগে তার অনুমতি নেওয়া উচিত। ভিডিও বা ছবিতে নিগৃহিতার মুখমণ্ডল আবছা (Blur) করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে সমস্ত মহিলারা স্পর্শকাতর অঞ্চলে থাকেন বা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যুক্ত আছেন বা অসুবিধাজনক সামাজিক পরিস্থিতিতে আছেন, যেমন HIV রোগী, যৌনকর্মী, ড্রাগ নেশাগ্রস্ত বা নিগৃহিতা নারী — এদের ক্ষেত্রে পরিচয় গোপন রাখাই ভালো কারণ না হলে এরা বিপদে/অসুবিধায় পড়তে পারেন।

২০১৫ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়েও রাষ্ট্রপুঞ্জ সাংবাদিকদের জন্য মহিলা নিগ্রহ সংক্রান্ত অনুরূপ নীতি-নির্দেশিকার প্রণয়ন করে।

(খ) **ভারতের প্রেস কাউন্সিল ভারতের প্রেস কাউন্সিল** প্রণীত আচার সংহিতাতেও কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা আছে যার সাথে নারী নিগ্রহের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এর মধ্যে আছে তথ্য যাচাই করা অশ্লীলতা, উত্তেজক শিরোনাম এবং বিশেষ জাত, ধর্ম ও গোষ্ঠির উল্লেখ না করা তথ্যে সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা। এই বিষয়গুলি নারী নিগ্রহের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

(গ) **আই.এফ. জে** আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের সংগঠন। IFJ তাদের নীতিমালায় নারী নিগ্রহকে ঠিকমত চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে ১৯৯৩ রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে।

নিগৃহীতার অনুমতি সাপেক্ষেই তাকে নিগৃহিতা বলে অভিহিত করতে হবে, নচেৎ নয়। নিগৃহিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এই নীতিমালার ছত্রে ছত্রে। পুরো ঘটনাকে নিরপেক্ষ ভাবে, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে প্রতিবেদককে। যথাযথ গোপনীয়তা বজায় রাখতেও বলা হয়েছে।৫

১.২.৩.৫ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

একটি গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাদের মতাদর্শ এবং প্রার্থীদের প্রতি দেশের জনগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং জয়ী দল / জোট সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইরকম একটি প্রক্রিয়ায় এটা খুবই জরুরি যে গণমাধ্যম দেশের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয়, সঠিক ও পক্ষপাতহীন তথ্য পৌঁছে দিক এবং তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। গণমাদ্যমের স্বাধীনতা বহুলাংশেই গণমাধ্যমের দায়িত্ববোধের সাথে যুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ এবং নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই নির্বাচনের সময় কাম্য।

ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রণীত নীতি মালায় নিম্নোক্ত নির্দেশিকাগুলি আছে :

১। সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতহীন ভাবে নির্বাচনী প্রচারের প্রতিবেদন দেবে। প্রতিটি প্রার্থীকে সমান গুরুত্বসহকারে প্রতিবেদনে নিয়ে আসতে হবে। কোনও মতেই যেন গণমাধ্যম কোনও বিশেষ প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলকে বিশেষ বা অতিরিক্ত প্রচার/সময়/জায়গা না দেয়। সমস্ত যুযুধান পক্ষের বক্তব্য সমান গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে।

২। নির্বাচনী ধারায় কোনওরকম সাম্প্রদায়িক বা জাতপাত-এর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বাচনী প্রচার করার অনুমতি নেই। সাংবাদিকরাও এই প্রচারের বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত নয় যা মানুষের মধ্যে ধম, জাত, গোষ্ঠী বা ভাষার ভিত্তিতে হানাহানি বা বৈরিতে মদত দেয়।

৩। কোনও প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন/চরিত্র ও বিষয় আলোচনা থেকে সংবাদমাধ্যম বিরত থাকবে।

৪। বিশেষ কোনও প্রার্থীকে সংবাদে তুলে ধরার জন্য তার থেকে আর্থিক সুবিধা/উৎকোচ গ্রহণ করা নীতিবিরুদ্ধ আচরণ। কোনওভাবেই কোনও বিশেষ প্রার্থীর হয়ে সরাসরি প্রচার বা campaign করা গণমাধ্যমের কাজ নয়। সেক্ষেত্রে ওপর পক্ষ/অন্যান্য প্রার্থী ও দলকে প্রত্যুত্তরের অধিকার দিতে হবে। এইভাবে অর্থ নিয়ে সংবাদ করাকে 'Paid News' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৫। সরকারি টাকায় কোনও পার্টি বা ক্ষমতাসীন সরকারের বিজ্ঞাপন সংবাদমাধ্যম গ্রহণ করবেন না।

৬। ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রণীত নিয়মাবলী এবং তার আধিকারিকদের গণমাধ্যম শ্রদ্ধা করবে ও সহযোগিতা করবে।

৭। প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশের শর্ত হল যে সেখানে সমীক্ষার পদ্ধতি এবং নমুনা সংখ্যা ইত্যাদি বিপদে বর্ণনা করতে হবে। 'Margin of Error' অথবা 'ভুলের সম্ভাবনা'ও ব্যক্ত করে রাখতে হবে একই সঙ্গে। নির্বাচন চলাকালীন এই সমীক্ষা প্রকাশ করা যাবে না।

৮। বুথ ফেরৎ সমীক্ষার ফলাফল নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরই প্রকাশ করা যাবে। নির্বাচন চলাকালীন বা তার আগে এটি প্রকাশ করলে তা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে।

১.২.৪ সারাংশ

গণমাধ্যম ব্যবসায়ীক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত এবং সেই কারণে সাংবাদিকদের বারংবার নীতিগত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নীতিমালার নির্দেশিকা এবং বাস্তব পরিস্থিতি একে অন্যের বিপ্রতীপে। এই পরিস্থিতিতে নীতি শাস্ত্র ও নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে তবেই একজন সাংবাদিক নীতিনিষ্ঠ থাকতে পারবে। এই এককে আমরা শিখেছি বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাংবাদিকের কি করণীয় যথা গোপনীয়তার অধিকার কিভাবে রক্ষা পাবে, কখন ও কিভাবে স্টিং অপারেশন করা যেতে পারে, প্রত্যুত্তরের অধিকার কি এবং সেখানে সম্পাদকের কি কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক সমস্যা, নারীনিগ্রহ এবং নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে সাংবাদিকের নীতিগত দায় ও কর্তব্য কি। এক কথায় এই একক একজন পেশারত সাংবাদিকের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ গঠনে সাহায্য করে।

১.২.৫ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন।

(ক) গোপনীয়তার অধিকার কি সাংবাদিকতার জন্য এক বাধা? যুক্তিসহ নীতির আলোয় ব্যাখ্যা কর।

(খ) প্রত্যুত্তরের অধিকারের সীমারেখা কে ঠিক করেন এবং কিসের ভিত্তিতে? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

(গ) সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার প্রতিবেদন রচনা গণমাধ্যমের কাছে এক নীতিগত চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

(ঘ) "নিগৃহিতার ক্ষমতায়ন নারী নিগ্রহের সমস্যার দ্রুত অবসান ঘটাবে।" — এই বক্তব্যের সাথে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকার যোগসূত্র বর্ণনা কর।

(ঙ) নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কিভাবে পক্ষপাতদুষ্টতা এড়ানো যায়? এ ব্যাপারে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা কি বলছে বর্ণনা কর।

২। টিকা লেখ :

(ক) জেমস হিকির সাংবাদিকতা

(খ) পীত সাংবাদিকতা

(গ) স্টিং অপারেশন

(ঘ) গোপনীয়তার অধিকার

(ঙ) রাষ্ট্রের নজরদারি

(চ) রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদ

(ছ) গোপীনয়তার অধিকারের সাংবিদানিক স্বীকৃতি

(জ) রিজয়েণ্ডার

(ঝ) পেইড নিউজ

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। Norms of Journalistic Conduct (2010) — Press Council of India

২। Ethical Guidelines for Journalists — United Nations Communications Group (UNG), Afghanistan (Dec' 2016)

৩। Guidelines for Reporting on Violence Against Women — IFJ

একক - ৩ ❐ পীত সাংবাদিকতা-চেকবুক সাংবাদিকতা-পেইড নিউজ- ফেক নিউজ

গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ প্রস্তাবনা

১.৩.৩ পীত সাংবাদিকতা

১.৩.৪ চেকবুক সাংবাদিকতা

১.৩.৫ পেইড নিউজ

১.৩.৬ ফেক নিউজ

১.৩.৭ প্লেগিয়ারিজম

১.৩.৮ সারাংশ

১.৩.৯ অনুশীলনী

১.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.৩.১ উদ্দেশ্য

সারা বিশ্বে পুঁজিবাদ যত জাঁকিয়ে বসছে, ভোগবাদ তত মাথা-চাড়া দিচ্ছে এবং মানুষের নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে এই মানবিক এবং পেশাদারি মূল্যবোধের অবক্ষয় তার করাল থাবা বসিয়েছে। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতাও পেশা ও শিল্প হিসেবে এই অবক্ষয় থেকে বাঁচতে পারেনি। ভারতে জেমস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র হিসেবে নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সতর্ক-ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াইয়ে এক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে দূরদ্রষ্টা মহিমা বারবার নিজের লেখায় সাংবাদিকতায় নীতিনিষ্ঠতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সাংবাদিকতা পেশা ও বাণিজ্যক শিল্প হিসেবে বিকশিত হয়।

অন্যান্য শিল্পের মতই ভয়ংকর এক প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে টিকে থাকার দৌড়ে পাল্লা দিয়ে শুরু হয় নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সমঝোতা বা 'কম্প্রোমাইস'। সাম্প্রতিককালেও এই সমঝোতার নানাবিধ ভয়ংকর রূপ সামনে এসেছে। বর্তমান এককে এরকমই কিছু সাংবাদিকতার সাম্প্রতিক ধারা উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল দুটি — ইতিহাসকে জানা, নেতিবাচক ইতিহাসও জানা প্রয়োজন এবং নিজস্ব ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে যাচাই করে মতামত গঠন করা যাতে পরবর্তীকালে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা যায় এবং এই নেতিবাচক পদ্ধতিগুলিকে পরিহার করা যায়।

১.৩.২ প্রস্তাবনা

এই পর্বে আমরা পীত সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফিরে দেখতে চাইব। ''পীত'' বা Yellow সাংবাদিকতার শিকড় আমেরিকায়। শব্দটির তাৎপর্য নানা লোকে নানারকম ব্যাখ্যা করেছে। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হল যে নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ও নিউ ইয়র্ক জার্নাল, এই দুটি সংবাদপত্রেই প্রকাশিত কমিক স্ট্রিপ 'দ্য ইয়েলো কিড' থেকেই ইয়েলো বা পীত সাংবাদিকতার উৎপত্তি। বস্তুতঃ এই দুই সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকেই পীত সাংবাদিকতার ধারা শুরু হয়। নিউ ইয়র্ক প্রেস-এর সম্পাদক আরউইন ওয়ার্ডম্যান এই কথাটির প্রণেতা।

১৮৮৩ সালে জোসেফ পুলিটজারে 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' সংবাদপত্রটি কিনে নেন। পুলিটজার চেয়েছিলেন যে এই সংবাদপত্রটি মূলতঃ বিনোদনমূলক হোক। তাই ছবি, গেমস, প্রতিযোগিতা অপরাধমূলক প্রতিবেদন ইত্যাদি। নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয় দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন এই সংবাপত্রকে। শীঘ্রই এই সংবাদপত্র জনপ্রিয়তার শীর্ষ চলে আসে এর তথ্যবহুল কলেবর এবং আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর জন্য। যদিও প্রভূত সমালোচনার শিকারও হন পুলিতজার।

'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড'-এর জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উইলিয়াম র‍্যাণ্ডল্‌ফ হার্স্ট ১৮৮৭ সালে 'সান ফ্রান্সিসকো এগজামিনার' সংবাদপ্রতটি পারিবারিক সূত্রে অধিগ্রহণ করেন এবং অপরাধ, যৌনতা এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এগজামিনার-এর সাফল্য প্রাণিত হার্স্ট ১৮৯৫ সালে কিনে নেন 'নিউ ইয়র্ক জার্নাল' এবং পুলিতজারের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। দুই সম্পাদক কাগজের দাম এবং বিষয়বস্তু নিয়ে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালান। একে অন্যের বিজ্ঞাপনে ভাগ বসান এবং সাংবাদিকদের বেশি মাইনের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দিকে টেনে নেন। এই রেষারেষির ফলেই জন্ম নেয় দুটি একই রকমের 'ইয়েলো কিড' কমিক স্ট্রিপ। দুই কাগজেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে 'সেনসেশনালিজম' অর্থাৎ দুপক্ষই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় একটি ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে ঘটনা বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যতা থেকে ক্রমশঃ সূরে সরে যেতে থাকে এবং এই অতিরঞ্জনের জন্য ক্রমশঃ নীতির অবক্ষয় ঘটতে থাকে। এমনকি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র ছেড়ে সাংবাদিকেরা 'এক্সক্লুসিভ' সংবাদের নেশায় গুজবের ভিত্তিতে খবর করে দিচ্ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় আরও একটি ধারা যুক্ত হল — ব্যক্তি গোপনীয়তার লঙ্ঘন। এই ধারাতে এতটাই বাড়াবাড়ি হয় যে এরই প্রতিরোধে ১৮৯০ সালে স্যামুয়েল ওয়ারেন এবং লুই ব্র্যাণ্ডেস প্রকাশ করেন তাদের বিখ্যাত 'দ্য রাইট টু প্রাইভেসি'। এই অতিরঞ্জন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায় ১৮৯৫ সালে যখন কিউবাতে বিদ্রোহ ঘোষণা হয় এবং স্পেন তাকে দমন করার চেষ্টা করে। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন পুলিতজার এবং হার্স্ট-এর কাগজে এক উত্তেজনাপূর্ণ এবং অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে যে তাতে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সরকারও বিভ্রান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত যে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ লাগে তার পেছনে এই পীত সাংবাদিকতার যথেষ্ট অবদান ছিল।

এই প্রবণতা সারা বিশ্বের সাংবাদিকতায় কম-বেশি ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে এর নাম হয় 'ট্যাবলয়েড জার্নালিজম'। ট্যাবলয়েড সাধারণত দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিস্তারিত সংবাদপত্র যেখানে মূলতঃ অনৈতিক সংবাদ থাকে। এই সংবাদেরও সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংশয় আছে।

১.৩.৩ পীত সাংবাদিকতা

পুলিতজার-হার্স্ট যুদ্ধের বিশ্লেষণ করেছেন অনেক সমাজবিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে আছেন যোসেফ ক্যাম্পবেল এবং ফ্রাংক লুথার মোট। এঁদের বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হল—

১। অনাবশ্যক বৃহদাকার শিরোনাম।

২। ছবির ব্যবহার প্রশস্ত, কখনো কাল্পনিক রেখাচিত্রর।

৩। মিথ্যা/ভুয়ো সাক্ষাৎকার, বিভ্রান্তকারী শিরোনাম, ভ্রান্ত দাবি এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি।

৪। রবিবারে সম্পূর্ণ রঙিন সাপ্লিমেন্ট, কমিক স্ট্রিপ সহ।

৫। ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণাকারীর পক্ষে সমস্যা যার সৃষ্টি।

১.৩.৪ চেকবুক সাংবাদিকতা

১৯৭৮ সালে লন্ডনের একটি হাসপাতালে বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি জন্ম নেয়। যখন সংবাদমাধ্যম বাবা-মা'র সাক্ষাৎকার নিতে চায়, তখন তাঁরা অর্ত দাবি করেন এবং শুরু হয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে রেষারেষি, যা প্রায় নিলামের পর্যায়ে চলে যায়। শেে পর্যন্ত 'ডেইলি মেল' ৬০,০০০ ডলারে বাজিমাৎ করে। অর্থের বিনিময়ে সংবাদ সংগ্রহের যে পদ্ধতি তাকেই 'চেকবুক জার্নালিজম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণত সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে এই অর্থ কোনও ব্যক্তিকে দেওয়া হয় বিশেষ কিছু তথ্য পাইয়ে দেওয়ার জন্য।

রাজতন্ত্রের সময় থেকেই ইয়োরোপে খবরের সূত্রকে অর্থ দেওয়ার প্রচলন। রাজ্যশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায় চলে আসে। শিক্ষার প্রসারের সাথে সংবাদপত্র এক বৃহৎ শিল্পের আকার ধারণ করে। প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিটি সংবাদপত্রই নতুন, এক্সক্লুসিভ খবর সংগ্রহে মরিয়া। ট্যাবলয়েড, পীত সাংবাদিকতা, অতিরঞ্জন এই সব মত আমদানি হল, তত উত্তেজক, আকর্ষণীয় খবরের খোঁজ হল তীব্র। এইখানেই নীতিভ্রষ্ট হওয়ার হাতছানি এল সাংবাদিকদের কাছে। অর্থের বিনিময়ে খবর কেনার প্রলোভন হল জোরদার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে পদ্ধতি বহুকাল ধরে আছে, তা অনৈতিক হবে কেন? টাকা দিয়ে খবর কিনলে অসুবিধা কি আছে? এক কথায় এর উত্তর হয় না। প্রশ্নটা নীতির অবশ্যই, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি এই প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য—

১। ইংল্যান্ড এবং ইয়োরাপে এই অর্থদানের বিনিময়ে খবর সংগ্রহের প্রচলন থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বের বহু দেশে একে অনৈতিক মনে করা হয়। USA এবং সেইস ব দেশে সংবাদপত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিতে এই পদ্ধতি বারণ করা আছে।

২। অর্থের বিনিময়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

৩। যেহেতু সোর্সকে টাকা দিলে এক ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন হয়, এ পরিস্থিতি সাংবাদিককে বস্তুনিষ্ঠ থাকতে দেয় না।

৪। প্রকাশকের পক্ষপাতহীন থাকা উচিত। এক্ষেত্রে তার সাথে সোর্সের স্বার্থের সংঘাত ঘটছে।

৫। প্রথাগত সংবাদপত্রের চেয়ে ট্যাবলয়েডগুলি এইভাবে খবর সংগ্রহ করতে আগ্রহী বেশি, কারণ তাদের তাগিদ থাকে রোমাঞ্চক সংবাদ পরিবেশন করার।

৬। চেকবুক জার্নালিজম্-এর ফলে বিখ্যাত মানুষদের গোপনীয়তা আক্রান্ত হচ্ছে। এবং মানুষ একধরনের নেতিবাচক নিষিদ্ধ দর্শন (পাবলিক ভয়ারিজম্)-এর জন্য লালায়িত হচ্ছেন।

৭। ভুল, ভ্রান্ত তথ্য অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে প্রকাশ করায় বহু মানুষ, প্রতিষ্ঠান অহেতুক সমস্যায় পড়েছেন। যারা বিখ্যাত মানুষ, এর ফলে তাদের জনমানসে ভাবমূর্তি (public image)-এ জোর ধাক্কা খায়।

৮। এর ফলে সাংবাদিকতার মান নিম্নগামী হয়। কারণ, প্রতিবেদক কখনই আর কষ্ট করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে যাবার তাগিদ পাবেন না।

৯। ইন্টারনেট-এর বিকাশের সাথে সাথে অনলাইন ডিজিটাল আর্কাইভ ও তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ফলে তথ্য এখন সুলভে পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনে। যদিও কিছু ওয়েবসাইট/পোর্টাল-এ অর্থের বিনিময়ে তথ্য পাওয়া যায়, তবু তার হিসাব থাকে, টাকা কে দিল, কাকে দিল, সেটা রেকর্ডেড থাকে।

১০। বিশ্ব জুড়ে তথ্যের অধিকার আন্দোলন জোরদার হওয়ায়, বেশিরভাগ সরকারি তথ্যও এখন হাতের নাগালে। ভারতেও ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন বলবৎ হয়েছে যদিও বেসরকারি ক্ষেত্রকে এর বাইরে রাখা হয়েছে।

১.৩.৫ পেইড নিউজ

চেকবুক জার্নালিজম-এর মাধ্যমে অর্থ সংবাদ এবং সংবাদপত্রের মাঝে ঢুকে পড়েছে। আর 'পেইড নিউজ' 'চেকবুক'-এর বিপরীত ক্রিয়া। অর্থাৎ এখানে সাংবাদিক অথবা সংবাদ সংস্থাকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে যাতে কোনও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একেটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এখানে বলাই বাহুল্য, যে যিনি অর্থ দিচ্ছেন, তিনিই ঠিক করে দেবেন যে সংবাদের দৃষ্টিকোণ ঠিক কি হবে, কোন বিষয় নিয়ে কি ধরনের আলোচনা হবে, কার বিপক্ষে যাবে, কার স্বপক্ষে যাবে অর্থাৎ এই সংবাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অর্থপ্রদানকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী সংবাদ প্রকাশ করে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করা। অনেক সময়ই এই প্রক্রিয়া একটি মাত্র সংবাদে থেমে থাকে না, বরং ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে।

কারা অর্থ দিচ্ছেন?

অর্থের বিনিময়ে নানাবিধ অন্যায় সুযোগ সুবিধা নেবার যে প্রক্রিয়া, তার শিকড় অনেক গভীরে এবং বহু প্রাচীন। এখান থেকেই আমরা 'উৎকোচ', পরর্বতীকালে 'ঘুষ' এবং 'দুর্নীতি' কথাগুলি পাই এবং সমাজে তার প্রভাব দেখতে পাই। একথা ঠিক যে ভারতে সাংবাদিকতার প্রসার ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা এবং সমাজ সংস্কারের পুণ্য ও পবিত্র লক্ষ্য থেকেই হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিল্প-বাণিজ্য এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষারও বিকাশ ঘটে এবং সংবাদপত্রের সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি পেল, ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারালেন যে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জনমতকেও প্রভাবিত করা যায়। তারপরই অর্থের বিনিময়ে, কখনোও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে ইচ্ছে মতো লিখিয়ে নেওয়া, ছাপিয়ে নেওয়ার এই পদ্ধতির বাড়বাড়ন্ত। ব্যবসায়ীক সংস্থার দরকার বিক্রি, মুনাফা, রাজনৈতিক দলের চাই ভোট, জনসমর্থন এবং সংবাদমাধ্যমের চাই বিজ্ঞাপন বা অন্য যে কোনও রূপে আর্থিক সহায়তা। এই তিন স্বার্থ চমৎকার ভাবে মিলে যায় 'পেইড নিউজ'-এ তাই রমরম করে চলছে এই ব্যাপারটি এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

২০০৯ পর্যন্ত এটি ছিল ভারতে 'ওপেন সিক্রেট'। ২০০৯-এর সাধারণ নির্বাচনে এক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে দেশের এক শীর্ষ ইংরেজি সংবাদপত্রকে অর্থের বিনিময়ে নিজের স্বপক্ষে সংবাদ প্রকাশ করানোর নির্বাচনের সময়ে এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ নিয়ে স্বভাবতই অন্যান্য রাজনৈতিক দলও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান। নড়ে চড়ে বসে ভারতের প্রেস কাউন্সিল। একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে তারা এ নিয়ে তদন্ত করার জন্য। কমিটি এক সবিস্তার রিপোর্ট তৈরি করে কাউন্সিলে জমা দেয়। কিন্তু কাউন্সিল সেই রিপোর্ট পুরোপুরি প্রকাশ করেনি।

২০১০-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত সেই রিপোর্টে এই কথা স্বীকার করা হয়েছে যে 'পেইড নিউজ' ভারতে এক উচ্চমানের

সংগঠিত প্রক্রিয়া, যেখানে গণমাধ্যম তার 'স্পেস' এবং ইতিবাচক কভারেজ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। একথাও বলা হয়েছে যে ১৯৫০ থেকে এই প্রক্রিয়া চলছে। নগদ অর্থের পাশাপাশি 'শেয়ার'-এর বিনিময়েও এই পদ্ধতি চলছে।

তবে সরকারি রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ২০০৯ থেকে ২০১৩-এর মধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে 'পেইড নিউজ'-এরমোট ১,৪০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০১৮ সালে কোবরা পোস্ট ডট কম, একটি নিউজ পোর্টাল ভারতের শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া সংস্থাগুলিকে এক নির্দিষ্ট সংবাদ প্রকাশের জন্য অর্থ দিতে চাইলে, তারা এক কথায় রাজি হয়ে যান। এটি কোবরা পোস্ট-এর এক গোপন তদন্তমূলক অভিযান ছিল 'পেইড নিউজ'কে প্রমাণিত করার জন্য। এই অভিযানের থেকে স্পষ্ট হয় যে অর্থের জন্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সাম্প্রদায়িক সংবাদ সম্প্রচার করে ভারতের ভোটার মেরুকরণ করতেও একপায়ে খাড়া। কোবরা পোস্ট-এর অভিযান থেকে দেখা যায় যে সংবাদ সংস্থা ও গণমাধ্যমের নিচুতলা থেকে উপরতলা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত।

১.৩.৬ ফেক নিউজ

ইংরেজী 'ফেক' কথাটার অর্থ নকল বা জাল। সেই অর্থে 'ফেক নিউজ' বলতে এমন সংবাদকে বোঝায় যাতে ভুল, অসত্য তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে অর্থাৎ এমন সংবাদ যা সত্য নয় বা যার সারবত্তা নেই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি সত্যই না হবে তাহলে 'নিউজ' হয় কি করে, অর্থাৎ 'ফেক' কথাটির সাথে 'নিউজ' কথাটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এটাই ঘটনা যে সংবাদমাধ্যমে এই জাতীয় ভুল, ভ্রান্ত, সংবাদের প্রাচুর্য্য এবং আধিক্য বিদ্যমান। প্রতিনিয়ত শস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার লোভে চ্যানেলগুলি 'ব্রেকিং নিউজ' এবং 'এক্সক্লুসিভ' দিচ্ছে যেগুলি অধিকাংশই পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে সারবত্তাহীন অর্থাৎ 'ফেক'। এবং এর ফলে হয়রান হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোনও বিশেষ বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 'ফেক' নিউজের বাড়-বাড়ন্ত দেখা যায়। যেমন, সম্প্রতি কোরোনা ভাইরাস (Covid-19) সংক্রমণের আবহে এই সংক্রান্ত এত 'ফেক' সংবাদ বাজারে ছড়িয়েছে সংবাদপত্র, চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে এ এক তথ্য অতিমারির (infedemic)-এর আকার ধারণ করেছে। কোরোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত নানাবিধ 'ফেক' তথ্যের দাপটে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত এবং দিশাহীন, ঠিক কোনটা, ভুল কোনটা কিছুই তারা বুঝতে পারছেন না যেহেতু একই বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ভিন্ন, ভিন্ন মতামত সম্প্রচার করছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা 'ফেক'-কে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

১। মিসইনফর্মেশন — অর্থাৎ ভুল তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

২। ডিসইনফর্মেশন — অসম্পূর্ণ, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রসাঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত দুটি নাম কোরোনা-কালের অবদান। কিন্তু এর আগেও 'ফেক' সংবাদকে অনেকরকম নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, 'জাঙ্ক নিউজ', 'সিউডো নিউজ' (pseudo) 'হোক্স নিউজ' ইত্যাদি।

'৯০-এর দশকের বিশ্বায়ন ও তদ্দজ্জনীত স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বজুড়ে যে 'তথ্য সমাজ' বা 'Information Society'-র সৃষ্টি হয়েছে তাতে তথ্য এখন মানুষের হাতের নাগালে এসে গেছে। মাউসের এক ক্লিকে বা স্মার্টফোনে আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় আমরা যে কোনও অবস্থান থেকে যে কোনও তথ্যের নাগাল পেতে পারি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে একে অন্যের সাথে যুক্ত হতে পারি। চোখের নিমেষে একটি তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকবাহিত হয়ে অসংখ্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গণমাধ্যমের সংখ্যা প্রচুর, বিষয়বস্তু বা 'Content Generation'ও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এবং অন্তর্জালে তা উপলব্ধ। এইরকম পরিস্থিতিতে অনেক গণমাধ্যম বা ব্যক্তি জনপ্রিয়তা লাভের আশায় — ওয়েবসাইট-এ হিট, ইউটিউব-এ সাবসক্রাইব ও লাইক এবং হোয়াটস অ্যাপ-এ শেয়ার/ফরওয়ার্ড-এর সংখ্যা

বাড়ানোর জন্য নানাবিধ আকর্ষণীয়, উত্তেজক কিন্তু ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন। অনেক সময় কম্পিউটার সফটওয়্যারের বা অ্যাপের সাহায্যে ভিডিও বা ফটোকে 'fabricate' বা পরিবর্তন করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে 'Media Literacy' বা গণমাধ্যম স্বাক্ষরতা (এক কথায় গণমাধ্যমের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সম্যক ধারণা) না থাকলে এই কারসাজি ধরা অসম্ভব। তাই 'ফেক নিউজ'-এর প্রসার ক্রমবর্ধমান। এই সামাজিক অবস্থা বা 'Post truth Society'-তে ফেক নিউজ এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফেক নিউজে ইতিপূর্বে আলোচিত সংবাদমাধ্যমের সমস্ত অনৈতিক উপাদনগুলি বিদ্যমান। অর্থাৎ ফেক নিউজ একাধারে পীত সাংবাদিকতারই নামান্তর কারণ এর সূত্র হয় অবিশ্বস্ত, গুজব অথবা কল্পনা। এর মধ্যে 'Sensenationalize' বা উত্তেজক অথবা অতিরঞ্জন পুরো মাত্রায় আছে। কখনো কখনো 'পেইড নিউজ' এই 'ফেক নিউজ'-এর রূপে আসে। বেশিরভাগ 'পেইড নিউজ' মিথ্যাকে সত্যি বানানোর এক অপচেষ্টা। 'ফেক নিউজ'-কে সত্যের মতো পরিবেশন করতে গিয়ে কখনো মিথ্যা বক্তব্য, মিথ্যা সাক্ষী অথবা ভুয়ো ভিডিও/অভিও ফুটেজ/ক্লিপিংস্ ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে চেকবুক সাংবাদিকতার প্রয়োগও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'ফার্স্ট ড্রাফট নিউজ'-এর ক্লেয়ার ওয়ার্ডল্ মোট সাত রকমের পেক নিউজ নির্ণয় করেছেন। সেগুলি হল :

১। প্রহসন/পারোডি — বোকা বানানোর জন্য, কৌতুকের

২। অসামঞ্জস্য/মিসলিটিং — শিরোনাম বা ছবির সাথে বিষয়বস্তুর কোনও মিল নেই।

৩। বিভ্রান্তি/কনফিউান — কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ভুল তথ্যের সাহায্যে বিকৃত করা।

৪। প্রেক্ষাপট/কনটেক্স — সঠিক বিষয় ও তথ্যকে ভ্রান্ত প্রেক্ষাপটে পরিবেশন করা।

৫। সোর্স/সূত্র — মিথ্যা বা বানানো/সাজানো সূত্রের উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশন করা।

৬। Manipulated/Doctored/বিকৃতি — তথ্য বা ছবির বিকৃতি ঘটিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন।

৭। Fabricated/সম্পূর্ণ ভুল — যখন সম্পূর্ণরূপে ভুল তথ্যকে ইচ্ছা করে পরিবেশন করা হয় মানুষকে ঠকানোর জন্য।

সামাজিক মাধ্যমে ফেক নিউজে অন্য স্থানের অন্য পারিপার্শ্বিকের ছবি ব্যবহার ধরে ফেলতে অন্তর্জালে বিভিন্ন পদ্ধতি এখন জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কেস স্টাডি/উদাহরণ

কোভিড-১৯ : দুনিয়া এখন কোভিড-১৯ বা কোরোনা ভাইরাস সংক্রমণের মধ্যে যাচ্ছে। এই সময় দেখা যাচ্ছে ফেক নিউজের বাড়বাড়ন্ত। হঠাৎই দেখা গেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়াচ্ছে যে এই ভাইরাস চীন থেকে এসেছে এবং একে 'চায়না ভাইরাস' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এরপর এল একটি অডিও ক্লিপ যেখানে চীন প্রবাসী ভারতীয় হিন্দি ভাষায় দাবি করলেন যে গরমজল এবং চা খেলে নাকি কোরোনা সংক্রমণ ঠেকানো যাবে। তারপর এক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল যে সরকার বলেছে মাস্ক পরার কোনও দরকার নেই। বলাই বাহুল্য, এই তিনটি বিষয়ের একটির স্বপক্ষেও কোনও সরকারি বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ICMR-ও এই বক্তব্য সমর্থন করেনি। কিন্তু এই সব বিভ্রান্তিকর সংবাদে সমাজে যারপরনাই বিশৃঙ্খলা, প্যানিকের সৃষ্টি হয়। মানুষ ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের নানারকমের কভারেজ দেখে।

১.৩.৭ প্লেগিয়ারিজম

কারুর মৌলিক লেখাকে নিজের নামে প্রকাশ করার যে অনৈতিক এবং অবৈধ অভ্যাসকে 'প্লেগিয়ারিজম' বলা হয়। এক্ষেত্রে লেখার মধ্যে লেখকের ভাষা এবং চিন্তাভাবনার মৌলিকত্বও থাকে। এর উৎপত্তি মূলতঃ গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে। দেখা গেছে যে কারুর মৌলিক গবেষণা পত্রকে হুবহু বা বহুলাংশে আরেকজন নিজের নামে ছেপেছেনে। এক্ষেত্রে আকাদেমিক মহলে কিছু শাসিত বিধান আছে। এমফিল ও পিএইচডির মতো ডিগ্রি প্লেগিয়ারিজম-এর দায়ে প্রমাণিত হলে খারিজ পর্যন্ত হয়ে যায়।

সাংবাদিকতার জগতেও প্লেগিয়ারিজম-এর আধিক্য সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে। একটি প্রতিবেদন থেকে সম্পূর্ণ টুকে এক সাংবাদিক নিজের নামে ছেপেছেন। এ তো সম্পূর্ণ অনৈতিক বটেই এবং যদি যেখান থেকে টুকেছেন তার কপিরাইট থাকে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যমের বৃদ্ধি বিশেষতঃ ২৪ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেল এবং অনলাইন পোর্টালগুলিতে বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট-এর চাহিদা খুব বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন সাংবাদিকরা। অনেকেই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লেখা তৈরি করতে না পেরে 'প্লেগিয়ারিজম'-এর পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। এখন ইন্টারনেটে কনটেন্ট প্রচুর এবং সেখান থেকেই বেশিরভাগ প্লেগিয়ারিজম হয়। প্লেগিয়ারিজম'-এর জন্য বহু সাংবাদিকের চাকরি চলে গেছে। প্রায় সব সংবাদসংস্থাই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, নিয়ম কানুনে 'প্লেগিয়ারিজম'-এর জন্য কড়া শাস্তির বিধান রেখেছে।

প্লেগিয়ারিজম নানাবিধ আছে, যেমন—

১। আংশিক প্লেগিয়ারিজম — কিছুটা নিজের কিন্তু বেশির ভাগই অন্য কারুর লেখা থেকে টোকা।

২। সম্পূর্ণ প্লেগিয়ারিজম — অন্য কারুর লেখা সম্পূর্ণ নিজের নামে চালানো।

৩। ইচ্ছাকৃত প্লেগিয়ারিজম — ব্যক্তি জেনে বুঝে সজ্ঞানে টুকেছেন।

৪। অনিচ্ছাকৃত প্লেগিয়ারিজম — ব্যক্তি বুঝতে না পেরে অথবা নিজের অজান্তে অন্য কারো লেখাকে নিজের লেখায় জায়গা দিয়েছেন।

প্লেগিয়ারিজম কেন অনৈতিক?

একজন মানুষ তার বিচার-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেচনা ও গবেষণার লব্ধ ফলকে অত্যন্ত কষ্টে এক জায়গায় করে একটি লেখা (প্রবন্ধ/গল্প/উপন্যাস/শোধপত্র) তৈরি করেন। তার বিনা অনুমতিতে তার লেখা টুকে আরেকজন নিজের নামে ছাপালেন। এতে যিনি টুকলেন তিনি আসল লেখককে তো ঠকালেনই, যে মানুষেরা তার লেখা পড়লেন তাদেরও ঠকালেন। এবং যদি এই কাজ করে তিনি কোনও উপাধী, যশ বা অর্থ পান তাহলে তো তা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বলিউড-এ সঙ্গীত পরিচালকদের বিরুদ্দে সুর চুরির অভিযোগ এসেছিল।

কিভাবে প্লেগিয়ারিজম এড়ানো যায়?

প্লেগিয়ারিজম এড়ানোর সবচাইতে ভালো পন্থা হল যেখান থেকে আপনি তুলে নিজের লেখায় দিচ্ছেন, সেই সূত্রকে স্বীকৃতি দিন। অর্থাৎ পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে হবে কোন অংশটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে। আকাদেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে একে 'Citation' এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একে 'Refereycing' বলা হয়। এরও নির্দিষ্ট কায়দা আছে যা শিখে রাখাও সাংবাদিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

তাছাড়া আজকাল Turnitin, Urkund এবং Grammarly-র মত শত শত কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং মোবাইল অ্যাপ বেরিয়ে গেছে যেখানে খুব সহজেই প্লেগিয়ারিজম চেক বা সংশোধন করা যায়। সাংবাদিকরা কিন্তু অনেকেই এই সব পদ্ধতি না মেনে সহজেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সাহায্যে বলীয়ান হয়ে 'কাট, কপি, পেস্ট' অর্থাৎ টুকে মেরে দিচ্ছেন। এতে আখেরে তাঁর নিজের এবং তার সংস্থার মর্যাদাহানি হবে। সাম্প্রতিককালে প্লেগিয়ারিজমকে কেন্দ্র করে বহু অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ চাপান-উতোর চলছে এবং অভিযুক্ত মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা একটা ধাক্কা খায়।

অনেক সাংবাদিক নিজেদের পুরানো ছাপা লেখাকেই সামান্য পরিবর্তন যেমন নাম, করে নতুন করে ছাপিয়ে দেন। এই কাজও 'self plagiarism'-এর মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রেও সাংবাদিকের নিজের পুরনো লেখার রেফারেন্স দিতে হবে।

নীতিমালা

বর্তমান এককে যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে যে বিষয়গুলি তার সবকটিই সাংবাদিকতা পেশার ব্যবহারিক দিকের সাথে যুক্ত। সাংবাদিকতার পেশাদারি আচার সংহিতায় এ নিয়ে কি আছে তা দেখা যাক—

(ক) **পীত সাংবাদিকতা** — ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নীতিমালায় ১ ও ২নং পয়েন্টে যথাক্রমে বস্তুনীঠেতা এবং প্রাক্-প্রকাশ তথ্য যাচাই-এর কথা বলা আছে। সেক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে পীত সাংবাদিকতা যেহেতু অতিরঞ্জিত এবং উত্তেজক, তা কখনোই বস্তুনীষ্ঠ হতে পারে না। পীত সাংবাদিকতা বহুলাংশেই গুজব ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল ফলে এখানে সংবাদ সূত্র ও তথ্য যাচাই করার কোনও সুযোগ নেই। এছাড়া ৩ নং পয়েন্টে যা কিছু মানহানিকর তা না ছাপতে বলা হয়েছে কিন্তু অনেক সময়ই পীত সাংবাদিকতা ট্যাবলয়েডের মূল অবলম্বন এবং এর দ্বারা ব্যক্তি ও সংস্থার সম্মানহানি ঘটে।

(খ) **চেক বুক সাংবাদিকতা** — যদিও ইংল্যান্ড ও ইয়োরোপে চেক বুক সাংবাদিকতা নিয়ম ও নীতিসঙ্গাত। আমেরিকা, ভারত সহ বহু দেশে তা নয়। বৃহৎ সংবাদপত্র যেমন 'লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস' এবং 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্স' তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে একে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। 'সোসাইটি পর প্রফেশনাল জার্নালিস্টস' (SPJ) তাদের আচার সংহিতায় এই পদ্ধতিকে অনৈতিক ঘোষণা করেছে কারণ প্রথমতঃ এতে খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না এবং দ্বিতীয়তঃ এতে স্বার্থের সংঘাত ঘটে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে। এতে সূত্র ও সাংবাদিকের মধ্যে এক ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় যা সাংবাদিকতা পেশার শক্তিকে দুর্বল করে।

(গ) **পেইড নিউজ** — 'সোসাসটি ফর প্রফেশনাল জার্নালিস্টস' (SPJ) আচার সংহিতায় 'Act Independently' বা 'স্বাধীনভাবে কাজ করুন' বিভাগে সংবাদ বা তথ্যের জন্য কোনও রকম অর্থ, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকে অনৈতিক বলা হয়। এই কাজ পেশাদারি আচরণ-এর লংঘন। একই কথা Editor's Guild এবং ভারতের প্রেস কাউন্সিল-এর আচার সংহিতায় (নং ২৮ ও ৩০)-এ বলা আছে।

(ঘ) **প্লেগিয়ারিজম** — ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত আচার সংহিতার (২০১০) ২৮ নং পৃষ্ঠায় ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং পয়েন্ট প্লেগিরিজম্-এর ঘটনা ও ক্রিয়াকে দ্বর্থহীন ভাষায় অনৈতিক বলা হয়েছে। অন্যের আইডিয়া বা লেখাকে স্বীকৃতি না দিয়ে নিজের বলে চালানো, কপিরাইট লংঘন, অন্য সংবাদপত্রের প্রতিবেদন টোকা, অনুমতি ছাড়া কোনও পুনঃপ্রকাশ এ সবই সাংবাদিকের পেশাদারী আচরণের পরিপন্থী।

১.৩.৮ সারাংশ

এই এককটি মূলতঃ সাংবাদিকতার অনৈতিক যে অভ্যাস বা ধারা চলছে তার বর্ণনা দিয়েছে। পীত সাংবাদিকতা, চেক বুক সাংবাদিকতা, পেইড নিউজ, ফেক নিউজ এবং প্লেগিয়ারিজম, এসব কটিই একে অন্যের দোসর এবং একটি আসলে

অন্যটিও সহজেই আসে। একজন সচেতন, আত্মনির্ভর, সৎ এবং পেশাদারীত্ব সম্পন্ন সাংবাদিক কখনওই এই বদ অভ্যাসগুলি অনুশীলন করবেন না। তিনি এই শর্টকাটে সাফল্য পাওয়ার রাস্তা পরিহার করে বরং নিজের সাংবাদিকতার শক্তি ও ক্ষমতায় শান দেবেন এবং কঠোর পরিশ্রম-এর মাধ্যমে নিজের জায়গা পোক্ত করবেন। কারণ, অনৈতিক পদ্ধতিতে পাওয়া সাফল্য চিরস্থায়ী হয় না। তবে, এ কথা অনস্বীকার্য যে দিনে দিনে যে ভাবে সংবাদ ও গণমাধ্যম সংস্থাগুলির মধ্যে যে ভাবে প্রতিযোগিতা বাড়ছে তাতে সাংবাদিকদের ওপর ভয়ংকর চাপ বাড়ছে এবং অনৈতিক পথে যাওয়ার হাতছানি ও বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষিত ও নীতিসম্পন্ন সাংবাদিকের শুভবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধের ওপরেই সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে কারণ শুধুমাত্র আচার সংহিতা যথেষ্ঠ নয়।

১.৩.৯ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

(ক) পীত সাংবাদিকতার ইতিহাস বর্ণনা কর এবং এর সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ উল্লেখ কর।

(খ) 'চেক বুক সাংবাদিকতা সম্পূর্ণরূপে অনৈতিক নয়' — যুক্তিসহ তোমার মতামত লেখ।

(গ) 'পেইড নিউজ এক ওপেন সিক্রেট' — সাম্প্রতিক ধারা বর্ণনা কর এবং এ ব্যাপারে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা বর্ণনা কর।

(ঘ) 'কোভিড-১৯ এর সময় এক বৈশিষ্ট্য হল ইনফোডেমিক' — এই ইনফোডোমিক প্রসঙ্গে 'ফেক নিউজ-এর ভূমিকা বর্ণনা কর।

২। টীকা লেখ :

(ক) জোসেফ পুলিতজার

(খ) উইলিয়াম র‍্যাণ্ডলস্ হার্স্ট

(গ) পীত সাংবাদিকতা

(ঘ) ট্যাবলয়েড

(ঙ) চেক বুক সাংবাদিকতা

(চ) পেইড নিউজ

(ছ) ফেক নিউজ

(জ) ইনফোডেমিক

(ঝ) প্লেগিয়ারিজম

(ঞ) স্বার্থের সংঘাত

১.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ethics in Journalism — Ron F Smith (Black well)

২। Media and Ethics — S. K. Aggarwal (Shipra)

৩। সংবাদ প্রতিবেদন — বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক - ৪ ❐ গণমাধমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ-ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত আচার সংহিতা

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ প্রস্তাবনা

১.৪.৩ গণমাধ্যমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ

১.৪.৪ **Ombudsman**

১.৪.৫ ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালা

১.৪.৬ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আচার সংহিতা

১.৪.৭ ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত নীতিমালা

১.৪.৮ সারাংশ

১.৪.৯ অনুশীলনী

১.৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.৪.১ উদ্দেশ্য

ইতিপূর্বে আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছি গণমাধ্যমের নীতিগত দিক নিয়ে। এই এককে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। গণমাধ্যমের মালিকানা কার; কত প্রকারের এবং কিভাবে তার ধারা পরিবর্তন হচ্ছে। মালিকানার সাথে নীতি-র বিষয়টি কিভাবে যুক্ত এবং তা কিভাবে সাংবাদিকতার পেশাগত, সিদ্ধান্তগত এবং ব্যবহারিক দিক-কে প্রভাবিত করছে তা সম্যক বোঝা এই এককের উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, যেমন, ভারতের প্রেস কাউন্সিল, এডিটরস গিল্ড, সোসাইটি কর প্রফেশনাল জার্নালিস্টস ইত্যাদি সাংবাদিকদের জন্য নীতিমালা বা 'কোড অফ এথিক্স' প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো জানা দরকার সাংবাদিকতা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে। ভারতের নির্বাচন কমিশনও নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন। বর্তমান এককের উদ্দেশ্য সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীদের পেশাদারি আচার-আচরণ এবং নীতিগত বিষয়গুলি নিয়ে সম্যক অবহিত করা।

১.৪.২ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্যক্তি-সম্পাদকের হাত ধরে। যারা মূলতঃ একটি সংবাদপত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, উপার্জনের তাগিদেই হোক বা সমাজ সংস্কারের জন্য। প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সম্পাদক জেমস্ হিকি মূলতঃ পেশাগত ভাবেই কাগজ শুরু করেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের মতো মানুষের লক্ষ্য ছিল অন্য — তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে সমাজে তাঁর মতামত এবং আলোচনার উদ্দেশ্যেই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সমাজসংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখছি, অনেকেই ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করছেন। যেমন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' অথবা বাল গঙ্গাধর তিলক-এর 'মরাঠা' ও 'কেসরি'। মহাত্মা গান্ধী যখন 'Young Indian' বা 'হরিজন' প্রকাশ করেন তাঁর মূল উদ্দেশ্য

ছিল ভারতের স্বার্থ জনমানসে তুলে ধরা, ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং সত্যাগ্রহের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। সমাজ সংস্কার সর্বদাই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সংবাদপত্রের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এবং তার সাথে স্বাভাবিক ভাবেই, এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুষঙ্গ। নেহরু, সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আজাদ, অ্যানি বেসান্ত — ভারতের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সংবাদপত্রকে নিজের সংযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অর্থাৎ, যতদিন সংবাদপত্রে ব্যক্তি মালিকানা ছিল, বিশেষতঃ প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, তার এক ''মিশনারি'' বা সেবামূলক, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ উদ্দেশ্য ছিল। স্বাদীনতা আন্দোলনের তীব্রতার সাথে সমাজে সংবাদপত্রের প্রভাব বাড়তে শুরু করল। আমরা পেলাম বৃহৎ সংবাদপত্র — অমৃতবাজার, বসুমতী, আনন্দবাজার, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে সংবাদপত্র বৃহৎ শিল্পে পরিণত হল — শুধুমাত্র ব্যক্তির পক্ষে আর এই বৃহৎ সংস্থা চালানো সম্ভবপর ছিল না। তাই যে কোনও ব্যবসায়িক সংস্থার মতই পার্টনারশিপ, জয়েন্ট স্টক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ধাঁচে আত্মপ্রকাশ করল বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা। ভারত সরকার আগেই অল ইন্ডিয়া রেডিও অধিগ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে তারা চালু করে দূরদর্শন। সরকারি মালিকানায় গণমাধ্যম নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়।

এরপর বড় পরিবর্তন আসে '৯০-এর দশকের গোড়ায় বিশ্বায়নের মাধ্যমে। মুক্ত অর্থনীতির আবহে 'স্টার টিভি'-র মতো বিদেশি কোম্পানি এবং 'জিটিভি'-র মতো শত শত দেশি কোম্পানি বা নেটওয়ার্ক মিডিয়া বাজারে ঢুকল। বর্তমানে গণমাধ্যমে 'ক্রস মিডিয়া' মালিকানা বা 'কর্পোরেট মালিকানা'-য় ভরে গেছে। একটি বিশেষ কোম্পানি/ গ্রুপ-এর ছত্রছায়ায় আছে সব রকমের গণমাধ্যম — সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও, পোর্টাল ইত্যাদি। যেমন, এবিপি গ্রুপ-এর অধীনে আনন্দবাজার পত্রিকা, এবিপি আনন্দ, এবিপি নিউজ, সানন্দা, আনন্দলোক ইত্যাদি। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নাম ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ, সান গ্রুপ, জি গ্রুপ, সোনি গ্রুপ ইত্যাদি।

বদলে যাওয়া মালিকানা, অভিমুখ-এর ফল যে সাংবাদিকতার নীতির জন্য খুব সুখকর হয়নি তা বলাই বাহুল্য। মুনাফাই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে নীতি বারংবার বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। উল্টো দিক থেকে অবশ্য কিছু প্রয়াস হয়েছে ব্যক্তি সাংবাদিক বা সরকারের পক্ষ থেকে। পরবর্তী অংশে আমরা মালিকানার ধরণগুলি এবং নীতির বিষয়গুলি একটু বিশদে ব্যাখ্যা করব।

গণমাধ্যম মালিকানার সাম্প্রতিক ধারা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে ব্যক্তিগত মালিকানা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম সংস্থার ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রসঙ্গত। ভারতের প্রথম কাগজ থেকেই ব্যক্তি মালিকানার চল, এখনো চলে আসছে। তবে তার ধরণ পাল্টেছে, সাংগঠনিক কাঠামো পাল্টেছে, পরিচালন পদ্ধতি পাল্টেছে এবং পরিচালনায় অনেক পেশাদারিত্ব এবং কর্পোরেট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে যেহেতু সংবাদমাধ্যমের 'রাজস্ব' বা 'রেভেনিউ'-এর 'মডেল' বা 'পদ্ধতি'-এর বিরাট দর্শনগত পরিবর্তন ঘটে গেছে যার জন্য এই পরিচালন পদ্ধতি বা মালিকানার চরিত্র পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

গান্ধীজি সর্বদাই চেয়েছেন সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের সাহায্য ছাড়া চলুক। তিনি চাইতেন সংবাদপত্র শুধুমাত্র পাঠক আনুকূল্যে অর্থাৎ সার্কুলেশনের জোরে বেঁচে থাকবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে গণমাধ্যমের মালিকানার সাবেকি রূপ সংবাদপত্রের বিকাশ ও উদএবর সাথে যে মালিকানার রূপগুলি প্রচলিত এবং প্রসঙ্গত সেগুলি হল—

(১) **ব্যক্তিগত মালিকানা —** একজন ব্রক্তি যখন সম্পূর্ণ মালিক; আজকাল অনেক ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক নেতাও সংবাদপত্রের মালিক।

(২) **অংশীদারী মালিকানা** — দুই বা তার অধীক ব্যক্তি চুক্তির ভিত্তিতে সংবাদপত্র চালানো। অংশীদারী মালিকানার সীমানা নির্ধারিত থাকে সিদ্ধান্তে মতপার্থক্য থাকে, লাভ-ক্ষতির পরিমাণ সবাই ভাগ করে।

(৩) কর্পোরেশন — বিনিয়োগকারীদেরও শেয়ারের ক্রয়ের টাকা পুঁজি করে বরবসায়িক কাঠামোয় চলে। যে কোনও সময়ে সম্প্রসারণ করা যায় মূলধন বাড়িয়ে এবং বাজারে শেয়ার ছাড়া যায়। তবে সরকারি নিয়মকানুনের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়।

(৪) গোষ্ঠি (Group) মালিকানা — একটি মালিকের অধীনে যখন অনেকগুলি সংবাদপত্র থাকে তখন তাকে গ্রুপ বা গোষ্ঠি মালিকানা বলা হয়। যেমন, বেনেট এন্ড কোলম্যান গ্রুপের অধীনে আছে দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, নবভারত টাইম্‌স, ইকনমিক টাইমস প্রভৃতি। এতে প্রযোজনা ব্যয় অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়।

(৫) কর্মচারি (employee) মালিকানা — এই ব্যবস্থায় কর্মচারিরা সংস্থার শেয়ার কিনে মালিকানায় অংশগ্রহণ করেন। কখনও শেয়ার অধিগ্রহণ করে কর্মচারিরা ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন নির্দিষ্ট শর্তে। তবে এর নিদর্শন বিরল।

সংবাদপত্রের সাথে বিজ্ঞাপন শিল্পের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেরাও শিল্পে পরিণত হল। কালে কালে বিজ্ঞাপনই সংবাদ মাধ্যমে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট গৌণ। যার যত বেশি পাঠক বা দর্শক সংখ্যা তার তত বেশি বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ এখানে এক অদ্ভুত ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম, উপভোক্তা এবং বিজ্ঞাপনদাতার মধ্যে যা আজকের নতুন রেভেনিউ মডেলের কাঠামো এবং কর্পোরেট মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থার কাজই হচ্ছে এই কাঠামোকে পুষ্ট করা এবং তার মাধ্যমে যত বেশি মুনাফা আয় করা যায় তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

১.৪.৩ গণমাধ্যমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ

এইখানে আমরা গণমাধ্যমের বিভিন্ন মালিকানা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোনা করব—

১। **চেন মালিকানা** — এই ব্যবস্থায় একটি কোম্পানি অনেকগুলি একই ধরনের গণসাধ্যমের মালিকানা হাতে রাখে অর্থাৎ একাধিক/অনেকগুলি সংবাদপত্র, রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন স্টেশন অথবা প্রকাশনী। সাধারণতঃ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই এটা ভারতে বেশি পাওয়া যায়। টাইমস অব ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার, হিন্দু ইত্যাদি সংস্থার হাতে একাধিক প্রকাশনী আছে। দূরদর্শন ও আকাশবাণীর কাছেও প্রচুর স্টেশন আছে যদিও এগুলি সরকারের অধীন।

২। **ক্রস মিডিয়া মালিকানা (ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন)** — যদি কোনও কোম্পানি নিজের অধীনে নানা রকমের গণমাদ্যম রাখে অর্থাৎ সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনের পাশাপাশি প্রকাশনী, সঙ্গীত লেবেল ইত্যাদি। এছাড়াও এর মধ্যে দেখা যায় বিষয়বস্তু, বাহক এবং পরিবেশক একই থাকছে একটি নির্দিষ্ট গণমাধ্যম বাজারে — যেমন টিভি বা রেডিও, বাজারের ভাগও একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেই গণমাধ্যমের জন্য। এই ব্যবস্থার পোষাকি নাম 'ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন'।

সংবাদ প্রতিবেদন গ্রন্থে আমরা জানতে পারছি যে এই ধরনের মালিকানায় অনেক সুবিধা কারণ মালিক তার অধীনস্থ নানা সম্পদ ও সুবিধা অর্থাৎ resources-কে ব্যবহার করে উৎপাদনের খরচ কমাতে পারেন এবং মুনাফা বাড়াতে পারেন। কিন্তু এর প্রতিবন্ধকতাও আছে যথা—

''এই ধরনের মালিকানার সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হল, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র পরিচালন ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ মালিকানার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে সংবাদপত্র পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। সংবাদপত্রের উন্নতি ও অগ্রগতিতে এই বিশেষ মনোযোগ কিন্তু খুবই জরুরি। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মূলধন প্রয়োজনে মালিকানার অধীন যে-কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ হতে পারে। যেমন সংবাদপত্র ব্যবসার মূলধন নিয়ে বিজ্ঞাপন ব্যবসায় লাগানো যেতে পারে। এতে সংবাদপত্রের অগ্রগতি ও অস্তিত্ব দুইই সংকটের মধ্যে পড়তে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শিকাগো ট্রিবিউন' পত্রিকা এই উল্লম্ব মালিকানার পর্যায়ভুক্ত। এই পত্রিকার প্রায় পঁচিশটি সহযোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে রয়েছে।'' (ভট্টাচার্য ২০০৯ : ১৩৬-১৩৭)

৩। **কংগ্লোমোরেট মালিকানা** — একটি পরিবার/সংস্থা বা ব্যক্তি যদি বহু ব্যবসার মালিক হন এবং তার মধ্যে একটি গণমাধ্যম — অর্থাৎ, একটি সিমেন্ট কোম্পানির রাবার, প্লাস্টিক, রাসায়নিকের সাথে প্রকাশনী সংস্থা সংবাদপত্র, পত্রিকাও আছে, একেই বলা হচ্ছে কংগ্লোমোরেট। বর্তমান বহু গণমাধ্যম সংস্থার মালিক হচ্ছেন অন্য ব্যবসার মালিকেরা। তাঁর মূল ব্যবসা খুব বড় বা বৃহৎশিল্পের কিন্তু মূলতঃ সামাজিক প্রতিপত্তি, প্রভাব ও ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার জন্য তিনি মিডিয়ার ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি জনমত এবং সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। দেশে এই ধরনের কংগ্লোমোরেট এখন অনেকগুলি আছে। তবে একথা সত্যি যে এই ব্যবস্থায় পক্ষপাতদোষমুক্ত থাকা একেবারেই সম্ভব হয় না এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ বারবারই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মালিকানা ও নীতির ওপর প্রভাব—

গণমাধ্যমের বিভিন্ন রকমের মালিকানা বিশেষতঃ তার সাম্প্রতিকতম ধারাগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে মালিকানার পরিবর্তনের সাথে তা পরিচালনা, মাধ্যমের কর্মপদ্ধতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। স্বাভাবিক ভাবেই, সাংবাদিকদের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং নীতির ওপর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

পর্যবেক্ষণে যে সব বিষয়গুলি উঠে আসছে তা হল—

(ক) বিরাট গণমাধ্যম বাজারের দখল মুষ্টিমেয় কিছু সংস্থার হাতে আছে। অর্থনীতির ভাষায় যাকে ওলিগোপলি বলা হয়।

(খ) ক্রস মিডিয়া মালিকানা অথবা কংগ্লোমোরেটদের ব্যাপারে আইনি যে ব্যবস্থা তার অসঙ্গতির কারণে এদের হাতে বাজার চলে যাচ্ছে। ভার্টিকাল (মাধ্যমগত) এবং হোরাইজন্টাল (ভৌগোলিক) এই দুরকমেরই বাজারে এঁরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

(গ) রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কর্তৃত্ব বাড়ছে গণমাধ্যমের মালিকানা ও পরিচালনায়।

১.৪.৪ Ombudsman

বিখ্যাত দার্শনিক-লেখক-সাংবাদিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'অন লিবার্টি' গ্রন্থে সংবাদমাধ্যমের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার হয়ে জোরালো সওয়াল করেছিলেন যেখান থেকে 'থ্রি প্রেস' তত্ত্বের উদদ্ভব। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের বিকাশ, বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রশক্তির সাথে সংবাদমাধ্যমের রসায়ন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে প্রগতিশীলতা ও গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হিসেবে উঠে এসে মুক্ত ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের পর্যায়ে তার মুখোমুখি ছিল ইয়োরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন। স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয় এবং এখান থেকেই স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ইয়োরোপীয় শাসন অবসান হল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল এবং সংবাদমাধ্যম কিছুটা স্বাধীনতা পেয়ে বাণিজ্যিক শিল্পের দিকে এগোল, তখন এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। প্রশ্ন উঠল গণমাধ্যমেরই কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডের প্রেক্ষিতে, যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কি অবাধ? গণমাধ্যমের অনৈতিকতার বিষয়টি কে দেখবে? এইখান থেকেই উঠে এল গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব।

যদিও অনেক দেশে সরকার স্বনিয়ন্ত্রণের অবকাশ দেয়নি, আইন প্রণয়ন করেছে, ভাতের মতো কিছু দেশে Self Regulatory Mechanism বা স্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া হিসেবে সংস্থা তৈরি হয়েছে। এই সংস্থার মাথায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিন্তু সদস্যরা অধিকাংশই গণমাধ্যমের প্রতিনিধি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সীমিত ক্ষমতার জন্য প্রেস কাউন্সিল খুব একটা কার্যকরী হতে পারেনি। এর মূল কারণ কাউন্সিল সমস্যাকে স্বীকৃতি দিতে পারে, সতর্ক করতে পারে, ভর্ৎসনা করতে পারে কিন্তু শাস্তি দিতে পারে না। ইতিপূর্বে 'পেইড নিউজ' প্রসঙ্গে দূরবর্তী এককে আলোচনা করেছি কিভাবে প্রেস কাউন্সিল তার নিজস্ব তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে অপারগ। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে খোদ বড় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা যারা কাউন্সিলকে প্রভাবিত করছেন।

এক্ষেত্রে স্ব-নিয়ন্ত্রণের আরও বুনিয়াদি পর্যায়ে গিয়ে প্রতিটি গণমাধ্যমের নিজস্ব স্বনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যা তার একান্ত আভ্যন্তরিন, সেই 'ওমবুডসম্যান' (Ombudsman) তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম অর্থাৎ চ্যানেলগুলি 'নিউজ ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্স অথরিটি' (NBSA) গঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বনিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছে। প্রেস কাউন্সিলের আওতায় তারা আসে না। প্রেস কাউন্সিলের পরিধি কেবলমাত্র মুদ্রিত গণমাধ্যম পর্যন্ত সীমিত।

ওমবুডসম্যান-এর তত্ত্ব সুইডেন থেকে উৎপত্তি হলেও সর্বপ্রথম ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কাউন্টার জার্নাল' এবং 'লুই ভিল টাইমস্'-এ ওমবুডসম্যান নিয়োগ হয়।

এই উপলব্ধি থেকেই বিশ্বের তাবড় সংবাদপত্রে 'পাবলিক এডিটর' বা 'রিডার্স এডিটর' পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদটি এক ধরনের আভ্যন্তরীন ওমবুডসম্যান। সংবাদপত্রে যত লেখা ছাপা হবে, তা খুঁটিয়ে পড়া এবং ভুল-ত্রুটির খতিয়ান তৈরি করা এই রিডার্স এডিটর-এর কাজ। প্রয়োজনে তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবাদপত্র ত্রুটি স্বীকার করবে, দুঃখপ্রকাশ করবে এবং সংশোধন করবে। এছাড়াও পাঠক প্রতিক্রিয়া, পাঠকদের চিঠি যত্ন সহকারে পড়ে সংবাদপত্রের কাছে তাদের প্রত্যাশার দলিল তৈরি করাও ওমবুডসম্যান-এর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি বিভাগ বা কলাম, পাঠকের কেমন লাগছে, এই প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করেই সংবাদপত্র তার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। প্রতিযোগিতার বাজারে জনপ্রিয়তা অটুট রাখতে পাঠকের মতামতকে গুরুত্ব দিতেই হয়। তাছাড়া ভুল স্বীকার ও সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে নিজের দায়িত্ববোধের পরিচয়ও দেওয়া যায় যা সুদূর ভবিষ্যৎ-এ সংবাদপত্রকে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে। তাছাড়া, ওমবুডসম্যান-এর মারফৎ অনেক বিপদ বা বিপর্যয়ের আগাম আভাস পাওয়া যায় এবং সংশোধনের মাধ্যমে সেই বিপর্যয় এড়ানো যায়। দেখা গেছে যে সকল সংবাদপত্র ওমবুডসম্যানকে গুরুত্ব দেয়, তারা দীর্ঘদিন বাজারে টিকে থাকে।

সম্পাদকীয় নীতির সাথে ওমবুডসম্যান-এর সম্পর্ক নিবিড়। যে কাগজের সম্পাদকীয় নীতি নমনীয় এবং ওমবুডসম্যানকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সংশোধনী করে, তাই নীতিনিষ্ঠ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ওমবুডসম্যান-এর স্বাধীনতাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ওমবুডসম্যান-এর বিচার ও কণ্ঠস্বর হবে নির্ভিক এবং মুক্তকণ্ঠে সে সম্পাদকীয় নীতিকে সমালোচনা করতে পারবে, তবেই তা সার্থক হবে। এবং পাঠকের সাথে ওমবুডসম্যান-এর সম্পর্ক স্থাপন করার এক প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট থাকবে। Appeal System-এর মাধ্যমে পাঠক তার প্রতিক্রিয়া জানাবে। এবং ওমবুডসম্যান, পাঠক ও সংবাদপত্র — এস ত্রিভুজের সম্পর্ক হবে স্বচ্ছ। খোলা মনে সংবাদপত্র ভুল স্বীকার করে সংশোধন করবে। এতেই ওমবুডসম্যান-এর সার্থকতা।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক যে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষা করার জন্য বহু দেশেই সংসদ-নিরপেক্ষ, প্রশাসন-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র সংস্থা থাকে সরকারের কাজের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য। সুইডেন-এ ১৮০৯ সালে প্রথম এই জাতীয় ওমবুডসম্যান নিয়োগ হয়। ভারতে ১৯৬৬ সালে Administrative Reforms Commission বা প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন হয় এবং এর সুপারিশ ছিল দ্বি-স্তরীয় ওমবুডসম্যান নিয়োগ করা — কেন্দ্রে 'লোকপাল' এবং রাজ্যে রাজ্যে 'লোকায়ুত'। দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যগুলিতে একে একে এই প্রস্তাব কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্রে Central Vigilance Commissioner এই দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

ভারতে সাংবাদিক ও সম্পাদকদের অনেকগুলি ছত্রসংস্থা আছে যেমন Editor's Guild, Society for Biferial Journalists, Public Reletionas Society of India ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকেরই পেশাগত আচার সংহিতা আছে। কিন্তু সেই আচার সংহিতা সংবাদপত্র যথাযথ পালন করছে কিনা তা দেখার জন্য খুব কম কাগজই আভ্যন্তরিন ওমবুডসম্যান নিয়োগ করেছে। 'দ্য হিন্দু' অবশ্য ব্যতিক্রম কারণ সেখানে 'Reader's Editor' পদ আছে।

১.৪.৫ ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ইংরেজ শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সংবাদপত্র। কত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সাংবাদিক, লেখক ও সম্পাদকদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তবু সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা যায়নি। তিলক থেকে গান্ধী, প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। স্বভাবতই, স্বাধীনতার পর পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সাংবাদিকতার প্রসারে উদ্যোগী হন। মূলতঃ তাঁর উদ্যোগে ১৯৫২ সালে ১ম প্রেস কমিশন গঠিত হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উপদেশক শ্রী এম. চলপতি রাও-এর নেতৃত্বে। এই কমিান সাংবাদিকতা, সংবাদপত্রের সমস্যাগুলি, রাষ্ট্রের সাথে সংবাদপত্রের সম্পর্ক, ব্যবসায়িক বিষয় ইত্যাদি বিশদে খতিয়ে দেখে বেশ কিছু মূল্যবান সুপারিশ করে যার মধ্যে বেশিরভাগই রূপায়িত হয় এবং সেই রূপায়ণের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আজকের গণমাধ্যমের ব্যবস্থা। প্রথম প্রেস কমিশনেরই অন্যতম সুপারিশ ছিল সংবাদপত্রের পেশা ও পেশাগত নীতি ঠিকমতো পালন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য এক নিয়ন্ত্রক সংস্থা নির্মাণ যেখানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাই নীতি নির্ধারণ করবেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিল সংসদে পেশ হয়। বহু টালবাহানার পরে ১৯৬৫ সালে এটি গৃহীত হয় এবং ১৪ই জুলাই ১৯৬৬ ভারতের প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় প্রেস কাউন্সিল বাতিল হয়ে যায়। ১৯৭৮-এ আবার নতুন করে প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয় এক নতুন আইন-এর মাধ্যমে। প্রেস কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপ :

চেয়ারম্যান — রাজ্যসভার অধ্যক্ষ, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ মনোনীত ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কমিটি মনোনয়ন করবে।

সদস্য — মোট ২৮ জন। ১৩ জন কর্মরত সাংবাদিক, এর মধ্যে ৬ জন সম্পাদক। সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালন গোষ্ঠির থেকে ৬ জন, সংবাদ সংস্থা (এজেন্সি) থেকে ১ জন, শিক্ষা/বিজ্ঞাপন/আইন/সাহিত্য/সংস্কৃতি জগৎ থেকে ৩ জন (ইউ.জি.সি, বার কাউন্সিল ও সাহিত্য আকাদেমী মনোনীত ১ জন করে। লোকসভার অধ্যক্ষ মনোনীত ৩ জন সাংসদ রাজ্যসভার মনোনীত ২ জন সাংসদ।

মূলতঃ প্রেস কাউন্সিলের দায়িত্ব হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা, আচার সংহিতা নির্মাণ, সাংবাদিকদের পেশাগত কর্তব্যবোধকে বিকশিত করা, জনস্বার্থমূলক সংবাদের প্রচার-প্রসার করা, বিদেশের টাকা ও সাংবাদিকতার উৎস ও প্রভাব যথাক্রমে পর্যালোচনা করা এবং সামুহিকভাবে সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ঘটানো। প্রেস কাউন্সিলের অধিকার

আছে যে কোনও ব্যক্তিকে সমন জারি করে হাজির হতে বলা, সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা এবং নীতিভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে ভর্ৎসনা করা। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার কোনও বিধান প্রেস কাউন্সিলের নেই। তাই একে বলা হয়েছে 'Watch Dog' অর্থাৎ নজরদার কুকুর যে চিৎকার করে শোরগোল করতে পারবে কিন্তু কামড়াতে পারবে না। অর্থাৎ, ভারতে প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা 'Ombudsman'-এর।

নীতিমালা

সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারা অর্থাৎ বাক্ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে সাংবাদিকের তথা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অন্তর্গত আছে। যেহেতু এই স্বাধীনতা এক নাগরিক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে তাই এক পেশাদার সাংবাদিকই এই অধিকার ভোগ করবেন। তবে কোনও অধিকারই অবাধ নয়। তাই সংবিধানের ১৯(২)-তেই যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ বলা আছে। এই দর্শনের ভিত্তিতেই প্রেস কাউন্সিলের আচার সংহিতা বা Code of Ethics রচিত হয়েছে।

প্রেস কাউন্সিলের নীতিমালার অন্তর্গত বিষয়গুলি হল :

(এই অংশটি 'সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রদত্ত প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধির ভিত্তিতে (পৃ. ২১৬-২২৭) রচিত)

১। **যাথার্থ্য ও সত্য/বস্তুনিষ্ঠ** — যা সত্য নয় তা ছাপা উচিত নয়। ঘটনার যথার্থ রূপ তুলে ধরতে হবে।

২। **প্রাক-মুদ্রণ সত্যতা/যাচাই** — কোনও বিষয় ছাপার আগে তার সত্যতা নির্ভরযোগ্য সূত্র ও সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির সাথে কথা বলে যাচাই করে নিতে হবে।

৩। **মানহানি/সতর্কতা** — কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মানহানি হয় এমন কোনও কিছু ছাপার আগে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত, এবং তা জনস্বার্থে করা উচিত। নচেৎ নয়। এ ব্যাপারে ভাষার সংযম থাকা উচিত। সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও এই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৪। **গোপনীয়তা** — জনস্বার্থে না হলে, কোনও ভাবেই কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তা লংঘন করা উচিৎ নয়। কোনও ব্যক্তির বিষয়ে কিছু লিখতে হলে বা তার ছবি কণ্ঠস্বর বা ডিডিও রেকর্ড করার আগে অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র সন্দেহ বা গুজবের ভিত্তিতে তার ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে আনা যাবে না। কোনও সাক্ষাৎকারও তার অনুমতি না নিয়ে রেকর্ড বা প্রকাশ করা উচিত নয়।

৫। **মহিলা ও শিশু** — মহিলা ও শিশুদের ওপরে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে নানাবিধ অত্যাচার প্রতিদিন হয়ে চলেছে। ধর্ষণ, লাঞ্ছনা, চোরাপাচার ইত্যাদির শিকার যে নারী ও শিশু, তাদের পরিচয় গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়। তাদের আসল নাম ও ছবি কখনোই যেন প্রকাশ্যে না আসে।

৬। **সংশোধনী/উত্তরদান/সম্পাদকের চিঠি** — অনেক সময় অনবধানবশতঃ সংবাদপত্র ভুল ছাপে। সেক্ষেত্রে সংশোধনী প্রকাশ করে দুঃখপ্রকাশ করা উচিত। সংবাদপত্রে যদি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোনও খবর বেরোয়, তার প্রত্যুত্তরে কোনও বক্তব্য আসলে সংবাদপত্রের উচিত সেটা প্রকাশ করা। এছাড়াও কোনও পাঠক যদি সম্পাদককে কোনও চিঠি লেখেন, সেটা প্রকাশ করা উচিত। তবে প্রত্যুত্তরের পালা কোথায় থামবে তা সম্পাদক ঠিক করতে পারেন।

৭। **সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রতিবেদন** — সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ ও দর্শন, তা সাংবাদিকতায় বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। এমন কোনও কথা লেখা উচিত নয় যা কোনও বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে

নেতিবাচক ভঙ্গীতে পরিবেশন করে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে, এমন কোনও উস্কানিমূলক বা প্ররোচনামূলক ভাষা ও বক্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়। জাতপাতের ক্ষেত্রেও একইরকম সংযম ও ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। হিংসাকে বড় করে দেখানো উচিত নয়।

৮। **প্রাকৃতিক বিপর্যয়/যুদ্ধ/আপৎকালীন পরিস্থিতি**/প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ বাঞ্ছনীয়। এই সময় তথ্য ও পরিসংখ্যান যেমন হতাহতের/আক্রান্তের সংখ্যা, গুরুত্বপূর্ণ সময় ও স্থান, সরকারি পদক্ষেপের বর্ণনা — এগুলি নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন যাতে কোনলভাবেই মানুষ বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত না হন। দেশে যুদ্ধ লাগলেও নির্ভুল তথ্যের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হয়। কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারি ও মহামারি বা ফণি বা আমফান-এর মতো জাতীয় বিপর্যয়ে মানুষের সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশার কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে হবে। যাতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে ও ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারে।

৯। **কূটনৈতিক ছাড়** — সংবাদপত্র কখনোই কূটনৈতিক ছাড়ের অপব্যবহার করবে না এবং প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

১০। **বিচারবিভাগীয় কাজের প্রতিবেদন** — যে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, তার বিষয়ে কোনও স্বাধীন, স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। আদালতের কার্যবিবরণী কোনও মন্তব্য ছাড়া বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবৃত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ব্যাখ্যায় বিবদমান কোনও পক্ষ বাড়তি সুবিধা পাক তা একেবারেই কাম্য নয়। বিচারবিভাগের স্বাধীন কার্যপ্রণালীতে বাধা দেওয়ার সমতুল্য বিবেচ্য হয়

১১। **ভাষা/শিরোনাম** — ভাষার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাষা যেন শালীনতা ও সীমারেখা মেনে চলে। শিরোনাম যেন বিভ্রান্তিমূলক না হয়। শিরোনামের সাথে সংবাদের বিষয়বস্তুর সাযুজ্য থাকা চাই।

১২। **বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী (বিজ্ঞাপন)** — বাণিজ্রিক সংস্থার স্বার্থে বা কাগজের জনপ্রিয়তার স্বার্থে নীতির সাথে আপোষ বাঞ্ছনীয় নয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশ হবে কিন্তু সমর্থিত হবে না। আইনানুগ বিজ্ঞাপনস ছাপা যাবে।

১৩। **প্লেগিয়ারিজম/অননুমোদিত প্রকাশ** — সূত্রকে স্বীকৃতি না দিয়ে, অন্যের লেখা বা চিন্তা, নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত। এই কাজ সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধ এক অপরাধ। একইভাবে অন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর/লেখা তুলে ছেপে দেওয়ায় গর্হিত। এর তজন্য সাংবাদিকের চাকরি চলে যাওয়া উচিত। কোনও কপিরাইট করা লেখা বিনা অনুমতিতে ছাপা যাবে না।

১৪। **বিজ্ঞাপন** — বিজ্ঞাপন আজকের সংবাদপত্রের আয়-এর মূল সূত্র। কিন্তু সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন আর বিষয়বস্তু/সংবাদ-এর মধ্যে পার্থক্য পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে হবে। কোনও পাঠক যেন বিজ্ঞাপনের সাথে সংবাদকে গুলিয়ে না ফেলেন। এমন কোনও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে ছাপা উচিত নয় যা মিথ্যা দাবি করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, রুচির পরিপন্থী বা কোনও বিশেষ ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানে। বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তার দায়িত্বও কিন্তু সম্পাদকের উপরেই নৈতিক ভাবে বর্তায়।

২০১০ সালে প্রেস কাউন্সিল প্রকাশিত নীতিমালায় বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়—

১৫। **পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বীতা** — কোনও সংবাদপত্রেরই উচিত নয় নিজেদের পৃষ্ঠার অন্য সংবাদপত্রের কার্য-কলাপের নিন্দা বা সমালাচনা করা।

১৬। **গণমাধ্যমের বিচার (Trial by Media)** — বেশ কিছু ঘটনায় দেখা গেছে বিচার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে গণমাধ্যম দোষী কে তা ঠিক করে দিচ্ছে। তদন্ত চলাকালীন তাকে সমালোচনা করছে। এই প্রবণতা থেকে দূরে

থাকা উচিত যাতে পুলিশ-প্রশাসন ও আদালত তাদের কাজ করতে পারে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।

১৭। চিত্র — ফটো পাঠকদের খুবই প্রভাবিত করে তাই ফটো ছাপার ব্যাপারে সাবধানতা, যথার্থতা, দায়িত্ববোধ ও শালীনতাবোধ বজায় রাখা উচিত। ছবির প্রেক্ষাপট ঠিক রাখা উচিত এবং কোনও অবস্থাতেই এমনভাবে ছবিকে সম্পাদনা করা যাবে না যাতে তার আসল রূপ পাল্টে যায়। ছবির ক্যাপসানের ভাষার ব্যাপারেও ছবির সাথে সাযুজ্য রাখতে হবে।

এছাড়াও পেইড নিউজ, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাক্ট রূপায়ণ করার ব্যাপারে কাউন্সিল সদর্থক নির্দেশিকা জারি করেছেন। তবে এ ব্যাপারে বেসরকারি এবং বাজারি গণমাধ্যম-এর থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

১.৪.৬ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আচার সংহিতা

ইন্টারন্যাশনাল ফেডেরেশন অব জোর্নালিস্টস আই.এফ.জে গ্লোবাল চার্টার ফর জার্নালিস্টস ১২ জুন ২০১৯ টুনিসে অনুষিংত ৩০তম আই.এফ.জে বিশ্ব কংগ্রেস-এ গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালে আই.এফ.জে নীতি প্রথম ঘোষিত হয় যাকে 'বর্দো ডিক্লারেশন' বলা হয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত :

১। ভূমিকা বা Preamble-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদের ৯ নং ধারা উল্লেখ করে তথ্যের প্রতি সবার সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সাংবাদিকদের পাঠক ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করানো হয়েছে।

২। সাংবাদিকদের প্রাথমিক দায়িত্ব জনগণের সত্য জানার অধিকারকে সুরক্ষিত করা।

৩। সাংবাদিক তথ্যনিষ্ঠভাবে সংবাদপরিবেশন করবেন, কোনও তথ্য না লুকিয়ে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য/বক্তব্য সাবধানে পরিবেশন করবেন।

৪। জনস্বার্থ জড়িত না থাকলে সাংবাদিক কখনোই গোপন রেকর্ডিং-এর সাহায্য নেবেন না।

৫। যতই জরুরি হোক না কেন একটি সংবাদ প্রকাশ, তা যেন কখনোই যাচাই না করে প্রকাশ না করা হয়।

৬। প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভুল থাকলে সাংবাদিক তা সংশোধন করবেন একেবারে স্বচ্ছতার সাথে নিজের সেরাটুকু দিয়ে।

৭। গোপনে পাওয়া তথ্যসূত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

৮। গোপনীয়তার অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে হবে। যার সাক্ষাৎকার প্রকাশ হবে তাকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন/অনুমতি নিতে হবে।

৯। তথ্য/মত প্রকাশ যেন ঘৃণা, হিংসা না ছড়ায়, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে নেতিবাচক ভঙ্গীতে না দেখায় এবং জাত, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বাছবিচার না করে।

১০। অন্যের লেখা চুরি, তথ্য বিকৃতি, প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ এবং তদ্দজনীত মানহানি ঘটালে তা অপেশাদারি ও অনৈতিক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

১১। পুলিশ বা সুরক্ষা সংস্থার হয়ে সাংবাদিক কাজ করবেন না।

১২। সাংবাদিক তাঁর সহকর্মীকে পূর্ণ সমর্থন জোগাবেন এবং তার তদন্ত, মত প্রকাশের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবেন।

১৩। সাংবাদিক তাঁর স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে কোনও অনৈতিক উপার্জন বা সুবিধা নেবেন না। স্বার্থের সংঘাত-এ জড়াবেন না,ে কোনও রকম অন্ধ প্রচার বা বাজারী ব্যাপারে যুক্ত হবেন না।

১৪। সাংবাদিক তাঁর স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবেন না এবং 'অফ দ্য রেকর্ড'-এ পাওয়া তথ্যকে শ্রদ্ধা করবেন যদি তার সততা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে হয়।

ইউনেস্কো

ইউনেস্কো, রাষ্ট্রপুয়েজর এক শাখা সংগঠন, বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তিকা, নথি প্রকাশ করেছে সাংবাদিকদের পেশাগত আচরণ সংক্রান্ত। যেমন— ১। ইয়াভুজ বায়দার রচিত 'দ্য মিডিয়া সেল্ফ রেগুলেশন গাইড বুক' (২০০৮)।

২। UNESCO — Communication & Information শীর্ষক ওয়েবপেজ যেখানে পেশাদারি সাংবাদিকতার মান এবং নীতিমালা নিয়ে আলোচনা আছে। এটি UNESCO-র অংশ।

৩। Ethical Guidelines for Journalists—UNCH, আফগানিস্তান দ্বারা ২০১৬-য় প্রকাশিত এই গ্রন্থ/নথি গুলিতে যে সব বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

- তথ্যের সমানাধিকার সবার জন্য
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- সত্য, যথার্থ ও পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশন
- সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা
- জনস্বার্থ ও পাঠকের স্বার্থ রক্ষা

সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস (এস.পি.জে)

এস.পি.জে দ্বারা প্রদত্ত নীতিমালা চারটি ভাগে বিন্যস্ত—

১। **সত্য অন্বেষণ** — এই ভাগে সাংবাদিকদের সত্য অন্বেষণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তথ্য যাচাই, যথার্থতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, পরিবেশনে দায়িত্ববোধ বজায় রাখতে বলা হয়েছে।

২। **ক্ষতি হ্রাস** — সংবাদসূত্র, সহকর্মী সহ জনগণকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তথ্যের চাহিদা বা প্রয়োজন এবং তদ্দজনীত ক্ষতি বা অস্বস্তির মধ্যে ভারসাম্য আসতে হবে। পুরো প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত মানুষদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

৩। **স্বাধীন ক্রিয়া** — সাংবাদিকতা আদতে জনসেবা। কোনওভাবেই সাংবাদিক কোনও সুবিধা, উৎকোচ, অর্থ গ্রহণ করবেন না বা কোনও অনৈতিক প্রলোভনে পা দেবেন না।

৪। **দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা** — নিজের কার্যপ্রণালী, সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে হবে, কোথাও কোনও ভুল হলে দ্বীধাহীনভাবে সংশোধন করে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে, যে কোনও পদ্ধতিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং কখনোই নীতিভ্রষ্টতার সাথে আপোষ করা যাবে না।

এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া

সম্পাদকদের সংগঠন 'এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া' 'Code of Practice for Journalists' শীর্ষক এক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যার বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ:

১। আচার সংহিতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও আচার সংহিতা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী তবু এর উপস্থিতি অতীত ভুল-ভ্রান্তিকে সংশোধন করতে সাহায্য করবে। তাই এই আচার সংহিতা অত্যন্ত উদার এবং 'Britain's Society of Editors' -এর আচার সংহিতার ভিত্তিতে প্রণীত।

২। এখানে সংস্থার পরিচালক, সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের কার্যপরিধি (domain) আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মালিক/পরিচালককে ব্যবসায়িক বা বাহ্যিক বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পাদককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে বলা হয়েছে। সম্পাদককেই সংস্থার ভাবমূর্তি এবং ব্যক্তিত্বের সৃজক ও রক্ষক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সংবাদপত্রের নৈতিক ও মাধ্যম হিসেবে মানরক্ষার দায়িত্ব সম্পাদকের ওপরেই বর্তাবে। বিশ্বাসযোগ্যতা, যথার্থতা, রক্ষাও তাঁরই দায়িত্ব।

৩। সম্পাদকের কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে কর্মচারি ও সাংবাদিকেরা বিশেষতঃ পদস্থ যাঁরা যেমন বার্তা সম্পাদক, মুখ্য সংবাদদাতা মুখ্য অবর সম্পাদক ইত্যাদি তাঁদের ডেস্ক ও রিপোর্টিং বিভাগের সহকর্মীদের সাহায্যে দেখবেন যেন সাংবাদিকতার পেশাগত নৈতিকতা বজায় থাকে — তথ্য যাচাই, সত্য তথ্য পরিবেশন, জনস্বার্থ রক্ষা, গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা, অহেতুক মানহানি, প্রত্যুত্তরের অধিকার, ভুল সংশোধন, অতিরঞ্জন, তথ্য বিকৃতি, ব্যক্তিগত সততা ইত্যাদি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে উচ্চ মানের নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করতে হবে।

১.৪.৭ ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত নীতিমালা

নির্বাচন যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় প্রক্রিয়া। অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনেই গণতন্ত্রের সার্থকতা। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভারতের নির্বাচন কমিশন নানারকম পদক্ষেপ করেছে। নির্বাচনের আগে আচরণবিধি লাগু হয় এবং সবাসকে মেনে চলতে হয়। গণমাধ্যম এখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গণমাধ্যম জনমত প্রভাবিত করে এবং যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির সর্বদাই লক্ষ্য থাকে গণমাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি ও বক্তব্য বাড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা। ইদানিংকালে দেখা গেছে যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার খরচের বাজেটের বড় অংশ জুড়ে থাকছে গণমাধ্যমে দেওয়া বিজ্ঞাপন। কখনো কখনো বিজ্ঞাপনের বদলে তাঁরা সাংবাদিকদের দিয়ে প্রয়োজনমত প্রতিবেদন লিখিয়ে নিচ্ছেন এবং তার বিনিময়ে অর্থ দিচ্ছেন। এই প্রক্রিয়াকে 'পেইড নিউজ' বলা হচ্ছে যার বিশ্বাসযোগ্যতা বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশি।

এই প্রবণতাগুলিকে ঠেকানোর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময়ে, তার প্রচার পর্বে এবং ফলাফল প্রকাশের আগে গণমাধ্যমকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছেন। এই নির্দেশিকাগুলি বিশদে পাওয়া যায় নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত 'Handbook for Media' (2019) এবং 'Compendium of Instructions on Media Related Matters' (2020)। এর অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

১। বিজ্ঞাপন শংসাপত্র — যে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতা যদি কোনও সংবাদপত্র/চ্যানেল/পোর্টালে কোনও রকম রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে তাঁকে আগে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে যাকে 'Prior Certification' বলা হয়েছে। সেই বিজ্ঞাপনে কে বিজ্ঞাপনটি দিচ্ছেন তা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রার্থীকে মনোনয়ন দাখিলের সময় বিজ্ঞাপন খাতে খরচও উল্লেখ করতে হবে। এই বিজ্ঞাপনগুলি সংশ্লিষ্ট আইন অর্থাৎ কেবল যিভি রেগুলেশন অ্যাক্ট এবং Advertising Standards অনুযায়ী নির্মাণ ও সম্প্রচার হবে।

২। সোশ্যাল মিডিয়া — সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া বিজ্ঞাপনের হিসাব প্রার্থীকে কমিশনের কাছে দাখিল করতে হবে। যদিও বার্তা, মন্তব্য, ফটো, ভিডিও, ব্লগ, নিজস্ব ওয়েবসাইট এগুলি বিজ্ঞাপন বলে বিবেচ্য হবে না। কমিশনের

তরফে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটর থাকবেন যিনি বিজ্ঞাপনগুলির ওপরে এবং সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলির ওপরে নজরদারি করবেন।

এছাড়াও 'Internet & Mobile Association of India' (IAMAI) একটি 'Voluntary Code of Ethics' নামক আচার সংহিতার প্রণয়ন করেছেন যেখানে প্রতিটি সোশাল মিডিয়া নির্বাচনের সময় সঠিক ও পক্ষপাতহীন তথ্য পরিবেশন, মুক্ত ও নীতিনিষ্ঠ ব্যবহার এবং কমিশনের নিয়ম মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। কমিশনও এই আচার-সংহিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কমিশন সোশ্যাল মিডিয়ায় কি প্রকাশ করা যাবে ও কি প্রকাশ করা যাবে না সে বিষয়ে 'মডেল কোড অব কন্ডাক্য' দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু দেওয়া যাবে না —

ক। বিশেষ রাজনৈতিক দল/প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতমূলক পোস্ট।

খ। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ও ভিত্তিহীন অভিযোগ / কুৎসা।

গ। হিংসায় উস্কানি দেয়।

ঘ। কোনও বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ভাবাবেগকে আহত করে।

ঙ। ছবি/ভিডিও যেখানে তথ্য বিকৃতি আছে।

৩। **সাংবাদিকদের প্রদত্ত সুবিধা** — নির্বাচনের যথাযথ ও নিরপেক্ষ সম্প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদেরে সবরকম সহযোগিতা করবেন। দুর্গম ও উত্তেজনাপ্রবণ বুথে যাতে সাংবাদিকরা যেতে পারেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন তার সুব্যবস্থা করবে কমিশন। সরকারি ছবি ও ভিডিও ফুটেজ সাংবাদিকরা চাইলে কমিশনের থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছ থেকে। কিন্তু কিছু নিয়মকানুন মেনে সাংবাদিকদের কাজ করতে হবে। যেমন—

- পোলিং বুথের ভেতরে বা গণনা কেন্দ্রের ভেতরে বিশেষ অনুমতি ছাড়া সাংবাদিক ঢুকতে পারবেন না।
- গণনার কভারেজের জন্য বিশেষ অনুমতিপত্র দরকার।
- কমিশনের তরফে সবরকম যোগাযোগ সুবিধাসম্পন্ন 'মিডিয়া সেন্টার' খোলা হবে সাংবাদিকদের সুবিধার্থে।

৪। **সম্প্রচার সময় বরাদ্দ** — অবাধ ও পক্ষপাতহীন নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সরকারি গণমাধ্যম অর্থাৎ দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বিগত নির্বাচনে তাদের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করবে যেখানে তাদের নেতা/নেত্রী তাদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচী জনগণের উদ্দেশ্যে তুলে ধরতে পারবেন।

এই সুবিধা পাবে সব জাতীয় রাজনৈতিক দল এবং স্বীকৃত রাজ্য স্তরীয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। এই প্রচারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুমোদিত নয়—

- প্রতিপক্ষের সমালোচনা
- অন্য দেশের সমালোচনা
- কোনও ধর্ম বা গোষ্ঠিকে আক্রমণ

- অশ্লীল ও মানহানিকর বক্তব্য
- হিংসায় প্ররোচনা
- আদালত অবমাননা
- রাষ্ট্রপতি ও বিচারব্যবস্থার অবমাননা
- ভারতের একতা, সার্বভৌমত্ব এবং সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনও বক্তব্য
- কোনও ব্যক্তির নাম করে সমালোচনা

এছাড়াও দূরদর্শন ও আকাশবাণী সর্বাধিক দুটি আলোচনাচক্র (Panel Discussion) আয়োজন করে সম্প্রচার করতে পারেন যেখানে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল তাদের মনোনীত প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করতে পাঠাতে পারেন।

৫। নির্বাচন পরিচালন সংক্রান্ত সংবাদের পর্যবেক্ষণ — নির্বাচন কমিশন একটি 'কন্ট্রোল রুম' (Electronic Media Monitoring Centre) তৈরি করে গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত নির্বাচন পরিচালন সংক্রান্ত সংবাদ পর্যবেক্ষণ বা 'Monitoring' করবেন এবং যদি কোনও সংবাদ নিয়ম ও নীতির পরিপন্থী হয় তাকে উল্লেখ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন অর্থাৎ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে সেই সংবাদ প্রত্যাহার করতে হবে।

৬। নির্বাচন চলাকালীন গণমাধ্যমের জন্য কমিশনের নির্দেশিকা নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার আধঘণ্টা পরে পর্যন্ত কোনও বুথ ফেরৎ সমীক্ষা প্রকাশ করা যাবে না একইভাবে কমিশন বারংবার প্রতিটি গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ থাকতে বলছে যাতে তাদের সম্প্রচারের দ্বারা কোনও দল বা প্রার্থী যেন সুবিধা না পান।

- কোনও অভিনেতা/অভিনেত্রী যিনি নির্বাচনে প্রার্থী, তাঁর চলচ্চিত্র/সিরিয়াল সম্প্রচার করা যাবে না।
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা থেকে বিরত থাকুক গণমাধ্যম এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা 'People's Representation Act' -এর ১২৬নং ধারায় বর্ণিত আছে যা গণমাধ্যম মানতে বাধ্য।

এছাড়াও নির্বাচন কমিশন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলিকে NBSA-র আচার সংহিতা, এবং মুদ্রণ মাধ্যমকে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের আচার সংহিতা মেনে চলতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

এছাড়াও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যস্তরে এবং জেলাস্তরে নির্দিষ্ট ১০০ করে প্রকাশিত সংবাদ ও বিজ্ঞাপন নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা দেখে।

১.৪.৮ সারাংশ

ভারতে নীতি নিষ্ঠতা সর্বক্ষেত্রেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। বৃহৎ জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক অবক্ষয় এবং দুর্নীতি এর মূল কারণ। গণমাধ্যম সমাজের বাইরে নয় তাই এর গায়েও এই নীতিহীনতার আঁচ বেশ ভালোরকমই লেগেছে। একথা মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে বহু মানুষের রুটি-রুজি এই শিল্পের সাথে যুক্ত। গণমাধ্যম সংস্থার লক্ষ্য এখন আর নীতিনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, সৎ সাংবাদিকতা নয় বরং উত্তেজক, অতিরঞ্জিত, ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করা এবং সেই সস্তা জনপ্রিতয়াকে কাজে লাগিয়ে সরকার এবং কর্পোরেট জগতের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন রাজস্ব আদায়। এই বিজ্ঞাপন পেতে গিয়ে তারা বারবার নৈতিক আপোষ করছে সরকার ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির সাথে। ফলে, জনস্বার্থ রক্ষা করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে, মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তথাপি, সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীদের নীতিশাস্ত্র পড়ানো হচ্ছে এই আশায় যে তারা পেশাদারি ক্ষেত্রে নীতিনিষ্ঠ থাকবেন,

পরিচালক ও সম্পাদককে নীতির মহত্ত্ব বোঝাবেন। দেখা গেছে ঐতিহাসিকভাবে, যে সংবাদমাধ্যম নীতিনিষ্ঠ থেকেছে তার বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড় ধরেনি এবং দীর্ঘদিন ধরে মানুষের হৃদয়ে তার জায়গা দৃঢ় হয়েছে। অপরদিকে, বহু জনপ্রিয় কাগজ/চ্যানেল নীতিহীনতায় ভুগে উঠে গেছে বাজার থেকে। আগামীদিনে এই নানারকম গণমাধ্যমের ভিড়ে মানুষ কিন্তু তার মাধ্যম বেছে নেবেন। সেই মাধ্যমকেই বাছবেন যে সত্য পরিবেশন করবে, যে নির্ভরযোগ্য। তাই সাংবাদিকতার নীতি সর্বদাই প্রাসঙ্গিক।

১.৪.৯ অনুশীলনী

১। **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :**

(ক) গণমাধ্যমের সাবেকি মালিকানার ধররগুলি বিশ্লেষণ কর।

(খ) গণমাধ্যমের মালিকানার সাম্প্রতিক ধারা বর্ণনা কর।

(গ) কিভাবে গণমাধ্যমে মালিকানা নৈতিকতাকে প্রভাবিত করছে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) আচার সংহিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ কর।

(ঙ) নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যম সংক্রান্ত যে আচরণবিধি প্রণয়ন করেছেন তার বর্ণনা কর।

২। **টিকা লেখ :**

(ক) ব্যক্তিগত মালিকানা

(খ) পার্টনারশিপ মালিকানা

(গ) কর্পোরেশন

(ঘ) গ্রুপ মালিকানা

(ঙ) ক্রস মিডিয়া মালিকানা

(চ) চেন মালিকানা

(ছ) কংগ্লোমোরেট

(জ) ওমবুডসম্যান

(ঝ) ভারতের প্রেস কাউন্সিল

(ঞ) নীতিমালা

১.৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ethics in Journalism — Ron F Smith

২। সংবাদ প্রতিবেদন — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩। সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত — ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য

৪। Norms of Journalistic Conduct (2010) — Press Council of India

৫। ইউনেস্কো ওয়েবসাইট

৬। SPJ ওয়েবসাইট

৭। এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট

৮। ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট

মডিউল - ২ : ভারতের প্রেস / মিডিয়া আইনগুলির ইতিহাস

একক ১ ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক ধারণা

গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

২.১.৪ মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য

২.১.৫ বাক স্বাধীনতার অধিকার

২.১.৬ তথ্যের অধিকার

২.১.৭ জরুরি অবস্থা ও গণমাধ্যমের ওপর তার প্রভাব

২.১.৮ সারাংশ

২.১.৯ অনুশীলনী

২.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে জানা যাবে-

- ভারতের সংবিধানের মূল গত বৈশিষ্ট্য
- মৌলিক অধিকারের পরিধি
- বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্র
- তথ্যের অধিকার এর পরিসীমা
- জরুরি অবস্থা এবং তার প্রভাব

২.১.২ প্রস্তাবনা

গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর ভিত্তি করে রচিত সংবিধান ভারতের শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্তা। ভারতের নাগরিক ও প্রেসের কার্যক্ষেত্রে পরিসীমার সূত্র এই সংবিধান। এমনকি বাক স্বাধীনতার অধিকার তথ্যের অধিকার এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার শিকার সংবিধানেই আবদ্ধ। গণমাধ্যম এর দায়িত্ব এবং অধিকারের ধারণাগুলি ও সংবিধান থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। এই কারণেই গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংবিধান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক।

২.১.৩ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ শে নভেম্বর এই সংবিধান ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হিসেবে গৃহীত হয়। তবে এই সংবিধানের কিছু বৈশিষ্ট্য অন্যান্য দেশের সংবিধানে তুলনায় এক একে অনন্য করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৯ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭১ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং তার ফলে মূল সংবিধানের থেকে বর্তমান সংবিধান বহু বিষয়ে পৃথক। সংক্ষেপে ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. বৃহত্তম সংবিধান- ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাকারী সংবিধান হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিশেষভাবে ব্যথা করার ফলে সংবিধান এর আকার বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র দেশ শাসনের মৌলিক নীতি নয় প্রশাসনিক তৃতীয় এই সংবিধান উল্লেখিত হয়েছে। বহু ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন জাতের বিশিষ্ট দেশ হওয়ায় বিশেষ সমস্যা গুলি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২. যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ব্যাখ্যা- ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পর্ক এবং রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ফটো ছাড়ছে নমনীয়তা বেশি- ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁর নমনীয়তা। সংবিধানের কয়েকটি উপধারা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভা গুলির অর্ধেকের সমর্থন যথেষ্ট। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংসদে উপস্থিত ওগো প্রদানকারী সংসদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে সংবিধান পরিবর্তন সম্ভব। শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নয় কোন জায়গায় কোন অভাব অনুভূত হলে তা পূরণ করার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে।

৪. সংবিধানের সংসদীয় সার্বভৌমত্ব সমন্বয় সাধন- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মূল কথা মৌলিক বিধি এবং ইংল্যান্ডের অলিখিত সংবিধানের মূলকথা সংসদীয় সার্বভৌমত্বের সিদ্ধান্তের মিলন ঘটেছে ভারতীয় সংবিধানে।

৫. সংবিধানে প্রচলিত প্রথার ভূমিকা- যেসব বিষয়ে সংবিধানের পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়নি অথবা সংবিধানে ঘোষিত নীতির বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোন অভাব অনুভূত হয় তবে সে ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রশাসন করা যেতে পারে।

৬. মৌলিক অধিকার ও সাংবিধানিক প্রতিকার- ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে সেগুলি হল-

ক. সাম্যের অধিকার

খ. বিশেষ স্বাধীনতার অধিকার

গ. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

ঘ. ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার

চ. সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অধিকার

ছ. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার

আদালত এর সাহায্যে সংবিধানিক প্রতিকারের মাধ্যমেই অধিকার গুলি বলবৎ করা যেতে পারে।

৭. বিচারক পর্যালোচনা ও সংসদীয় সর্বোচ্চ তার মধ্যে আপোষ- ভারতীয় সংবিধানে বিচার ব্যবস্থা পর্যালোচনায় ক্ষমতাবান এবং স্বাধীন বিচারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং বিচারক পর্যালোচনা সমন্বয়ক সাধিত হয়েছে। পরিষদীয় মণ্ডল এর ক্ষমতা বহির্ভূত কোনো বিধিকে আদালত যেমন অসাংবিধানিক বলে বর্ণনা করতে পারে ঠিক তেমনি যদি দেখা যায় যে বিচার বর্গ অবাঞ্ছিত ভাবে অত্যাধিক হস্তক্ষেপ করছে তবে কেন্দ্রীয় সংসদের সংবিধানের বেশিরভাগ অংশবিশেষ সংখ্যাধিক্যে সংশোধন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে দুটি সর্বোচ্চ ক্ষমতার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

৮. মৌলিক অধিকার পরিষদীয় মণ্ডল এর ন্যায় সম্মত নিয়ন্ত্রণের অধীন- ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে এই অধিকার প্রত্যাহার করা হতে পারে। আবার কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আদালতের সংরক্ষণের আশা না করে মৌলিক অধিকার গুলি সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী বিধান মণ্ডল এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

৯. সংবিধানে সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে- শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও বিবিধ সামগ্রী নয় ভারতীয় সংবিধানের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক স্বীকৃতি প্রত্যাগত হয়েছে। অর্থ্যাত ধর্ম-বর্ণ-জাতি লিঙ্গ ও জন্মস্থান এর ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় কোনো নাগরিককে চাকরি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না এবং সর্বজনীন স্থানে প্রবেশ করা বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

১০. মৌলিক কর্তব্য দ্বারা মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ- মূল সংবিধানে উল্লেখিত না হলেও ৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকার গুলি কে সীমিত করার জন্য মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছে তবে এই কর্তব্য গুলি আদালতের সাহায্যে প্রবর্তন করা যায় না।

১১. সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া সার্বজনীন ভোটাধিকার- ভারতীয় উপমহাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের সময় প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগের সক্ষম।

১২. সংসদীয় শাসন পদ্ধতির সঙ্গে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি- ভারতীয় শাসনতন্ত্র মূলত প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সাহায্যে পরিচালিত হলেও নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান হিসেবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। তবে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে তিনি কাজ করেন এবং একমাত্র ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে তাকে পদ থেকে অপসারিত করা যায়।

১৩. ঐকিক ভিত্তি সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যগুলির ক্ষমতা গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতিতে একক শক্তি বা শাসক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে।

১৪. দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রায় ৫৫২ টি দেশীয় রাজ্য কে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে

সংযুক্ত করে ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড রূপদান করা হয়। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে এই শাসন ব্যবস্থা প্রযোজ্য হয়।

ভারতবর্ষের সংবিধান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সেরা নির্যাস নিয়ে তৈরি হলেও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে এই সংবিধান মূলত ব্রিটেন-আমেরিকা ও আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তবে সংবিধানের রচয়িতাদের গুণে এই সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম অন্যতম সেরা সংবিধানে পরিণত হয়েছে।

২.১.৪ মৌলিক অধিকার

প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডক্টর দুর্গাদাস বসু রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অরক্ষিত অধিকার মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার গুলি লিপিবদ্ধ আছে। এই অধিকার মূলত ৬ প্রকার

- সাম্যের অধিকার
- স্বাধীনতার অধিকার
- শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
- সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার
- সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

পূর্বে সম্পত্তির অধিকার ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের পর তার মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য হয় না। সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার গুলো ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ ও গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ রূপে পরিগণিত হয়। মৌলিক অধিকার গুলি নিরঙ্কুশ নয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে মৌলিক অধিকার সমূহের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে।

- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা
- বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী মূলক সম্পর্ক
- শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ
- আদালত অবমাননা
- মানহানি
- অপরাধ বা অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা দেওয়া
- অশালীনতা ও অসাদাচার

এছাড়াও জরুরী অফ ব্যবস্থা সামরিক শাসন জারি থাকলেও মৌলিক অধিকার গুলি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক। মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উল্লেখিত হলো নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য বিষয়ে কোনো আলোচনা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীতে সংবিধানের চতুর্থ অংশে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়েছে সেগুলি হল:

- সংবিধানকে মান্য করা এবং সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় পতাকা জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- স্বাধীনতা ও সংগ্রামের মহান আদর্শ কে সংরক্ষণ ও অনুসরণ
- ভারতের সার্বভৌমত্ব ঐক্য ও সংহতি কে সমর্থন ও সংরক্ষণ
- দেশ রক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ
- ধর্মীয় ভাষাগত আঞ্চলিক ও জাতিগত ভিন্নতার ঊর্ধে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ভাতৃত্বের বিকাশ ঘটানো এবং নারীর পক্ষে অমর্যাদাকর প্রথাসমূহ বর্জন
- ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য কে সম্মান প্রদান ও সংরক্ষণ
- বনভূমির নদনদী বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জীবিত প্রাণীদের প্রতি মমত্ব প্রদর্শন
- বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতা মানবিকতা অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন,
- সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন,
- সমস্ত রকম ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপদকে উন্নত মান প্রদান করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকলাপের উৎকর্ষ সাধন।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য গুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে সংযুক্ত ফলে এগুলো পালন করার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই তাই এইগুলি অমান্য করলে আদালতে প্রতিকার সম্ভব নয় কারণ নির্দেশাত্মক নীতি গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না এগুলি কেবল নাগরিকদের প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যায়।

২.১.৫ বাক স্বাধীনতার অধিকার

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ এরমধ্যে স্বাধীনতার অধিকার আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। সংবিধানের ১৯-২২ নম্বর ধারায় এই অধিকার উল্লেখিত। ১৯(১)ক ধারায় বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অধিকার অনুসারে ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজও নিজও ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস আদর্শ অনুযায়ী মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এই মতামত লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকার হতে পারে। চিঠিপত্র পত্র-পত্রিকা পুস্তিকা সংবাদপত্র বা অন্যান্য গণমাধ্যম সভা-সমিতি বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সরকারি বিভিন্ন কাজকে বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি জনমানুষের তুলে ধরা সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমগুলোর প্রয়োজনীয় কাজ মতামত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতের সংবিধানে প্রেসের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে এটি বাক স্বাধীনতার অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৫০ সালে দুটি মামলার রায় সুপ্রিম কোর্ট একই মত ব্যক্ত করে।

ভারতীয় সংবিধানে ১৯(২) ধারায় বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারের ওপর কতগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এগুলি হল:

* ভারতের সর্বপ্রথম সংহতি রক্ষা
* রাষ্ট্র নিরাপত্তা রক্ষা
* বৈদেশিক রাষ্ট্রসঙ্ঘে মৈত্র মূলক সম্পর্ক রক্ষা
* দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা
* আদালত অবমাননা না করা
* মানহানি না করা
* অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা না দেওয়া।

এছাড়া পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে জরুরি অবস্থা ও সামরিক শাসন জারি থাকলে মৌলিক অধিকার খর্বিত হয়।

২.১.৬ তথ্যের অধিকার

তথ্যের অধিকার বলতে তথ্য চাওয়া পাওয়া এবং প্রদান করার অধিকার কি বুঝানো হয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘে মানবাধিকার সম্পর্কিত সনদের নির্দেশাবলী তে বলা হয় সকল মানুষের মতামত গ্রহণ এবং তা প্রদান করার অধিকার রয়েছে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো কোন মধ্যস্থতা বা প্রভাব ব্যতীত মতামত গ্রহণের পরিবেশ তথা তথ্য চাওয়া পাওয়া এবং প্রদান করার অধিকার।

আমাদের দেশে তথ্যের অধিকার সংবিধান সম্মত। কিন্তু প্রেসে স্বাধীনতার মতোই এটিও সরাসরি উল্লেখিত নেই। কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটিও বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন মামলার শুনানিতে আদালত এই বক্তব্য প্রকাশ করেছে এর যুক্তি ও সহজবোধ্য। যথাযথ তথ্যের যোগান ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে নির্ভুল মত প্রকাশ সম্ভব নয়। মতপ্রকাশের অধিকারের সঙ্গে প্রেসের স্বাধীনতা সম্পর্কিত। তথ্যের অধিকার এবং প্রেসের স্বাধীনতা একদিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত। অপরপক্ষে এই দুই অধিকারী গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় অপরিহার্য উপাদান।

তথ্যের অধিকার এ দুটি স্তর আছে একটি তথ্য জানানোর অধিকার অপরটি তথ্য জানার অধিকার। তথ্য প্রকৃতপক্ষে মানুষকে শক্তিশালীও শিক্ষিত করার সম্পদ। এতে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। মতামত প্রকাশের স্বচ্ছতা গণতান্ত্রিক সমাজের সামনে প্রাথমিক শর্ত। তথ্যের সমান্তর ধারা ব্যতীত তা বাস্তবিক ভাবেই সম্ভব নয়। তথ্যের একমুখী ধরা কখনোই গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে না। তথ্যের দ্বিমুখী ধারা মানুষের জানার পরিধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে। সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ হলে তবেই বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। আমাদের দেশের মতো গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে দেশের নাগরিকরা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য জানা না থাকলে নির্বাচনে জনগণের রায় গণতন্ত্রকে সঠিক অর্থে সমৃদ্ধ করবে না। সরকারের পক্ষ থেকেও যদি তথ্যের উৎস প্রবাহ চালু না রাখা হয় তবে গণতন্ত্র চরিত্রকেও খর্ব করবে। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩ কিছু পরিমার্জন সুপারিশ করেছিল। এক্ষেত্রে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার কে আরো মর্যাদা দেওয়া।

১৯৯৬ সালে ভারতের প্রেস কাউন্সিল তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি খসড়া বিল প্রস্তাব করে দেশব্যাপী বিতর্ক আহ্বান করে। এর মাধ্যমে কাউন্সিল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। ১৯৯৭ সালে তথ্যের অধিকার বিল রাইট টু ইনফরমেশন বিল ১৯৯৭ যৌথভাবে প্রস্তুত করে প্রেস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ রুরাল ডেভলপমেন্ট। এই বিলে প্রস্তাব করা হয় যাতে রাষ্ট্রীয় সংস্থা তাদের কার্যাবলীর সমস্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে। কোন ব্যক্তি লিখিতভাবে কোন তথ্য চাইলে রাষ্ট্র ও সংস্থার কর্তৃপক্ষকে তার উত্তর লিখিতভাবে দিতে হবে। এমনকি কোনো কারণে উত্তর দিতে না চাইলে তাও লিখিতভাবে জানাতে হবে। তথ্যের অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা নজরদারি করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফ্রিদম অফ ইনফর্মেশন গঠন করার প্রস্তাব দিলে আছে। রাজ্য সরকার গুলিকে প্রয়োজনবোধ রাজ্যস্তরে স্টেট কাউন্সিল ফর ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন গঠন করার ক্ষমতা দেওয়ার কথাও এই বিলে উল্লেখিত হয়েছে। দিলকি যদিও এখনও আইনে পরিণত হয়নি। পরিশেষে বলা যায় তথ্যের অধিকার যেমন দ্বিমুখী তেমনই তার শিকার প্রোথিত আছে সরকার ও জনগণ দুপক্ষের চেতনার ওপর। সঠিক তথ্য জ্ঞাপন যেমন সরকার তথা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব তেমনি সঠিক তথ্য পাওয়া নাগরিকের স্বীকৃত অধিকার। গণমাধ্যম এর বাস্তব নিরপেক্ষ চরিত্র এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এসব এর সমন্বয়ে তথ্যের অধিকার এক সঠিক লাভ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেন্দ্র সরকার তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন জারি করেছে ২০০৫ সালে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ নাগরিককে তথ্য সংগ্রহের বিধিবদ্ধ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যদিও বাকস্বাধীনতা প্রয়োগের মত তথ্যের অধিকার ও কিছু নিয়ন্ত্রন সাপেক্ষ। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ও নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের অধিকার এই আইন দেয়নি।

২.১.৭ জরুরি অবস্থা এবং গণমাধ্যমের ওপর তার প্রভাব

জরুরি অবস্থা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণ এদেশের পাতার কোন অংশে নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে। সংবিধান অনুসারে এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। রাস্ট্রপতির মনে সম্বন্ধে স্থির ধারণা হলে বাই মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এই ধারণা হলেও তিনি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির কাছে এ বিষয়ে লিখিত সুপারিশ করলে তবেই তিনি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি সাধারণত ৩ প্রকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন:

১) জাতীয় জরুরি অবস্থা অর্থাৎ যুদ্ধ বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে

২) রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন অর্থাৎ রাজ্যে সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এবং

৩) অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা

সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জাতীয় জরুরি অবস্থা প্রথম জারি হয়েছিল ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়। ১৯৭১ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থা দ্বিতীয়বার কার্যকর হয়। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুপারিশ ক্রমে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে গভীর বিপদের কারণ ৩৫২ ধারা বলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রথম জারি হয় ১৯৫১ সালে। তারপর থেকে সত্তর বারের বেশি এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। তবে আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার নজির এখনো নেই।

জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালীন রাষ্ট্র অনুচ্ছেদ ১৯ কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ এই অবস্থায়

হাজার ১৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ৬টি স্বাধীনতা- বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা সম্মিলনের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, অধিবাস বা স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বাধীনতা এবং বৃত্তি, পেশা, বাণিজ্য ও ব্যবসার স্বাধীনতা প্রযোজ্য হয় না। খুব সহজেই বোধগম্য হয় যে এই অবস্থায় প্রথম স্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য।

১৯৭৫ সালে জারি হওয়া জরুরি অবস্থায় প্রেসের বিরুদ্ধে নানান রকম দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য নিয়ে সংবাদপত্রগুলি বাড়াবাড়ি করছে এই অভিযোগ করা হয়। এই অবস্থায় কোন সংবাদ প্রকাশের পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধিকারিকের সম্মতি জোগাড় করতে হতো। তদানীন্তন সমস্ত সংবাদপত্র দেখলে দেখা যাবে বহু না ছাপা অংশ। এগুলি আসলে কেন্দ্রীয় আধিকারিকের অনুমোদিত। এই সময়ে প্রেস কাউন্সিল আইন বাতিল করা হয়েছিল। এমনকি ভারতের তৎকালীন চারটি সংবাদসংস্থা পিটিআই ইউএনআই, হিন্দুস্থান সমাচার সমাচার ভারতীর একীকরণ ঘটিয়ে একটি সংবাদ সংস্থা সমাচার তৈরি হয়। এই সময়ে বহু ক্ষেত্রে সংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার কার্যাবলীও সংবাদপত্রের প্রকাশে বাধা ছিল। ৫১ জন সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকের অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দেয়। ৭ জন বিদেশী সাংবাদিককে ভারত থেকে বিতাড়ন করা হয়।

২.১.৮ সারাংশ

এই এককে আমরা সংক্ষেপে ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার মূল পরিপ্রেক্ষিত ও হলো গণমাধ্যমের সঙ্গে সংবিধানের সম্পর্ক। সংবিধান প্রদত্ত যে নাগরিক অধিকার গুলি সরাসরি বিধিবদ্ধ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বাকস্বাধীনতা ও তথ্যের অধিকার এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার ভিত্তি। নাগরিক অধিকারের সঙ্গে নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্ক যে পরস্পরের পরিপূরক কাকে আলোচিত হয়েছে। গণমাধ্যমের ওপর স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং তার বাস্তব চিত্র এই এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১.৯ অনুশীলনী

১) দীর্ঘ উত্তর এর প্রশ্ন:

ক. ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করুন।

খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? মৌলিক অধিকার বলতে কোন কোন অধিকার বোঝায়? এই অধিকার কি নিরঙ্কুশ?

গ. তথ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায়? এটা কি বিজ্ঞান সম্মত? এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

ঘ. জরুরি অবস্থা বলতে কী বোঝায়? ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের উপর তার প্রভাব আলোচনা করুন।

২) টীকা লেখার জন্য:

ক) মৌলিক অধিকার

খ) মৌলিক কর্তব্য

গ) বাক স্বাধীনতার অধিকার

২.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১) Introduction to the constitution of IndiaéŸé D*f*D*f* Basu

২) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি - সত্য সাধন চক্রবর্তী

৩) ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা- নিমাই প্রামানিক

একক - ২ ▫ সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন ১৮৬৭, সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭

গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ প্রস্তাবনা

২.২.৩ সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন ১৮৬৭

২.২.৪ সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩

২.২.৫ রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭

২.২.৬ সারাংশ

২.২.৭ অনুশীলনী

২.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

১. উল্লেখযোগ্য আইন গুলি সম্পর্কে বিশদ ধারণা

২. সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন ১৮৬৭

৩. সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩

৪. রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭

২.২.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি ভারতের প্রেস আইন সম্পর্কিত। প্রেস আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমাদের আগের মডিউলে এ আলোচনায় পাওয়া গেছে। এই এককটি ভারতবর্ষে প্রেস আইনের বিবর্তন এবং উল্লেখযোগ্য প্রেস আইনগুলি বিষয় সম্পর্কিত।

২.২.৩ সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন ১৮৬৭

সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন গুলির মধ্যে প্রাচীনতম আইনটি এখনো প্রয়োগ করা হয় এবং তা হলো সংবাদপত্র ও পুস্তক নিবন্ধীকরণ আইন। ১৮৬৭ সালে এই আইন প্রণীত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশনার এবং ছাপাখানা পরিচালনার নিয়মের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক আইন হিসেবে এটি স্বীকৃত। যদিও কোন সংবাদপত্র শুরু করা বা চালু

রাখার জন্য কোন লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় না তবুও এই আইনের নির্দেশ না মেনে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় না। সংবাদপত্র প্রকাশের আগে নির্দিষ্ট প্রথায় জেলাশাসক, প্রেসিডেন্সি অথবা সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণা করতে হয়। অনুরূপভাবে ছাপাখানা শুরু করার আগেও সংশ্লিষ্ট ঘোষণা করতে হয়।

এই আইনের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের মধ্যে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মুদ্রকের নাম মুদ্রণ স্থান, প্রকাশকের নাম প্রকাশ করতে হবে। কোন সংবাদপত্র বা পুস্তক মুদ্রণের জন্য ছাপাখানা স্থাপন করতে হলে স্থানের বর্ণনা দিয়ে জেলাশাসক, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে একটি ঘোষণা করতে হবে। ছাপাখানার স্থান পরিবর্তিত হলে প্রত্যেকবারই ঘোষণা করা জরুরি। কিন্তু যদি একই ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পরবর্তীতে নতুন স্থানটির অবস্থিত হয় সেক্ষেত্রে ছাপাখানার মালিক যদি একই হন এবং পরিবর্তন মেয়াদের মধ্যে হয় তবে নতুন কোনো ঘোষণা দরকার পড়ে না। সে ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানানোই যথেষ্ট।

একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য দুটি শর্ত পূরণ করা জরুরি। প্রথমত সংবাদপত্রের প্রতিটি কপিতে পরিষ্কারভাবে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যে জেলাশাসক প্রেসিডেন্সি বা সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ অঞ্চলে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হবে তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি ঘোষণা করতে হবে:

ক) মুদ্রক এবং প্রকাশকের নাম

খ) মুদ্রণ ও প্রকাশনার স্থান

গ) সংবাদপত্রের নাম ভাষা এবং প্রকাশকাল। মুদ্রক এবং প্রকাশক নিজে অথবা কোন অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই ঘোষণা করবেন। যদি মুদ্রক বা প্রকাশক সংবাদপত্রের মালিক না হন সেক্ষেত্রে ঘোষণাটিতে মালিকের নাম উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ঘোষণা করলেই সংবাদপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করা যায় না। উক্ত বা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সম্মতি দেওয়ার পরই প্রকাশনা শুরু করা সম্ভব। নাম, ভাষা অথবা প্রকাশকাল যতবার পরিবর্তিত হবে ততবার নতুন ঘোষণা করতে হবে। অনুরূপভাবে সংবাদপত্রের মালিকানা বা প্রকাশনা ও মুদ্রণের স্থান বদল হলে নতুন ঘোষণা করতে হয়। যদি স্থানের পরিবর্তন ৩০ দিনের কম সময়ের জন্য হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি বিবৃতি দেওয়াই যথেষ্ট। যদি মুদ্রক বা প্রকাশক ৯০ দিনের বেশি সময়ের জন্য দেশের বাইরে যান অথবা অন্য কোন কারণে ৯০ দিনের বেশি সময়ের জন্য তারা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তবে নতুন করে ঘোষণা করতে হয়।

দেশের স্বাভাবিক নাগরিক নন অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন কারোর পক্ষে কোনো ঘোষণা করা অথবা সংবাদপত্র সম্পাদনা করা সম্ভব নয়। যদি আইন অনুযায়ী ঘোষণা করা হয় এবং একই রাজ্যে একই নামে বা একই ভাষায় কোন পত্রিকা না থাকে তবে জেলাশাসক ঘোষণাটি কে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। তবে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার আগে সংবাদপত্রের রেজিস্টার অফ নিউজ পেপার ফর ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অন্য কোন পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুসন্ধান করতে হয়। এই অনুমতি প্রদান কোন বিচার বিভাগীয় কাজ নয় এটি একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং কোনরকম স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেট এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকেন।

অনুমতি পাওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবাদপত্র বা পত্রিকা অবশ্যই শুরু করতে হয়। যে সংবাদপত্র সপ্তাহে বা তার বেশি বার প্রকাশিত হবে বলে ঘোষিত হয়েছে তাদের ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশনা শুরু করতে হবে। অন্যান্য সংবাদপত্র ক্ষেত্রে এই সময়সীমা তিন মাস অর্থাৎ দৈনিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অতি অবশ্যই ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশনা শুরু করতে হবে এবং পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ৩ মাসের মধ্যে প্রকাশনা শুরু করতে পারে।

অনিয়মিত প্রকাশনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা বাতিল করতে পারেন। এবং প্রকাশনা বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

যদি কোন সংবাদপত্র ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক কম প্রকাশে সক্ষম হয় তবে তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তিন মাসের মধ্যে কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদপত্র যদি নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারে, তবে সে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার শুরু করার আগে নতুন করে ঘোষণা করতে হবে।

এই আইন অনুযায়ী সংবাদপত্রের প্রতিটি সংস্করণের দুটি কপি এবং প্রতিটি বইয়ের তিনটি কপি নির্দিষ্ট প্রথায় সরকারের কাছে বিনামূল্যে পাঠাতে হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কারণ দেখানোর সুযোগ দেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হয়েছে বলে ঘোষণাটি বাতিল করতে পারেন। বিষয় গুলি হল:

ক) এই আইন বা নিয়ম না মেনে সংবাদপত্রটির প্রকাশিত হচ্ছে অথবা

খ) একই ভাষা বা একই রাজ্যে অস্তিত্বশীল কোন সংবাদপত্রের একই নাম্বার এক ধরনের নামে কোন সংবাদপত্র আছে অথবা

গ) প্রকাশক অথবা মুদ্রকের মৃত্যু হয়েছে অথবা

ঘ) কোন তথ্য গোপন করে ঘোষণাটি করা হয়েছে

প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাপলেট বোর্ডের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো যেতে পারে। এই বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের মনোনীত একজন সদস্য থাকেন।

শাস্তি:

যদি কোন সংবাদপত্র অথবা পুস্তকে মুদ্রক এবং প্রকাশকের নাম পরিষ্কার এবং পাঠযোগ্য ভাবে ছাতা যদি না হয় এবং মুদ্রার অথবা প্রকাশনার স্থান যদি পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত না হয় তবে মুদ্রক অথবা প্রকাশকের ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে পাশাপাশি ৬ মাসের জেল হতে পারে আবার দুটি শাস্তি হতে পারে। ঘোষণা ছাড়া কোন ছাপাখানা চালু রাখা হলে অথবা নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে সম্পাদনা, মুদ্রণ এবং প্রকাশনার কাজ হলে একই শাস্তি হতে পারে। উপরন্তু শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদপত্রের ঘোষণা বাতিল করে দিতে পারেন। সংবাদপত্রের কপি সরবরাহ এর নীতি লঙ্ঘিত হলে প্রত্যেক বারের জন্য ৩০ টাকা জরিমানা হবে। কোন পুস্তক এর ক্ষেত্রে এই অপরাধের জন্য বইয়ের পপির মূল্য সমান জরিমানা করা যেতে হতে পারে।

২.২.৪ সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩

সরকারি গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সৃষ্ট আইন গুলি সুদৃঢ় ও সংশোধন করার জন্য সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩ সালে প্রচলিত হয়। আইনটি প্রবর্তনের সময়কাল থেকেই স্পষ্ট যে এই আইন প্রকৃতপক্ষে প্রেসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারত বর্ষ এই আইন বলবৎ রাখা বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলনা। ভিডিও প্রেস কমিশনের এই আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০১ এর পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে। এই আইন গোটা ভারতবর্ষে প্রযোজ্য এবং সরকারি কর্মচারী ও ভারতের বাইরের বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য সমানভাবে কার্যকর। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার কারণেই এই বিশেষ আইনের উদ্ভব।

গুপ্তচরবৃত্তি দণ্ড

৩ নম্বর ধারা যদি কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিঘ্নকর কোন উদ্দেশ্যে কোন সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে অথবা প্রবেশ করার চেষ্টা করে অথবা কোন নকশা পরিকল্পনা মডেল বাজাজ মন্তব্য বা টিকা তৈরি করে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের শত্রুদের কাছে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয় অথবা এই ধরনের পরিকল্পনা টিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে অথবা প্রকাশ করে অথবা কোন ব্যক্তির কাছে গোপন সংকেত বা সাংকেতিক চিহ্ন জ্ঞাপন করে অথবা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি পক্ষে ক্ষতিকারক এমনকি অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো শত্রুর হাতে তুলে দেয় তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। যদি এই অপরাধ ভারতীয় স্থল বাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী সংক্রান্ত হয় খনি খনিজ ক্ষেত্র, কারখানা বন্দর শিবির জাহাজ স্টেশন অথবা রাষ্ট্র সংক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে ১৪ বছরের জেল হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে তিন বছর।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অপরাধ:

৪ নম্বর ধারা

১) যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদেশী প্রতিনিধির সঙ্গে ভারত অথবা ভারতের বাইরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং শত্রুপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হানিকর কোনো তথ্য তাদের হাতে তুলে দেয় তবে তার অপরাধ তিন নম্বর ধারায় স্বীকৃত হবে।

২) কোন পূর্ব নির্ধারিত উপায় ও ধারণা ছাড়াই এই অপরাধ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রমাণিত হতে পারে

ক) কোন বিদেশী প্রতিনিধির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি ভারত ১)ভারতের বাইরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বা সেখানে যাতায়াত করে,

২) ভারত বা ভারতের বাইরে তার নাম অথবা ঠিকানা অথবা অন্য কোন ধরনের তথ্য যদি বিদেশি প্রতিনিধি অধিকারে থাকে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়,

খ) বিদেশি প্রতিনিধি গুপ্তচর বলতে বিদেশী কোন ব্যক্তি দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বোঝানো যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তায় আঘাত হানতে উদ্যোগী অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের স্বার্থে ভারতবর্ষের ভেতরে বা বাইরে এই ধরনের ক্ষতিকর কাজ সম্পাদন করেছে।

গ) ভারত অথবা ভারতের বাইরে যে কোন ঠিকানায় বিদেশী প্রতিনিধির বসবাসের যোগাযোগ রক্ষা করার এবং ব্যবসা চালানোর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই ঠিকানায় যোগাযোগ করার অর্থ সরকারি গোপনীয়তা আইন লংঘন করা। তথ্যের ভুল জ্ঞাপন ইত্যাদি ন।

৫ নম্বর ধারা যদি কোন ব্যক্তির অধিকার এ কোন সরকারি গোপন নথিপত্র নকশা পরিকল্পনা ইত্যাদি থাকে যেগুলি সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা সংক্রান্ত অথবা যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর এবং শত্রুর হাতে অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে তা এই আইনের আওতাভুক্ত হবে।। সরকারের অনুমোদিত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই তথ্য গোপন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হলে তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা এবং উভয় শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

সরকারি উর্দির অনধিকার ব্যবহার, মিথ্যা নতিস জালিয়াতি, মিথ্যা বর্ণনামূলক রিপোর্ট ইত্যাদি:

৬ নম্বর ধারা কোন সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করা অথবা কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে সাহায্য করার জন্য কোন ব্যক্তি যদি

ক) সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমানবাহিনী পুলিশ অথবা অন্যান্য সরকারি পদ ব্যবহার করে অথবা নিজেকে এই সকল ক্ষেত্রের প্রতিনিধি বলে দাবি করে অথবা

খ) মৌখিক বা লিখিতভাবে কোন মিথ্যা নির্দেশ বা আবেদন অথবা তথ্যের স্বাক্ষর করে অথবা

গ) পাসপোর্ট অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগের বা পুলিশের অনুমতি পত্র প্রশংসা পত্র অথবা অন্যান্য প্রমাণপত্র প্রবর্তন বা জালিয়াতি করে অথবা

ঘ) নিজেকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি রূপে দাবি করে অথবা গোপন সরকারি সংকেতের অপব্যবহার করে অথবা

চ) সরকারি বিভাগে স্ট্যাম্প, সীলমোহর ইত্যাদি জনগণকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে, তবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী বলে স্বীকৃত হবে। সে ক্ষেত্রে তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা দুটি শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর কার্যকলাপে অনধিকার চর্চা:

৭ নম্বর ধারা

১) কোনো নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত এলাকার কাছে জ্ঞাতসারে কোন পুলিশ প্রহরী পাহারাদার বা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে বাধাদান বা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করলে তা হবে ওই ধারার উলংঘন।

২) এই ধারা লঙ্ঘন করলে অভিযুক্ত ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে অথবা তার আর্থিক জরিমানা হতে পারে অথবা দুটি শাস্তি একত্রে হতে পারে।

কৃত অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন কর্তব্য:

৮ নম্বর ধারা

১) পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেমন সুপারিনটেনডেন্ট বা অন্যান্য অধিকারীগণ যারা নগরপাল অথবা ইন্সপেক্টর জেনারেলের দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত অথবা তাদের পক্ষে অথবা সেনা বাহিনীর কোন সদস্য, বা প্রহরী, পাহারাদার প্রমুখ যদি কোনো অপরাধ বা সন্দেহজনক অপরাধ সম্পর্কে কোন তথ্য দাবি করে তবে তার নিজস্ব খরচে সুবিধামতো স্থানে বা সুবিধামতো সময়ে পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য।

২) কোন ব্যক্তি এই তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে তার ৩ বছরের কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডও হতে পারে।

অপরাধীর প্রতিষ্ঠাতা অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া :

৯ নম্বর ধারা ঃ কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ সম্পাদনের চেষ্টা করে অথবা দুষ্কর্মে সাহায্য করে অথবা তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে সেই ধারায় অপরাধী বলে গণ্য হবে কৃত অপরাধের জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য সেই তার একই শাস্তি তার হবে।

গুপ্তচরকে আশ্রয় দেওয়া :

১০ নম্বর ধারা ঃ যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কোন অপরাধী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় অথবা তার অধিকারে থাকা কোন বাড়িতে এই ধরনের ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেয় তবে তা এই ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রেও তিন বছরের কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা অথবা দুটি প্রযোজ্য হতে পারে। এই সকল মামলা শুনানির ক্ষেত্রে আদালত জনসাধারণের উপস্থিতি বিশেষ ক্ষমতাবলে নিষিদ্ধ করতে পারে কিন্তু দণ্ডাদেশ ঘোষণা জনসমক্ষে করার বিধান আছে।

২.২.৫ কপিরাইট বা রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭

সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্র সঙ্গীত বৌদ্ধিক সম্পদ। এগুলোকে যথেচ্ছভাবে পুনর্মুদ্রণ বা তার থেকে সাহিত্যিক চৌর্য প্রতিরোধ করতেই ১৯৫৭ সালে কপিরাইট আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, মূল রচনাটিকে সংরক্ষণ করা এবং তার তথ্য, রচনার যথাযোগ্য মূল্য নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়তঃ রচনাটির সমপ্রসারণের প্রয়োজনে আইনে অনাবশ্যক কঠিন বর্জন করা হয়েছে। কপিরাইট এমন এক অধিকার যা যে কোনো ব্যক্তি বৌদ্ধিক পরিশ্রমের ফলে অর্জন করেন। তাই কপিরাইট আইনের প্রথম লক্ষ্য হলো যাতে অন্য কোনো ব্যক্তির সেই পরিশ্রমের সুফল অনভিপ্রেত এভাবে ভোগ না করে। এই আইন অনুসারে কপিরাইটের অধিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে এককভাবে অধিকার থাকবে :

ক. যেকোন ক্ষেত্রে রচনা বা সৃষ্টির পুনর প্রকাশ

খ. রচনাটির পুনর্মুদ্রণ

গ. সৃষ্টি টিকে জনসমক্ষে প্রদর্শন

ঘ. সৃষ্টি বা রচনা প্রযোজনা প্রকাশ এবং অনুবাদ।

আন্তর্জাতিক কপিরাইট অনুসারে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৫০ বছর কপিরাইট বলবৎ থাকে। শুধুমাত্র প্রকাশিত রচনার ক্ষেত্রেই নয় অপ্রকাশিত রচনার ক্ষেত্রও কপিরাইট আইনে যুক্ত হতে পারে। ১৯১১ সালে ইংল্যান্ড এই আইন চালু হয়। আইনের ধারা ১৩(১) অনুযায়ী কোন সাহিত্য-শিল্প নাটক বা সঙ্গীতধর্মী কোন মৌলিক সৃষ্টির অপ্রকাশিত হলেও তা কপিরাইটের আওতায় পড়বে। ১৯৮৪ সালের কপিরাইট আইনের সংশোধনীর পর থেকে অপ্রকাশিত রচনা অনুবাদ এবং সৃষ্টির প্রকাশের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। কপিরাইট আইন ভঙ্গ কারীকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা বা উভয় শাস্তি হিসেবে ধার্য করা হতে পারে।

২.২.৬ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য আইনগুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

২.২.৭ অনুশীলনী

১) দীর্ঘ উত্তর এর প্রশ্ন :

ক) সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইনটি আলোচনা করুন এই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি কি?

খ) সরকারি গোপনীয়তা আইন এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন

২) টীকা লেখার জন্য :

ক) রচনা স্বত্ব আইন

২.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Laws of Press — Dr. D.D. Basu.
2. History of Press– Press Laws and Communication éŸŸŸé B*f*N*f*Ahuja
3. ভারতের প্রেস আইন - বংশী মান্না
4. প্রেস আইন - কমল ভট্টাচার্য
5. বিষয় সাংবাদিকতা ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মডিউল ২ ভারতের প্রেস / মিডিয়া আইনগুলির ইতিহাস

একক ৩ ◻ আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান; সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা

গঠন

২.৩.১ উদ্দেশ্য

২.৩.২ প্রস্তাবনা

২.৩.৩ আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান

২.৩.৪ সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা প্রতিরক্ষা

২.৩.৫ সারাংশ

২.৩.৬ অনুশীলনী

২.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

১. পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় আইনীকরণের বেসিক স্ট্রাকচার

২. আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান

৩. সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা প্রতিরক্ষা

২.৩.২ প্রস্তাবনা

এই ইউনিটে আপনাকে পার্লামেন্ট বা প্রধানত সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় এ মিডিয়া রিপোর্টিংয়ের প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বোঝানো হবে।

সংসদ এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ও কাঠামো

সংসদ ভারতের সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনবিভাগ। নয়াদিল্লির সংসদ মার্গের সংসদ ভবনে এটি অবস্থিত। সংস্কৃত সংসদ (অর্থাৎ, সভা বা পরিষদ) থেকে এই নামটি গৃহীত হয়েছে। কোনও বিল আইনে পরিণত করতে সংসদের উভয় কক্ষে তা পাস হয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। ভবনের সেন্ট্রাল হলটি সংসদের যৌথ অধিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। লোকসভা নামক নিম্নকক্ষ ও রাজ্যসভা নামক উচ্চকক্ষ নিয়ে ভারতের সংসদ গঠিত।

লোকসভা [Lower House]

ভারতীয় আইনসভা দুটি কক্ষে বিভক্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভার অনধিক ৫৫২ [৫৩০+২০+২] জন সদস্য। ৫৩০ জনসদস্য ২৮ টি রাজ্যের জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ২০ জন নির্বাচিত হন এবং ২ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচ বছরের মেয়াদে লোকসভা গঠিত হয়। মেয়াদ পূর্তির আগে সরকারের পতন হলে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৪৫। লোকসভা দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন স্পিকার বা অধ্যক্ষ। লোকসভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হলে বা কোরাম [Quoram] না হলে স্পিকার সাময়িক কালের জন্য লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করতে পারেন। দলমত নির্বিশেষে স্পিকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

লোকসভার গঠন

(১) লোকসভার সদস্যগণ ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(২) বর্তমানে লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৫ জন। এর মধ্যে ৫৩০ জন সদস্য ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে এবং ১৩ জন সদস্য ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি থেকে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র ২ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।

(৩) ২৫ বছর বয়সি যেকোনো ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সদস্য হতে পারেন।

(৪) সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করেন এবং এই সভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তাঁরা সভার কাজ পরিচালনা করেন। লোকসভার সদস্যরা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন- লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ৫ বছরের আগেই লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

লোকসভার কার্যাবলী

(১) যেকোনো বিল বা আইন-ঘটিত প্রস্তাব লোকসভায় ও রাজ্যসভায় অনুমোদন করাতে হয়।

(২) অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন ও পাশ করাতে হয়।

(৩) সংসদে গৃহীত বিল আইনে পরিণত করতে হলে রাষ্ট্রপতির লিখিত সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল পুনর্বিবেচনার জন্য আবার সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন, কিন্তু অর্থবিল একবার লোকসভায় পাশ হলে রাষ্ট্রপতি তা পুনর্বিবেচনার জন্য আর সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না।

রাজ্যসভা

রাজ্যসভা ভারতীয় আইন সভার উচ্চ কক্ষ। এটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট সময় অন্তর লোকসভার অবলুপ্তি ও পুনর্নির্বাচন ঘটে। কিন্তু রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায় না। এর সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। এঁদের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসেবার ক্ষেত্র থেকে ১২ জন জ্ঞানীগুনী সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। এঁরা মনোনীত সদস্য নামে পরিচিত। রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছয় বছর হলেও প্রতি দু-বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণের ভোটে রাজ্যসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে

রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান সভার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করেন। ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজ্যসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৪৫। সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে রাজ্যসভা লোকসভার সমান মর্যাদা ভোগ করে। সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার ক্ষমতা রাজ্যসভার চেয়ে বেশি। কোনো বিষয় নিয়ে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। তবে লোকসভার আকার রাজ্যসভার প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায়, যৌথ অধিবেশনে লোকসভারই শক্তি বেশি থাকে। আজ পর্যন্ত সংসদে মাত্র তিনটি যৌথ অধিবেশন বসেছে। ২০০২ সালে সন্ত্রাস-বিরোধী আইন পোটা পাস করানোর জন্য শেষ যৌথ অধিবেশনটি বসেছিল।

২.৩.৩ আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান

সংসদীয় প্রতিবেদকের সংসদের প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিবেদন করা প্রয়োজন। তার কাজ সংসদে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় খেয়াল রাখা। এর জন্য গভীর মনোযোগ এবং লেখার গতি দরকার। সংসদীয় সাংবাদিককে সংবিধানের নতুন আইন ও সংশোধনী এবং সভার কার্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার।

প্রতিবেদককে তার পর্যবেক্ষণের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে এবং কোনও হেরফের না করা বা সংবাদকে বাঁক না দিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। একজন সাংবাদিককে অবশ্যই সাংবাদিকতার নীতিশাস্ত্রে আঁকড়ে থাকতে হবে এবং তার লেখায় প্রতিফলিত হওয়া কোনও বিষয়কে পক্ষপাতদুষ্ট বা অনুমান করা উচিত নয়।

সংসদে মূলত তিনটি মরসুম থাকে :

১. বাজেট

২. বাদল বা মনসুন

৩. শীতকালীন

জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলি সংসদে আলোচিত হয় এবং সংসদে কী আলোচনা হচ্ছে তা জানার অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে। নতুন বিলটি দিয়ে তাতণিক সংশোধনীগুলি পাস হচ্ছে, এগুলি সব সংসদীয় প্রতিবেদক রেকর্ড করে।

যুদ্ধ, বিপর্যয়, বন্যার মতো বিভিন্ন দুর্যোগের জন্য নতুন বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এই অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল বা অন্যান্য কোষাগার থেকে আসে। অর্থ সরবরাহের বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে সাংবাদিককে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। বাজেট থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয়নি এমন অর্থ কোথায় চলেছে তার প্রতিবেদককে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। এমন অনেকগুলি ঘটনা এবং দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে ব্যয়টি ব্যক্তিগত ব্যবহারে ব্যয় করা হয়েছিল।

যে কোনও সংসদীয় প্রতিবেদকের মূল এজেন্ডা হ'ল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং সংসদের মধ্যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।

২.৩.৪ সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা প্রতিরক্ষা

সংসদীয় সুবিধা কী? সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা বলতে সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের স্বতন্ত্র সামর্থ্য হিসাবে সংসদ কর্তৃক উপভোগ করা অধিকার বোঝায়, এগুলি ছাড়া তারা সংবিধানের উপর অর্পিত হিসাবে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে না।

এই সংসদীয় সুযোগগুলি কি আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত হয়?

সংবিধান অনুযায়ী সংসদ ও সংসদ সদস্যের ক্ষমতা, অধিকার ও অনাক্রম্যতা সংসদ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আইন কার্যকর করা হয়নি। এ জাতীয় কোনও আইন না থাকায় এটি ব্রিটিশ সংসদীয় সম্মেলন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

ভারতীয় সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদে বিশেষত দুটি অংশের উল্লেখ রয়েছে, যেমন বাক বাকস্বাধীনতা এবং প্রক্রিয়া প্রকাশের স্বাধীনতা। ধারা (১), সংসদে বাকস্বাধীনতার সুস্পষ্ট সুরক্ষিত করে এবং ধারা (২) এ বলে যে সংসদ বা কোনও কমিটিতে তার প্রদত্ত বক্তব্য বা ভোটের বিষয়ে সংসদ সদস্য কোনও আদালতে কোনও কার্যধারা দায়ের করতে পারবেন না এবং আরও এই বিধানটি দেওয়া হয়েছে যে কোনও প্রতিবেদন, কাগজ, ভোট বা কার্যবিধির সংসদের উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষের অধীনে বা এর অধীনে কোনও ব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে এতটা দায়বদ্ধ হতে পারবেন না।

অধিকার লঙ্ঘন কি?

বিশেষাধিকার লঙ্ঘন সংসদ সদস্য / সংসদের যে কোনও সুযোগ-সুবিধার লঙ্ঘন। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, সংসদ সদস্য, সংসদ বা এর কমিটিগুলির উপর যে কোনও পদক্ষেপ প্রতিচ্ছবি"; বিশেষাধিকার লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এর মধ্যে নিউজ আইটেম, সম্পাদকীয় বা সংবাদপত্র / ম্যাগাজিন / টিভি সাক্ষাতারে বা প্রকাশ্য বক্তৃতায় প্রকাশিত বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

সুযোগ-সুবিধা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে?

এরকম বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে দর্শনার্থীদের গ্যালারী থেকে লিফলেট নিক্ষেপ করায় দু"জনকে রাজ্যসভার অবমাননা করা হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে, একজনকে শ্লোগান দেওয়ার জন্য এবং দর্শকদের গ্যালারী থেকে চৌটি নিক্ষেপের জন্য লঙ্ঘন করা হয়েছিল।

অধিকার লঙ্ঘন বা হাউস অবমাননার ক্ষেত্রে শাস্তি কী?

ওই ব্যক্তিকে একটি সতর্কতা দেওয়া যেতে পারে এবং কেস হতে পারে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। লিফলেট ও চাঁপাল নিক্ষেপের ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তিদের সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া অংশের প্রকাশ/প্রচার ঃ

যে অংশ সংসদের কোন সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ যায় তা সাংবাদিকরা প্রকাশ বা প্রচার করতে পারেন না। বড়জোর বলা যায় অমুকের একটি মন্তব্য অধ্যক্ষ বা চেয়ারম্যান সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ বাদ দেওয়া অংশে কী ছিল তা প্রকাশ বা প্রচার করা যায় না।

২.৩.৫ সারাংশ

সংসদীয় প্রতিবেদকের সংসদের প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিবেদন করা প্রয়োজন। তার কাজ সংসদে উল্লিখিত প্রতিটি পয়েন্ট রেকর্ড করা। এর জন্য প্রচুর ঘনত্ব এবং লেখার গতি দরকার। সংসদীয় সাংবাদিককে সংবিধানের নতুন আইন ও সংশোধনী সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার।সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা বলতে সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের স্বতন্ত্র সামর্থ্য হিসাবে সংসদ কর্তৃক উপভোগ করা অধিকার এবং অনাক্রম্যতা বোঝায়, এগুলি ছাড়া তারা সংবিধানের উপর অর্পিত হিসাবে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে না।

২.৩.৬ অনুশীলনী

১. ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদীয় ও আইন অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করুন?

২. মিডিয়া রিপোর্টিংয়ে ভারতের সংবিধানের আওতাধীন সংসদীয় ও আইনসভিত্তিক সুবিধাগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করুন?

৩. ভারতের সংবিধান ব্যতীত বিভিন্ন আইন ও বিধি অনুসারে সংসদীয় ও আইনসভিত্তিক সুবিধাসমূহের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বিধান রাখুন।

২.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- H. K. Saharay : The Constitution of India — An Analytical Approach
- Dr. J. N. Pandey : Constitutional Law of India
- Aurobindo Mozumdar : The Law and the Newspapers

মডিউল ২ ভারতের প্রেস / মিডিয়া আইনগুলির ইতিহাস

একক ৪ ◘ মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা- ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

গঠন

২.৪.১ উদ্দেশ্য

২.৪.২ মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা-

২.৪.৩ ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

২.৪.৪ অনুশীলনী

২.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

১. মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা-

২. ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

২.৪.২ মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা-

মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human) হলো একটি ঘোষণাপত্র যা প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে প্যারিসে ঘোষিত হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের উপর সার্বজনীন ঘোষণার খসড়া সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হয়।

মুখবন্ধ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি;

যেহেতু মানব অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার ফলে মানুবের বিবেক লাঞ্ছিত বোধ করে এমন সব বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যেহেতু এমন একটি পৃথিবীর উদ্ভবকে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ কাঙ্খা রূপে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে সকল মানুষ ধর্ম এবং বাক স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং অভাব ও শংকামুক্ত জীবন যাপন করবে;

যেহেতু মানুষ যাতে অত্যাচার ও উতপীড়নের মুখে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয় সেজন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজনীয়;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক;

যেহেতু সদস্য জাতিসমূহ জাতিসংঘের সনদে মৌলিক মানবাধিকার, মানব দেহের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে সামাজিক উন্নতি এবং জীবনযাত্রার উন্নততর মান অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন;

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমূহের প্রতি সার্বজনীন সম্মান বৃদ্ধি এবং এদের যথাযথ পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ;

যেহেতু এ স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহের একটি সাধারণ উপলব্ধি এ অঙ্গীকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এজন্য এখন সাধারণ পরিষদ এই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করছে।

এ ঘোষণা সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের সাফল্যের সাধারণ মানদন্ড হিসেবে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত হবে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গ এ ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের জাতিসমূহ উত্তরোত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই অধিকার এবং স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি আদায় এবং যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে।

ধারা ১

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

ধারা ২

এ ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উতপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে।

কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসীর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবেনা; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক, হোক অছিভূক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা ৩

জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।

ধারা ৪

কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে।

ধারা ৫

কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা ৬

আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।

ধারা ৭

আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোন বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমান ভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ৮

শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ৯

কাউকেই খেয়ালখুশীমত গ্রেপ্তার বা অন্তরীণ করা কিংবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

ধারা ১০

নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১

১. দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকারসম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইনানুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে।

২. কাউকেই এমন কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ত্রুটি সংঘটনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলনা। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময় যে শাস্তি প্রযোজ্য ছিল, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া চলবে না।

ধারা ১২

কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ১৩

১. নিজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. প্রত্যেকেরই নিজ দেশ সহ যে কোন দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১৪

১. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্নদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. অরাজনৈতিক অপরাধ এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির পরিপন্থী কাজ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত অভিযোগের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা নাও করা যেতে পারে।

ধারা ১৫

১. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না।

ধারা ১৬

১. ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেবে সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্যজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে তাঁদের সমান অধিকার থাকবে।

২. বিয়েতে ইচ্ছুক নরনারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে।

৩. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী-একক, সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

ধারা ১৭

১. প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।

২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা বাবে না।

ধারা ১৮

প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

ধারা ১৯

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২০

১. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে।

২. কাউকে কোন সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা ২১

১. প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

৩. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৩

১. প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরীবেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

২. কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

৩. কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

৪. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ২৫

১. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিতসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং এ সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্যকারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকার সহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহবন্ধন-বহির্ভূত কিংবা বিবাহবন্ধনজাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা ২৬

১. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

২. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা-সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তিরক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের কার্যাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩. কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে, তা বেছে নেবার পূর্বাধিকার পিতামাতার থাকবে।

ধারা ২৭

১. প্রত্যেকেরই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফল সমূহে অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা ভিত্তিক কোন কর্মের রচয়িতা হিসেবে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।

ধারা ২৮

এ ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অংশীদারীত্বের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ২৯

১. প্রত্যেকেরই সে সমাজের প্রতি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, যে সমাজেই কেবল তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের স্বাধীন এবং পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

২. আপন স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহ ভোগ করার সময় প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন যা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতা, গণশৃংখলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন দ্বারা নির্নীত হবে।

৩. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করা যাবে না।

ধারা ৩০

কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোন কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাত করতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোন কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

২.৪.৩ ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

আইপিডিসির আন্তঃসরকারী কাউন্সিল হ'ল প্রোগ্রামটির মান-নির্ধারণ এবং নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। এই ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কাউন্সিল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন উদ্যোগ শুরু করেছে যা মিডিয়া উন্নয়নে তার পদ্ধতিতে শক্তিশালী করেছে।

আইপিডিসি কাউন্সিল ২০০৮ সালে মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস (এমডিআই), ২০১৩ সালে সাংবাদিকদের সুরক্ষা সূচক (জেএসআই) এবং সর্বাধিক সম্প্রতি ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি ইনডিকেটরেটস (আইইউআই) হিসাবে

২০১৮ সালে বেশ কয়েকটি মিডিয়া এবং ইন্টারনেট-সম্পর্কিত সূচককে সমর্থন করেছে। এই সূচকগুলির লক্ষ্য প্রমাণ-ভিত্তিক সুপারিশগুলির মাধ্যমে শূন্যস্থান চিহ্নিত করা ও সমাধান করা। তারা গণমাধ্যম এবং ইন্টারনেট বিকাশ এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তার লক্ষ্যতে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং দাতাদের পক্ষে ওঠার জন্য একটি রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে। এমডিআইগুলি কোনও দেশে মিডিয়া বিকাশের সামগ্রিক পরিবেশের মূল্যায়ন করার সময়, জেএসআইগুলি মূল্যায়ন করে যে প্রাসঙ্গিক অভিনেতারা আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই সাংবাদিকদের কীভাবে কাজ করতে সক্ষম করে চলেছে। আইইউআই হিসাবে, এগুলি জাতীয় ইন্টারনেট নীতি এবং পরিবেশকে সাংবাদিকতা এবং মিডিয়া বিকাশের নতুন প্রসঙ্গ হিসাবে মূল্যায়ন করে।

সৌজন্যে - https-//en.unesco.org/programme/ipdc/initiatives

সাংবাদিকতা শিক্ষা

গণতন্ত্র, সংলাপ ও উন্নয়নের প্রচারের জন্য মিডিয়া সিস্টেমের সম্ভাবনা আনা জরুরি ''এই উপলব্ধি সহ'' কাউন্সিল ২০০৭ সাল থেকে আইপিডিসির বিশেষ উদ্যোগে 'সাংবাদিকতা শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই উদ্যোগটি ''সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য মডেল পাঠ্যক্রম'' এবং ''মান সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড এবং সূচক'' প্রকাশনা সম্পর্কিত কাজকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। মডেল কারিকুলাম সিঙ্গাপুরে প্রথম বিশ্ব সাংবাদিকতা শিক্ষা কংগ্রেসে (ডব্লুজেইসি -১) সদস্য দেশগুলির অনুরোধে ২০০৭ সালে প্রবর্তিত একটি প্রকাশনা।

ইউনেস্কো ২০০৭ সালে সাংবাদিকতার জন্য একটি মডেল কারিকুলাম প্রকাশ করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত সাংবাদিকতার দিকে মনোনিবেশ করা, জ্ঞাপনের দিকে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমটি একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু) তার পাঠ্যক্রমগুলিতে মডেল কারিকুলামের অনেকগুলি সুপারিশকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মডেল পাঠ্যক্রমের ভূমিকাতেই এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে সাংবাদিকের মূল লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে সমাজসেবা করা। মডেল কারিকুলামে এটিও বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে সাংবাদিকতার অধ্যয়নকে পেশাদার প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ হিসাবে দেখা উচিত। ২০০০ সালের মার্চ মাসে ইউনেস্কো সমর্থিত একটি আলোচনাসভায় দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকতাবিদরা এই মডেল কারিকুলাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরাও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উন্নয়নশীল দেশে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমে ইউনেস্কোর সুপারিশগুলো যতটা সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। ২০১৭-২০১৮-এ, বিশ্বব্যাপী ১৮ টি প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা শিক্ষা সম্পর্কিত ইউনেস্কোর মডেল পাঠ্যক্রম এবং সম্পর্কিত সিলেবি ভিত্তিক তাদের পাঠ্যক্রমটি আপগ্রেড করেছে।

Media Sector Development

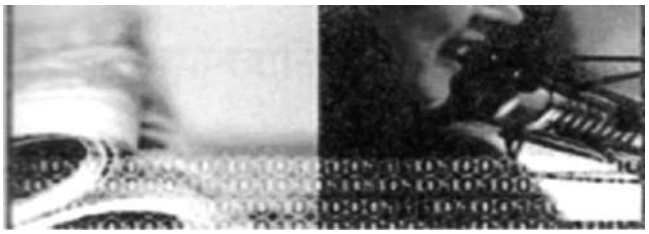

সৌজন্যে - https://en.unesco.org./programme/ipdc/initiatives

আইপিডিসি এমন প্রকল্পগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠকে প্রশস্ত করে এবং মিডিয়া বিকাশের প্রচার করে। আইপিডিসির দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া তাতর্যপূর্ণ মিডিয়া বিকাশের প্রয়োজনের প্রতিও সাড়া দেয়, যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ইবোলা সংকট চলাকালীন, ভারতের কেরালায় বন্যা এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কট।

সৌজন্যে - https://en.unesco.org./programme/ipdc/initiatives

২.৪.৪ অনুশীলনী

১. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

২. মিডিয়া ব্যক্তির জন্য ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ ব্যাখ্যা করুন?

মডিউল ৩ প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক ১ ◘ মানহানি ও সাংবাদিকতার সুরক্ষা - আদালত অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা - রাষ্ট্রদ্রোহের বিষয়সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ

গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ মানহানি আইন ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা

৩.১.৩ আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১ এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা

৩.১.৪ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (Sedition Act)

৩.১.৫ সারাংশ

৩.১.৬ অনুশীলনী

৩.১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- মানহানি আইন :
- আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১
- রাষ্ট্রদ্রোহ আইন

৩.১.২ মানহানি আইন ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা

মানহানি আইন :

ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় মানহানি আইন। যখন কোন সংবাদ মাধ্যমে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোন সংস্থার বিরুদ্ধে মানহানিকর কোন মন্তব্য বা বক্তব্য প্রকাশ বা প্রচার করা হয় তখন যদি সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা সংস্থা আদালতের শরণাপন্ন হয় তবে তা মানহানি আইন এর বিচারাধীন বলে গণ্য হবে। ভারতীয় সংবিধানে বাকস্বাধীনতা কে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই অধিকার হিসেবে গ্রাহ্য কোন ব্যক্তি বা বিষয়কে প্রকাশ অথবা প্রচার করতে পারে। কিন্তু নীতিগত বা আইনগত দিক থেকে এই সংবাদগুলো

কে সত্য বলে প্রমাণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের যদি কোন সংবাদ মাধ্যম এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে এই সংবাদমাধ্যমটি মানহানির মামলায় বিচারাধীন বলে গণ্য হবে। ভারতীয় আইনে মানহানির মামলার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত কোন মন্তব্য যখন বেশিরভাগ মানুষের কাছে মানহানিকর বলে গণ্য হয় তখনই তার মানহানি মামলার আওতায় আসে।। তবে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত মৌলিক অধিকার গুলির মধ্যে মর্যাদাহানিকর শব্দ বা মন্তব্য কোন গুলি তা নির্দিষ্ট করে না দেওয়ায় মানহানি মামলা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে। এই জটিলতা কাটাতে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ৪৯৯ ধারায় কিছু আলোকপাত করা হয়েছে এই আইনে বলা হয়েছে-

১) কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করলে তা মানহানী আইনের আওতাভুক্ত হতে পারে।

২) যে ব্যক্তি জনসমক্ষে আসতে চান না তাকে প্রচারমাধ্যমে জোর করে তুলে ধরলে তাও মানহানি মামলার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে

৩) সংশ্লিষ্ট সংবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নন অথচ তাকে সংবাদের অন্যতম চরিত্র হিসেবে প্রকাশ করা বা প্রচার করা হয়েছে এবং ক্ষেত্র মানহানির মামলা হতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের মানহানি :

মানহানির দুই প্রকারের কথিত মানহানি এবং লিখিত মানহানি। কথিত মানহানি লাইবেল বলা হয় আর লিখিত মানহানি স্ল্যান্ডার হিসেবে বিবেচিত করা হয়। তবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মানহানির মধ্যে মূল পার্থক্য ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে। দেওয়ানী মানহানির মূল উদ্দেশ্য যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সে ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের মূল শাস্তি অপরাধীকে জরিমানা অথবা কারাদণ্ড অথবা দুটি শাস্তির মাধ্যমে দণ্ড দেওয়া। দেওয়ানী মানহানীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সত্যতা মানহানির দেওয়ানী মামলায় আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য।

ফৌজদারি আইনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে সরল বিশ্বাস আত্ম রক্ষার অন্যতম উপায় তবে সত্য এখানে রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় এর ব্যাতিক্রম রয়েছে। জনস্বার্থে মানহানিকর প্রকাশনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রমাণ করাও জরুরি।

এই দুই ধরনের প্রতিবিধান একে অপরের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক। প্রভাবিত ব্যক্তি একই সঙ্গে দেওয়ানি অভিযোগ আনতে ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। এমনকি ৪৯৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারি আদালতে দণ্ডিত হলেও দেওয়ানী মামলায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। মানহানি আইন এর চারটি ব্যাখ্যা ও দশটি ব্যতিক্রম আছে।

ব্যাখ্যা ১ যদি কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন অভিযোগ বা অপমান কর মন্তব্য করা হয় এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব সেই ব্যক্তির পরিবার বা নিকটাত্মীয়দের ওপর পড়ে তবে তা মানহানি হবে।

ব্যাখ্যা ২ যদি কোন বিশেষ কোম্পানি সংস্থা বা গোষ্ঠী অথবা একটি বিশেষ শ্রেণীর সম্পর্কে অভিযোগ বা অপমান কর মন্তব্য করা হয় তবে তা মানহানি হবে।

ব্যাখ্যা ৩ যদি কোনো বিদ্রূপাত্মক জাতীয় অভিব্যক্তি কারোর মর্যাদাহানি করে তবে তা মানহানি হবে।

ব্যাখা ৪ যদি কোন অভিযোগের ফলে কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা তার জাতীয় অথবা পোশাক প্রভাবিত করে এবং তার কৃতিত্বকে খাটো করে এবং তার অবস্থান সমাজের চোখে বিরাগভাজন ও মর্যাদা হানিকর করে তোলে তবে তা মানহানি হবে।

তবে মানহানি আইন এর ক্ষেত্রে দশটি ব্যতিক্রম আছে এবং মানহানি মামলার প্রতিরোধে ১০ টি ব্যাতিক্রম প্রযোজ্য।

১) যদি কোন সংবাদ সত্য হয় এবং জনস্বার্থে প্রকাশিত হয়; যদিও জনস্বার্থ শব্দটি প্রশ্নাতীত নয়।

২) কোন সরকারি কর্মচারীর কাজকর্ম নিয়ে সরল বিশ্বাসে যদি কোন মতামত প্রকাশ করা হয়।

৩) জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্ন বা বিতর্কিত বিষয়ে যদি কোন মতামত সরল বিশ্বাসে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করে।

৪) আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার প্রতিবেদনে যদি পুরোপুরি সত্য প্রকাশিত হয়।

৫) কোন মামলার রায় সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে দেওয়া কোন মতামত প্রকাশ বা প্রচার করা হলে।

৬) জনগণের দরকারে প্রেরিত কোন বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত ও প্রচারিত কোন মতামত।

৭) কোন ব্যক্তির সম্পর্কে অন্য কোনো ব্যক্তির দেওয়া মতামত প্রচার বা প্রকাশিত হলে।

৮) জনস্বার্থে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিস্বার্থে প্রকাশিত ও প্রচারিত কোন মন্তব্য।

৯) আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে গণ্য এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোনো মতামত প্রদান করা হলে এবং

১০) জনস্বার্থে কোন সতর্কীকরণ মন্তব্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হলে তা মানহানি আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

মানহানির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হলে চারটি বিষয়ের ওপর প্রমাণ হাজির করতে হবে সেগুলি হল-

১) প্রকাশিত সংবাদটি প্রকৃতই মর্যাদাহানিকর কিনা

২) সংবাদটি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই প্রচারিত ও প্রকাশিত কিনা

৩) মর্যাদাহানিকর সংবাদটি প্রকৃতই প্রকাশিত কিনা

৪) প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা কিনা

মানহানির মামলায় বিচারক যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ গুলি সত্য এবং আইনত সিদ্ধ বলে মনে করেন তাহলে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জরিমানা করতে পারেন এই জরিমানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে অভিযোগকারী সমাজের কোন স্তরবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত এবং সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিচার্য।

৩.১.৩ আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১ এবং সাংবাদিকতার সুরক্ষা

আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১

সরকারের তিনটি বাহুর মধ্যে অন্যতম প্রধান শাখা হলো বিচার বিভাগ। তারা আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে এর নিরপেক্ষতার ওপর সকলের যাতে বিশ্বাস থাকে এবং দেশ ও সমাজের স্বার্থে জাতের বিচার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য এই বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজন। তাদের কাছে হস্তক্ষেপ করা বা প্রভাবান্বিত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। মুখ্যত এই কারণেই আদালত অবমাননা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের দুই নম্বর ধারা অনুযায়ী দুই ধরনের অবমাননা আছে-

১) দেওয়ানী অবমাননা- কোন আদালতের বিচার রায় আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদির আদালতকে দেওয়া কোন মুচলেকার স্বেচ্ছা লঙ্ঘনকে দেওয়ানী অবমাননা বলা হয়।

২) ফৌজদারি অবমাননা- কোন আদালত কে অপমান করা কোনো আইনগত কার্যবিবরণী বা বিচার প্রয়োগের পথে বাধা দেওয়া অথবা হস্তক্ষেপ করা অথবা প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং তা প্রকাশ ও প্রচার করাকে ফৌজদারি অবমাননা বলা হয়। এই আইনটি সারা ভারতে প্রযোজ্য।

আদালত অবমাননা আইনের সংজ্ঞা :

এই আইন অনুযায়ী

১) আদালত অবমাননা বলতে দিওয়ানি বা ফৌজদারি অবমাননা বোঝানো হবে।

২) দেওয়ানী অবমাননা বলতে কোন বিচার রায় নির্দেশ আদেশ বা কোন আদালতের অন্য কোন কাজকে স্বেচ্ছায় অপমান করা বা কোন আদালতের অন্য কোন নির্দেশ স্বেচ্ছায় অমান্য করা বা আদালতকে দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতি স্বেচ্ছায় লংঘন করা কে বোঝানো হয়।

২) ফৌজদারী অবমাননা বললে বোঝানো হবে লিখিত বা কথ্যরূপ এর সংকেত বা দৃশ্য প্রতিরূপ এর সাহায্যে কোন বিষয় প্রকাশ করা বা অন্য কোন কাজ করা যা

ক) কোন আদালতের কলঙ্ক রটনাকারী বা রটনার প্রবণতা অধিকার খর্ব করা বা অধিকার খর্ব করতে পারে অথবা

খ) কোন বিধিসম্মত কার্যনির্বাহীর যথাযথ ধারার ক্ষতি করে বা ধারায় হস্তক্ষেপ করে বা হস্তক্ষেপ করতে পারে বা

গ) অন্য কোন পদ্ধতিতে ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

৪) হাইকোর্ট বলতে কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাইকোর্ট কে বোঝাবে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এর কোন বিচার বিষয়ক অধ্যক্ষের আদালতকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আদালত অবমাননার ব্যতিক্রম :

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোর কার্যকলাপ আদালত অবমাননা বলে গণ্য হবে না-

১) কোন বিষয়ে নিরপরাধ প্রকাশ ও পরিবেশন

২) বিচার সংক্রান্ত কার্যবিবরণীর পক্ষপাতহীন ও যথাযথ প্রতিবেদন

৩) বিচার সংক্রান্ত আইনের নিরপেক্ষ সমালোচনা করা

৪) নিম্নতর আদালতের অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করা

৫) বিচারকের ঘরে বা প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত কোন কার্যবিবরণী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করলে তা কিছু ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা বলে পরিগণিত হয় না।

আদালত অবমাননার শাস্তি :

কোন আদালতের অবমাননা করলে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটি শাস্তি একসঙ্গে হতে পারে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় তবে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন বা শাস্তি মুকুবও হতে পারে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়:

সমসাময়িককালে প্রচলিত কোনো উল্লেখ থাকলেও আদালতে যদি মনে করে যে ন্যায় বিচারের যথাযথ ধারায় এটি হস্তক্ষেপ করছে না তবে কোনো আদালত এই আইন অনুযায়ী আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তারিখে আদালত অবমাননা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় তার এক বছরের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১.৪ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (Sedition Act)

রাষ্ট্রদ্রোহ নিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি)-র ১২৪এ ধারাটি ব্রিটিশ জমানার। তৈরি হয়েছিল ১৮৬০ সালে। স্বাধীন ভারতে, বিশেষ করে বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটির পর্যালোচনার দাবি দীর্ঘদিনের।

রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত বা তেমন কোনও ষড়যন্ত্রে প্ররোচনকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ যে কোনও রাষ্ট্রের কাছেই তা গভীর উদ্বেগের বিষয়।

১২৪এ ধারা একটি ঔপনিবেশিক আইন, যা আধুনিক গণতন্ত্রে সম্পূর্ণ অচল। দুর্ভাগ্যবশত প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সরকারে আসীন থাকাকালীন এই আইনের অপব্যাখ্যার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সরকারবিরোধী কণ্ঠরোধের কাজে তার ব্যবহার করে থাকে।

৩.১.৫ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য আইনগুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

৩.১.৬ অনুশীলনী

১. আদালত অবমাননা আইনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করুন, এই আইনের উন্নয়নের শাস্তি কি?

২. মানহানি আইন এর বিভিন্ন দিক গুলি আলোচনা করুন।

৩.১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Laws of Press — Dr. D.D. Basu.
2. History of Press, Press Laws and Communication — B.N. Ahuja
3. ভারতের প্রেস আইন- বংশী মান্না
4. প্রেস আইন - কমল ভট্টাচার্য
5. বিষয় সাংবাদিকতা ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মডিউল ৩ প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক ২ ❐ কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫ মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬

গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫

৩.২.৩ মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬

৩.২.৪ সারাংশ

৩.২.৫ অনুশীলনী

৩.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫
- মহিলাদের অশোভন প্রতিনিধিত্ব নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬

৩.২.২ কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫

সারা ভারতে কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের চাকরির কোন কোন শর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন ১৯৫৫ সালে রচিত হয়। এই আইন অনুযায়ী সংবাদপত্র বলতেই প্রকাশ্য সংবাদ বা প্রকাশ্য সংবাদের উপর মন্তব্য সম্বলিত কোন ছাপা সাময়িকপত্র কে বোঝানো হবে এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হতে পারে এমন মুদ্রিত সাময়িক পত্রের কোন শ্রেণীকে ও বোঝানো হবে। সংবাদপত্র কর্মচারী বলতে কোন কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কাজ করার জন্য নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে বোঝানো হবে। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান অর্থ এক বা একাধিক সংবাদপত্র উৎপাদন বা প্রকাশ করার জন্য বা কোনো সংবাদ সংস্থা চালানোর জন্য কোন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির তথ্য অ- নিগমবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান।

অ- সাংবাদিক সংবাদপত্র কর্মচারী বলতে যে সকল ব্যক্তিকে বোঝানো হবে তারা নিম্নলিখিত পর্যায় গুলির অন্তর্ভুক্ত নয়-

১) একজন কর্মরত সাংবাদিক বা

২) প্রধানত পরিচালনা সংক্রান্ত বা প্রশাসনিক পদে কর্মরত ব্যক্তি বা

৩) তত্ত্বাবধানকারী পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যিনি তার কর্তব্যের খাতিরে ব্যস্ত ক্ষমতার ফলে মূলত পরিচালনা সংক্রান্ত কোন ধরনের কাজকর্ম নির্বাহ করেন।

কর্মরত সাংবাদিক বলতে এমন কোন ব্যক্তি কে বোঝাবে যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানত একজন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিযুক্ত এবং এর দ্বারা কোন সম্পাদক বা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক বার্তা সম্পাদক সহ-সম্পাদক রচনা লেখার প্রতিবেদক সংবাদদাতা ব্যঙ্গচিত্র সংবাদ আলোকচিত্রী ও প্রুফরিডার কে বোঝাবে।

আনুতোষিক প্রদান :

১) যে ক্ষেত্রে-

ক) এই আইন প্রচলনের আগে বা পরে কোন কর্মরত সাংবাদিক যিনি কমপক্ষে ৩ বছর কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান একটানা কাজ করছেন এবং

১) নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে যদি নিয়োগকর্তা কর্তিক এই চাকরির ঘটানো হয়ে থাকে, ২) অবসর গ্রহণের বয়স হওয়ার ফলে তিনি যদি অবসর গ্রহণ করে থাকেন বা

খ) এই আইন প্রচলনের আগে বা পরে যদি কোন কর্মরত সাংবাদিক কমপক্ষে একটানা ১০ বছর কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকেন এবং যদি তিনি বিবেকের নির্দেশ ছাড়া অন্য কোনো কারণে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে ১৯৬১ সালের পয়লা জুলাই বা তারপরে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে থাকেন বা

গ) এই আইন প্রচলনের আগে বা পরে যদি কোন কর্মরত সাংবাদিক কমপক্ষে একটানা তিন বছর কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে থাকেন এবং যদি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে ১৯৬১ সালের পয়লা জুলাই বা তারপরে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে থাকেন বা

ঘ) কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় কোন কর্মরত সাংবাদিক মারা যান,

তবে কর্মরত সাংবাদিকরা তার মৃত্যু হয়ে থাকলে তার মনোনীত ব্যক্তি ব্যক্তিগণ বা যদি কর্মরত সাংবাদিকের মৃত্যুকালে তার কোন মনোনয়ন না থাকে তাহলে বিশেষ ক্ষেত্রে তার পরিবারকে শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী উদ্ভূত কোন সুবিধা বা অধিকারের ক্ষতি না করে এই চাকরির ছেদ অবসরগ্রহণ পদত্যাগ বা মৃত্যুতে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তার নিয়োগকর্তা কর্তৃক আনুতোষিক দেওয়া হবে। প্রত্যেক সম্পূর্ণ কর্ম বর্ষের জন্য বা ছয় মাসের বেশি বা তার কোন অংশের জন্য ১৫ দিনের গড় বেতনের সমান হারে তার হিসাব হবে। তবে ১০ বছর ধরে কর্মরত সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে তাকে যাওয়া উন্নত শিকের মোট পরিমাণ সাড়ে ১২ মাসের গড় বেতনের বেশী হবেনা।

কাজের সময় :

১) এই আইন অনুযায়ী রচিত নিয়মাবলী সাপেক্ষে কোন কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান প্রতি চার সপ্তাহের ভেতর খাবার সময় বাদে মোট ১৪৪ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বলা হবে না বা করতে দেওয়া হবে না।

২) প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক এ পরপর সাতদিন কাজের পর কমপক্ষে একটানা ২৪ ঘন্টার বিশ্রাম দেওয়া হবে রাত ১০ টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত সময় এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ধারায় বর্ণিত সপ্তাহ বলতে বোঝানো হবে শনিবারের মাঝরাত থেকে শুরু হয়ে সাতদিন সময়।

ছুটি :

নির্দিষ্ট বা নৈমিত্তিক বা অন্য কোনো ধরনের ছুটির ক্ষতি না করে প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক

১) কর্তব্যরত দিনগুলির জন্য কমপক্ষে ১/১১ ভাগ দিনের পূর্ণ বেতন অর্জিত ছুটি পেতে পারেন।

২) চাকরির সময় চিকিৎসকের প্রশংসা পত্রের উপর ভিত্তি করে কমপক্ষে ১/১৮ ভাগ দিনের জন্য অর্ধ বেতন ছুটি পেতে পারেন।

বেতন হার স্থির বেতন হার স্থির বা সংশোধন করা :

১) নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার

ক) কর্মরত সাংবাদিকদের সম্পর্কের বেতনের হার স্থির করবে।

খ) যথাসময়ে বা নির্দিষ্ট বিরতির পরে এই ধারা অনুযায়ী বা কর্মরত সাংবাদিকদের বেতন হার স্থির করার আইন, ১৯৫৮ ছ নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে বেতন হার সংশোধন করতে পারবে।

২) কর্মরত সাংবাদিকদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী কাজ করা বা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বেতনের হার সংশোধন করতে পারে।

বেতনের হার স্থির বা সংশোধন করার পদ্ধতি :

এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মত একটি বেতন পার্ষদ গঠন করবে-

ক, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো দুজন ব্যক্তি থাকবেন।

খ, কর্মরত সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করার মত দুজন ব্যক্তি থাকবেন,

গ, তিনজন নির্দলীয় ব্যক্তি থাকবেন এদের মধ্যে একজন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হবেন এবং উক্ত পর্ষদের সভাপতি হিসেবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক ব্যক্তি থাকবেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন সাহায্যে কর্মরত সাংবাদিকদের অন্তর্বর্তী বেতন স্থির করতে পারে।

৩.২.৩ মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬

এই আইনে বিজ্ঞাপন বা অন্য প্রকাশনায় এমন কি কোন পণ্যের মোড়কেও মহিলাদের অশোভন উপস্থাপনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলাদের অশোভন প্রকাশ বলতে বোঝায় যে কোন প্রক্রিয়ায় নারী শরীরের বা শরীরের কোনো বিশেষ অংশের এমন উপস্থাপনা যা অসভ্য মহিলাদের পক্ষে অবমাননাকর অথবা ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে যেকোন ভাবে মহিলাদের অশোভন প্রতিনিধিত্ব হয় এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এই আইনের চার নম্বর ধারায় যেকোনোভাবে মহিলাদের অশোভন প্রতিনিধিত্ব হয় এমন বই

কাগজ বা ডাকযোগে পাঠানো নিষিদ্ধ। উক্ত আইনের ৬ নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে এই আইনের অবমাননার প্রথম অপরাধের শাস্তি দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা। পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ সমাজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা আর্থিক জরিমানার পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে পারে। এই দুটি আইন ছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ২৯২ এবং ২৯৩ অশ্লীলতা প্রচার করা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। ধারা ২৯২ এবং ২৯৩ অশ্লীলতার প্রচার করা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা উল্লেখ আছে। ধারা ২৯২ অশ্লীল পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি বিক্রি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং ভাড়া ২৯৩ অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের কাছে অশ্লীল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য।

৩.২.৪ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য আইনগুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

৩.২.৫ অনুশীলনী

১. কর্মরত সাংবাদিক আইনের বিভিন্ন নির্দেশাবলী আলোচনা করুন।

২. অশ্লীলতা প্রতিরোধক আইন গুলি আলোচনা করুন।

৩.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. Laws of Press — Dr. D.D. Basu.
2. History of Press, Press Laws and Communication — B.N. Ahuja
3. ভারতের প্রেস আইন - বংশী মান্না
4. প্রেস আইন - কমল ভট্টাচার্য
5. বিষয় সাংবাদিকতা ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মডিউল ৩ প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক ৩ ❐ ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার আইন, কপিরাইট আইন, ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন সহ - তথ্য অধিকার আইন ২০০৫- হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার আইন

৩.৩.৩ কপিরাইট আইন

৩.৩.৪ ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন

৩.৩.৫ তথ্য অধিকার আইন ২০০৫-

৩.৩.৬ হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

৩.৩.৭ সারাংশ

৩.৩.৮ অনুশীলনী

৩.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার আইন
- কপিরাইট আইন
- ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৫-
- হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

৩.৩.২ ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার আইন

মূলত ডাব্লুটিও-তে ভারতের প্রবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আইপি-র সব ধরণের সম্পর্কিত বিধিগুলি সংশোধন বা পুনরায় চালু করা হয়েছে। ভারতে আইপি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কয়েকটি উন্নয়ন হয়েছে।

১. পেটেন্টস: বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান নিয়োগের নতুন আবিষ্কার, বিদ্যমান প্রযুক্তিতে মূল্য সংযোজন। এটি উদ্ভাবক এবং সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি। যেমন, একটি নতুন ড্রাগ।

২. ট্রেড মার্ক এবং সার্ভিস মার্ক: কোনও শব্দ, পরিষেবা বা স্তরের আকারে ভিজ্যুয়াল প্রতীক কোনও উতাদনকারীর নিবন্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন, ইয়াহু, জি, হোন্ডা।

৩. শিল্প নকশাগুলি: কোনও নিবন্ধে প্রয়োগ করা লাইন বা রঙের রচনাটির আকার, কনফিগারেশন প্যাটার্ন, অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আইডিয়া বা ধারণা। ডিজাইন হ''ল গ্রাহক জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি শিল্প পণ্যকে সুন্দর করে তোলার জন্য। শিল্প পণ্য অলঙ্করণ, রুপায়ন এবং কনফিগারেশন জন্য গৃহীত যে কোনও নতুন বা মূল নকশা নকশা নিবন্ধনের জন্য যোগ্য।

৪. কপিরাইট: সাহিত্যিক, নাটকীয়, বাদ্যযন্ত্র, শৈল্পিক কাজ, সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের রেকর্ড এবং সম্প্রচারের অনুলিপি এবং ব্যবহারের অধিকার।

৫. ভৌগলিক ইঙ্গিত: ভৌগলিক সূচকগুলি সেই অঞ্চলের কোনও অঞ্চলে, উত বা স্থানীয় অঞ্চলে উত হিসাবে পণ্যগুলি চিহ্নিত করে, যেখানে পণ্যগুলির একটি নির্দিষ্ট গুণ, খ্যাতি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই তাদের ভৌগলিক উত, যেমন দার্জিলিঙের চা, কাঁচিপুরমের শাড়ি ইত্যাদি।

বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার কি?

বৌদ্ধিক সম্পত্তি (আইপি) এমন একটি শব্দ যা কোনও ব্র্যান্ড, উদ্ভাবন, নকশা বা অন্যান্য ধরণের সৃষ্টিকে বোঝায় যা কোনও ব্যক্তি বা ব্যবসায়ের আইনী অধিকার রয়েছে। প্রায় সব ব্যবসায়েই ,ফার্মের মালিক, যা কোনও ব্যবসায়িক সম্পদ হতে পারে। ভারতে আইপি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কয়েকটি উন্নয়ন হয়েছে

ট্রেড মার্কস

পেটেন্ট

কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার

শিল্প নকশা

ভৌগলিক ইঙ্গিত

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের লেআউট ডিজাইন

উদ্ভিদ বিভিন্ন

তথ্য প্রযুক্তি এবং সাইবার অপরাধসমূহ

তথ্য সুরক্ষা

কপিরাইট - এটি লিখিত বা প্রকাশিত রচনা যেমন বই, গান, চলচ্চিত্র, ওয়েব সামগ্রী এবং শৈল্পিক কাজগুলি রক্ষা করে;

পেটেন্টস - এটি বাণিজ্যিক উদ্ভাবনগুলি রক্ষা করে, উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন ব্যবসায় পণ্য বা প্রক্রিয়া;

ডিজাইন - এটি নকশাগুলি, যেমন অঙ্কন বা কম্পিউটারের মডেলগুলিকে সুরক্ষা দেয়;

ব্যবসায়ের চিহ্ন - এটি এমন চিহ্ন, চিহ্ন, লোগো, শব্দ বা শব্দকে সুরক্ষা দেয় যা আপনার প্রতিযোগীদের থেকে আপনার পণ্য এবং পরিষেবাগুলিকে আলাদা করে।

৩.৩.৩ কপিরাইট আইন

কপিরাইট বা রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭

সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্র সঙ্গীত বৌদ্ধিক সম্পদ। এগুলোকে যথেচ্ছভাবে পুনর্মুদ্রণ বা তার থেকে সাহিত্যিক চৌর্য প্রতিরোধ করতেই ১৯৫৭ সালে কপিরাইট আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত মূল রচনাটিকে সংরক্ষণ করা তথ্য রচনা যথাযোগ্য মূল্য নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়তঃ রচনাটির সমপ্রসারণের প্রয়োজনে আইনে অনাবশ্যক কঠিন বর্জন করা হয়েছে। কপিরাইট এমন এক অধিকার যা যে কোনো ব্যক্তি বা বৌদ্ধিক পরিশ্রমের ফলে অর্জন করেন। তাই কপিরাইট আইনের প্রথম লক্ষ্য হলো যাতে অন্য কোনো ব্যক্তির সেই পরিশ্রমের সুফল অনভিপ্রেত এভাবে ভোগ না করে। এই আইন অনুসারে কপিরাইটের অধিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে এককভাবে অধিকার থাকবে:

ক. যেকোন ক্ষেত্রে রচনা বা সৃষ্টির পুনর প্রকাশ

খ. রচনাটির পুনর্মুদ্রণ

গ. সৃষ্টি টিকে জনসমক্ষে প্রদর্শন

ঘ. সৃষ্টি বা রচনা প্রযোজনা প্রকাশ এবং অনুবাদ।

আন্তর্জাতিক কপিরাইট অনুসারে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৫০ বছর কপিরাইট বলবৎ থাকে। শুধুমাত্র প্রকাশিত রচনা ক্ষেত্রেই নয় অপ্রকাশিত রচনা ক্ষেত্র কপিরাইট আইন যুক্ত হতে পারে। ১৯১১ সালে ইংল্যান্ড এই আইন চালু হয়। ভারতীয় ধারা ১৩(১) অনুযায়ী কোন সাহিত্য-শিল্প নাটক বা সঙ্গীতধর্মী কোন মৌলিক সৃষ্টির অপ্রকাশিত হলেও তা কপিরাইটের আওতায় পড়বে। ১৯৮৪ সালের কপিরাইট আইনের সংশোধনীর পর থেকে অপ্রকাশিত রচনা অনুবাদ এবং সৃষ্টির প্রকাশের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। কপিরাইট আইন ভঙ্গ কারীকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা বা উভয় শাস্তি হিসেবে ধার্য করা হতে পারে।

৩.৩.৪ ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন

ট্রেডমার্ক (বাণিজ্য চিহ্ন) আইন কার্যকর করার আগে ট্রেডমার্কগুলি ডাকা হত সাধারণ আইন। কোনও বিধিবদ্ধ আইন না থাকায় সেটা নিবন্ধভুক্ত হতে পারতো না।

স্বাধীনতার আগে প্রথম বিধিবদ্ধ সুরক্ষা ভারতকে ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৪০-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল এই আইনটি ইংল্যান্ডের ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর উপর ভিত্তি করে ছিল। ১৯৪০ সাল থেকে ব্যবসায়ের এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। স্বাধীনতার পরে, জাস্টিস এ.এন. রাজগোপাল আয়ঙ্গার, বাণিজ্য ও মার্চেন্ডাইজ মার্কস অ্যাক্ট ১৯৫৮ সালে পাস করেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিনিয়োগ প্রবাহ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, একটি বিস্তৃত আইনের দরকার ছিল, সুতরাং ১৯৯৯ সালে ট্রেডমার্কস আইনটি পাস হয়েছিল, যা কার্যকর হয়েছিল ১৫, ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ থেকে। এই আইনটি বাণিজ্য ও মার্চেন্ডাইজ মার্কস অ্যাক্ট ১৯৫৮ কে বাতিল করলো।

একটি বাণিজ্য চিহ্ন হ''ল শব্দ, ডিভাইস বা ব্যবসায়ের নিবন্ধগুলিতে প্রয়োগ করা লেবেলের আকারে একটি ভিজ্যুয়াল প্রতীক যা ক্রয় জনসাধারণের কাছে বোঝানোর জন্য যে তারা হ''ল পণ্য বা অন্যথায় অনুরূপ জিনিস থেকে পৃথক করতে সক্ষম।

ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট, ১৯৯৯ এর ধারা ২ (খ) এ ট্র্যাড মার্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে, গ্রাফিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম এমন একটি চিহ্ন এবং যা অন্যের থেকে একজন ব্যক্তির পণ্য বা পরিষেবা পৃথক করতে সক্ষম।

বিভাগ ২ (এম) মার্ককে ডিভাইস, ব্র্যান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকিট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, চিঠি, সংখ্যা, পণ্য আকার, প্যাকেজিং বা সংমিশ্রণ রঙ বা এর কোনও সংমিশ্রণ।

ট্রেড মার্কের মেয়াদ

বাণিজ্য চিহ্নের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর চিরজীবন। যদিও প্রথমদিকে ট্রেডমার্কটি ১০ বছরের জন্য নিবন্ধিত রয়েছে, তবে এটি পর্যায়ক্রমে পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি না এটি নিবন্ধ থেকে সরিয়ে না দেওয়া হয় বা আদালতের আদেশে নিষিদ্ধ করা হয়।

ভারতের ট্রেড মার্ক আইনগুলি ১৯৯৯ ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং ২০০২ এবং ২০১৭ এর ট্রেড মার্কস বিধি দ্বারা গঠিত।

ওয়ারেন্ট ছাড়াই নকল বলে সন্দেহ করা জিনিসপত্র আটক করার ক্ষমতা এবং বাণিজ্য জালিয়াতি আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে পুলিশকে এখন আরও শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে। তবে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়ার আগে এই চিহ্নটি নিবন্ধের বিষয়ে পুলিশকে ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রারের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা প্ররোচিত করেছে।

-যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অধিকারের মালিকদের ট্রেড চিহ্ন হিসাবে ভারতে তাদের ডোমেনের নামগুলি নিবন্ধভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিবন্ধকরণে দুই বছর সময় লাগে।

ভারতে একটি ট্রেড মার্ক দশ বছরের জন্য বৈধ এবং এটি আরও দশ বছরের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে।

পেটেন্ট

১৯৭০ সালের ভারতের পেটেন্টস অ্যাক্ট, ২০০৩ পেটেন্ট বিধি এবং ২০১৬ সালের পেটেন্ট সংশোধনী বিধিগুলি পেটেন্ট সম্পর্কিত আইন নির্ধারণ করে। ইউকে হিসাবে, ইউটিলিটি মডেল পেটেন্টগুলির জন্য কোনও বিধান নেই। পেটেন্টগুলির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হ''ল পেটেন্টস, ডিজাইনস এবং ট্রেড মার্কস নিয়ন্ত্রক অফিসারের অধীনে পেটেন্ট রেজিস্ট্রার, যা ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অংশ। পেটেন্টগুলি বার্ষিক পুনর্নবীকরণ ফি সাপেক্ষে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে ২০ বছরের জন্য বৈধ। ভারতের পেটেন্ট আইন 'প্রথমে ফাইল করা' নীতির অধীনে কাজ করে - অর্থাৎ, যদি দু''জন লোক কোনও অভিন্ন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্টের জন্য আবেদন করে, তবে আবেদন করার জন্য প্রথমটি পেটেন্ট হিসাবে ভূষিত হবে।

ডিজাইন

আইন পরিচালনার আইনগুলি হ''ল ডিজাইন আইন ২০০০ এবং ডিজাইনস বিধি ২০০১. ডিজাইনগুলি সর্বোচ্চ দশ বছরের জন্য বৈধ, আরও পাঁচ বছরের জন্য নবায়নযোগ্য।

৩.৩.৫ তথ্য অধিকার আইন ২০০৫-

সংসদের দ্বারা গৃহীত এটি একটি আইন, যাতে নাগরিকগণ লোক-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা তথ্য যাতে সহজে লাভ করতে পারে তারবাবে ব্যবহারিক পদ্ধতি এটা প্রবর্তন করা হয়েছে। এই আইনটি জম্মু এবং কাশ্মীর বাদে ভারতের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে প্রযোজ্য। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত জম্মু এবং কাশ্মীরের ''জম্মু এবং কাশ্মীর তথ্য জানার অধিকার, ২০০৯'' শীর্ষক একটি নিজ আইন আছে। এই আইনের অধীনে নাগরিকগণ লোক-কর্তৃপক্ষর (সহজ অর্থে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, সরকারী পুঁজি লাভ করা বেসরকারী সংস্থা আদির) নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা তথ্য নির্দিষ্ট মাসুলের বিনিময়ে জানতে পারে। এই আইনটি ২০০৫ সালের ১৫ জুন সংসদে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই বছরে ১৩ অক্টোবর থেকে পূর্ণ কার্যকরী হয়েছিল।

তথ্য জানার অধিকার আইন কেন?

ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদ দেশের প্রত্যেকটি *নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে*। তথ্য জানার অধিকারও এই ধারার মধ্যে পড়ে বলে সুপ্রিম কোর্ট মনে করে। একে বাস্তবে প্রয়োগ করতে তৈরি হয় তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই) ২০০৫। এই অধিকার দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে নাগরিকদের হাত শক্ত করে। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা তৈরি করে দেয়। সমস্ত সরকারি তথ্যকে যাচাই করে তাঁরা জানতে পারেন, যাদের ভোট দিয়ে সরকারে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা। আরটিআইকে হাতিয়ার করে দেশের এক জন নাগরিক দর্শক থেকে প্রশাসন প্রক্রিয়ায় এক জন সংক্রিয় অংশগ্রহণকারী হতে পারেন। এই আইন বলে এক জন নাগরিক দেশের সমস্ত সরকারি দফতরের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শুধু জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া সারা দেশেই এই আইন প্রযোজ্য।

তথ্য কিভাবে যাচাই করা যায়?

তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫এর অধীনে প্রত্যেকটি সরকারী কার্যালয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠানে একজন 'লোক তথ্য কর্মী' নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রদানের কাজ-কর্ম এই বিষয়ক কর্মী দেখাশুনা করেন। নাগরিকের যেকোনো তথ্য যাচাইয়ের জন্য ''লোক তথ্য কর্মী''র কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা ৩০দিন। অবশ্য আবেদনের বিষয় যদি কোনো ব্যক্তির জীবন বা স্বত্ব সম্পর্কীত হয়, তবে তথ্য ৪৮ঘণ্টার ভিতর যোগান দিতে হয়।

যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর 'লোক তথ্য কর্মী' আবেদনকারীর অনুরোধ রক্ষা না করে বা 'লোক তথ্য কর্মী' ভুল তথ্য দিয়ে বা তথ্য যোগান বাবদ হওয়া খরচের হিসাবের ক্ষেত্রে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না হয়, তবে এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে।

তথ্য সংগ্রহের সুযোগ :

তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫-এর সেকশন ২(জে)-এ তথ্যের অধিকার মানে সমস্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি কর্তৃপক্ষের (পাবলিক অথরিটি) তথ্য জানার অধিকার। এর মধ্যে পড়ছে:

- কাজ, তথ্য এবং রেকর্ডস দেখার অধিকার। (তথ্য কী ? -রেকর্ড, নথি, মেমো, ই-মেল, মতামত,পরামর্শ,প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞপ্তি,নির্দেশ,লগবুক,চুক্তি,রিপর্টে,দলিল-দস্তাবেজ,নমুনা,মডেল,তথ্য যেগুলি ইলেকট্রনিক মোডে ধরা আছে, আপাত বলবৎ কোনও আইনে পাবলিক অথরিটির নেওয়া কোনও বেসরকারি সংস্থার তথ্য)

- প্রত্যায়িত নমুনা গ্রহণ
- ফ্লপি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা প্রিন্ট আউট করে কমপিউটারে রাখা তথ্য সংগ্রহণ করা যাবে।

কোন তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় ?

এক জন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেওয়া হবে না যদি তিনি তথ্য আধিকারিককে বোঝাতে সক্ষম না হন যে, প্রকাশিত তথ্য জনস্বার্থে কাজে লাগবে (এ ক্ষেত্রে আংশিক তথ্য দেওয়া যেতে পারে যার মধ্যে অপ্রকাশযোগ্য কোনও তথ্য থাকবে না)

- দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয় এমন তথ্য, যে তথ্য প্রকাশ করলে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটে, অপরাধের উস্কানিতে সাহায্য করে, দেশের অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, সেই ধরনের কোনও তথ্য
- আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোনও তথ্য বা এমন তথ্য যা প্রকাশ করলে আদালতের অবমাননা হবে
- সংসদ বা রাজ্য বিধানসভার অধিকার ভঙ্গ হতে পারে এমন কোনও তথ্য
- বাণিজ্যিক গোপন বিষয়, ব্যবসায়িক গোপন কৌশল বা বুদ্ধিগত সম্পত্তি যার প্রকাশ তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ক্ষতি করবে, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন
- কোনও ব্যক্তির আস্থাভাজন সম্পর্ক সূত্রে পাওয়া তথ্য, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন
- বিদেশি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গোপন তথ্য
- এমন কোনও তথ্য যা প্রকাশ করলে কোনও ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে দেওয়া কোনও সূত্র বা তথ্য
- যে তথ্য প্রকাশের ফলে অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান, গ্রেফতারি বা মামলা রুজু করা বিঘ্নিত হবে
- মন্ত্রিপরিষদ, সচিব ও অন্য আধিকারিকদের আলোচনার নথিসহ মন্ত্রিসভার কাগজপত্র
- ব্যক্তিগত তথ্য, যার সঙ্গে জনসাধারণের কার্যকলাপ বা আগ্রহের কোনও সম্পর্ক নেই বা ব্যক্তির গোপনীয়তায় অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন।

কি ভাবে এই আইন প্রয়োগ করবো ?

যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক তথ্যের অধিকার আইনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

✂ তথ্যের জন্য আবেদন :-

আপনি হাতে লিখে বা টাইপ করে যে কোনও পাবলিক অথরিটির (সরকারি প্রতিষ্ঠান বা অনুদান প্রাপ্ত) কাছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৫-এর অধীনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সাইট থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন।

হিন্দি, ইংরিজি অথবা স্থানীয় ভাষায় আবেদন করতে পারেন।

আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে :

১. অ্যাসিট্যান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (সংক্ষেপে এপিআইও)/পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (পিআইও)-র নাম ও ঠিকানা

২. বিষয়: তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এ ৬(১) ধারা অনুসারে আবেদন

৩. কোন বিষয়ে তথ্য চাইছেন

৪. আবদেনকারীর নাম

৫. বাবা/স্বামীর নাম

৬. এসসি/এসটি/ওবিসি

৭. আবেদনপত্রের ফি

৮. বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবার-হ্যাঁ/না

৯. ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেল (ই-মেল এবং মোবাইল নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়)

১০. স্থান এবং তারিখ

১১. আবেদনকারীর স্বাক্ষর

১২. আবেদনের সঙ্গে অন্য যে কাগজ দেওয়া হয়েছে তার তালিকা

৩.৩.৬ হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

হুই ব্লুয়ার বিল হিসাবে সাধারণত পরিচিত, এটি কোনও সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির বা ইচ্ছাকৃত ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগগুলি নথিভুক্ত করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। বিলটি অভিযোগকারী ব্যক্তিকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার ব্যবস্থাও করে।

হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন বিল (২০১১)

বিলের হাইলাইটস

- বিল হুইসেল ব্লোয়ারদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, অর্থাতকোনও সরকারী কর্মচারীর দ্বারা দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কিত কোন কাজ সম্পর্কিত কোনও জনস্বার্থ প্রকাশ করা ব্যক্তি।
- যে কোনও সরকারী কর্মচারী বা বেসরকারী সংস্থা সহ অন্য কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য নজরদারী কমিশনকে এ জাতীয় প্রকাশ করতে পারেন।
- প্রতিটি অভিযোগে অভিযোগকারীর পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।
- ভিজিলেন্স কমিশন অভিযোগকারী যদি প্রয়োজনীয় মনে করেন তবে বিভাগের প্রধান ব্যতীত অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ করবেন না। বিলে অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশকারী যে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

বিলটি জেনেশুনে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়ার জন্য জরিমানার বিধান দিয়েছে।

৩.৩.৭ সারাংশ

জাতীয় অধিকারগুলি আইপি-র স্রষ্টাদের দেওয়া সুরক্ষা এবং এতে ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্টস, শিল্প নকশা এবং কিছু এখতিয়ারে বাণিজ্য গোপনীয়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংগীত এবং সাহিত্য এবং নকশা ইত্যাদি সহ শৈল্পিক কাজগুলি সমস্ত বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসাবে সুরক্ষিত হতে পারে। তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ ২০০৫ সালের ১৫ জুন সংসদে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই বছরে ১৩ অক্টোবর থেকে পূর্ণ কার্যকরী হয়েছিল। হুইস্ল ব্লুয়ার বিল হিসাবে সাধারণত পরিচিত, এটি কোনও সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির বা ইচ্ছাকৃত ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের অভিযোগে অভিযোগগুলি নথিভুক্ত করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

৩.৩.৮ অনুশীলনী

১. বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার দ্বারা আপনি কী বোঝেন?

২. কপিরাইট আইন সংজ্ঞায়িত করুন।

৩. তথ্য অধিকার আইন ২০০৫ বিস্তৃত করুন।

৩.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

- S. Kundra : Media Laws and Indian Constitution
- Jan R. Hakemulder, Fay A.C. de Jonge, P. P. Singh : Media, Ethics and Laws
- Durga Das Basu : Law of the Press
- Sama, Dr. Umar(2007) Law of Electronic Media. New Delhi : Deep & Deep Publications Pvt. Ltd.

একক ৪ ❐ সিনেমাটোগ্রাফ আইন ১৯৫৩ - প্রসার ভারতী আইন - বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির বিধি - কেবল টিভি রেগুলেশন আইন - ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন - কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি - ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি - আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড - বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ সিনেমাটোগ্রাফ আইন ১৯৫৩

৩.৪.৪ প্রসার ভারতী আইন -

৩.৪.৫ কেবল টিভি রেগুলেশন আইন

৩.৪.৬ ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন -

৩.৪.৬.১ কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি

৩.৪.৬.২ ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি

৩.৪.৭ আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড

৩.৪.৮ বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

৩.৪.৯ সারাংশ

৩.৪.১০ অনুশীলনী

৩.৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- সিনেমাটোগ্রাফ আইন ১৯৫৩
- প্রসার ভারতী আইন -

- কেবল টিভি রেগুলেশন আইন
- কেবল টিভি রেগুলেশন আইন
- ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন -কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি-ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি-
- আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড
- বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

এই সংকলনটি বিদ্যমান আইনী কাঠামো যা ভারতে বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্প্রচার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করে। অষ্টম ভারতের সংবিধানের তফসিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে বৈদ্যুতিন মিডিয়াতে আইন করার ক্ষমতা দেয়। আসুন আমরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন দেখি।

৩.৪.৩ সিনেমাটোগ্রাফ আইন ১৯৫৩

সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের শংসাপত্রের জন্য এবং সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য এই আইনটি কার্যকর করা হয়েছিল। এই আইনের সমগ্র ভারত জুড়ে জ্জ, জ্জজ্জ এবং জ্জঝঅংশগুলি বিস্তৃত হয়েছে এবং সমগ্র তৃতীয় খণ্ড কেবলমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত। এই বিশেষ আইনে কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

- "প্রাপ্তবয়স্ক" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি তার আঠারো বছর পূর্ণ করেছেন

; - "বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড

- "শংসাপত্র" অর্থ বোর্ডের অধীনে প্রদত্ত শংসাপত্র

"সিনেমাটোগ্রাফ" মুভিং ছবি বা সিরিজের ছবির উপস্থাপনের জন্য কোনও যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত করে;

"জেলা ম্যাজিস্ট্রেট", রাষ্ট্রপতি-শহরের সাথে সম্পর্কিত, অর্থ পুলিশ কমিশনার;

- "ফিল্ম" অর্থ একটি সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্ম

- "স্থান" এর মধ্যে একটি বাড়ি, বিল্ডিং, তাঁবু এবং পরিবহনের যে কোনও বর্ণনা সমুদ্র, স্থল বা বায়ু দ্বারা অন্তর্ভুক্ত;

- "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (ছ)

৪ - "আঞ্চলিক কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ৫ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং এতে একটি অতিরিক্ত আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং একজন সহকারী আঞ্চলিক কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; - "

ট্রাইব্যুনাল "অর্থ ধারা 5D এর অধীন গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনাল]

আইনটি ফিল্ম শংসাপত্রের কেন্দ্রীয় বোর্ড নামে পরিচিত একটি বোর্ড গঠনের বিধান রাখে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্য ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করবে। বোর্ডের কাছ থেকে শংসাপত্র গ্রহণের জন্য, যে কোনও ব্যক্তি তার / তার চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য দেখতে চান তাকে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কাছে নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।

বোর্ড যথাযথভাবে ফিল্মটি পরীক্ষা করার পরে - (i) অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ্য প্রদর্শনীর জন্য ফিল্মকে অনুমোদন দেবে (ii) প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রকাশ্য প্রদর্শনীর জন্য ফিল্মটি অ্যাকশন; (iii) আবেদনকারীকে ফিল্মে প্রকাশ্য প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র অনুমোদনের আগে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে যেমন ফিল্মে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা পরিবর্তনগুলি পরিচালনা করতে নির্দেশ দিন, বা (iv) পাবলিক প্রদর্শনীর জন্য ছবিটি অনুমোদন করতে অস্বীকার করবেন। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনটির নয়টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে যার একটি করে মুম্বাই (সদর দফতর), কলকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু, তিরুবনন্তপুরম, হায়দরাবাদ, নয়াদিল্লি, কটক এবং গুয়াহাটি রয়েছে। আঞ্চলিক অফিসগুলি উপদেষ্টা প্যানেল দ্বারা চলচ্চিত্র পরীক্ষাতে সহায়তা করে। প্যানেলগুলির সদস্যরা ২ বছর মেয়াদে বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত করে। ফিল্মগুলি সাধারণত ৪ টি বিভাগের আওতায় অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে, শংসাপত্রের মাত্র দুটি বিভাগ ছিল - "ইউ" (সীমাবদ্ধ পাবলিক প্রদর্শনী) এবং "এ" (প্রাপ্ত বয়স্ক দর্শকদের কাছে সীমাবদ্ধ)। ১৯৮৩ সালের জুনে আরও দুটি বিভাগ যুক্ত করা হয়েছিল - "ইউ / এ" (বারো বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য পিতামাতার দিকনির্দেশনার অধীনে সীমিতভাবে প্রকাশ্য প্রদর্শনী) এবং "এস" (বিশেষত শ্রোতাদের যেমন চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ)। বিভাগের ৫ সি এর অধীন বোর্ডের যে কোনও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন। ট্রাইব্যুনালের প্রধান কার্যালয় নয়াদিল্লিতে থাকবেন এবং এতে চেয়ারম্যান থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য চার সদস্যের বেশি নয়।

৩.৪.৪ প্রসার ভারতী আইন

১৯৯০ সালের প্রসার ভারতী (ব্রডকাস্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) আইনের দু'টি উদ্দেশ্য আইনের ধারা ১২ তে স্ফটিকযুক্ত। ধারা ১২ (৩) (ক) আদেশ দিয়েছে যে প্রসার ভারতী নিশ্চিত করে যে "সম্প্রচারটি জনসেবা হিসাবে পরিচালিত হয়।" আবার, ধারা ১২ (৩) (খ) আরও জোর দেয় যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রচার নয়, সংবাদ সংগ্রহ করা। এই আইনটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সংগ্রামের কয়েক দশক পরে সরকারের হস্তক্ষেপের থেকে মুক্ত সম্প্রচারের জন্য অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল। আইনটির আইনী উদ্দেশ্য সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৫ সালের রায়তে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক বনাম বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিধ্বনি খুঁজে বের করে, যা বলেছিল যে "সম্প্রচারের স্বাধীনতার প্রথম দিকটি রাষ্ট্র বা সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, বিশেষত সরকার কর্তৃক সেন্সরশিপ থেকে ... পাবলিক সম্প্রচারকে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারের সমান করা যায় না।" প্রসার ভারতী কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য "জনসাধারণকে শিক্ষিত ও বিনোদন দেওয়ার জন্য" দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর স্বায়ত্তশাসন সরবরাহ করা।

The twin objectives of the Prasar Bharati (Broadcast Corporation of India) Act of 1990 are crystallized in Section 12 of the law. Section 12 (3)(a) mandates that Prasar Bharati ensure that ''broadcasting is conducted as a public service.'' Again, Section 12 (3)(b) reinforces that the purpose of establishing the corporation is to

gather news, not propaganda. The Act came into existence after decades of post-independence struggle to free broadcasting from the stranglehold of the government. The legislative intent of the Act finds an echo in the Supreme Court's 1995 judgment in The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting versus the Cricket Association of Bengal, which said the ''first facet of the broadcasting freedom is freedom from state or governmental control, in particular from the censorship by the government... Public broadcasting is not to be equated with state broadcasting. Both are distinct.'' The Prasar Bharati Corporation's main objective is to provide autonomy to Doordarshan and Akashvani in order to ''educate and entertain the public.''

৩.৪.৫ কেবিল টিভি নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯৫

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতবর্ষে কেবিল টিভির আবির্ভাব প্রথমদিকে ভারতীয় কেবল মূলত ভিডিও ভিত্তিক থাকলেও নয়ের দশকের গোড়া থেকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুণগতভাবে উত্তোলিত হয়। সেই সময় থেকেই এই সম্প্রচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারি চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত। স্পষ্টত বোঝা যায় কেবল টিভির মাধ্যমে বিদেশে স্যাটেলাইটের সম্প্রসারিত অনুষ্ঠান দেশীয় আইনের পরিধি সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাই ছিল এই সময়ের আলোচনার মূল সূত্র। পরবর্তী ক্ষেত্রে কেবল টিভির উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ এই বিষয়টিকে আইনের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় আরো বাড়িয়ে তোলে। ১৯৯৩ সালের তেসরা আগস্ট কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক রেগুলেশন বিল ১৯৯৩ রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। কিন্তু বিলটি পাস করানো যায়নি ১৯৯৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স জারি করে পরে তা সংসদে পেশ করিয়ে নেওয়া হয় ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে।

এই আইনের ফলে সমস্ত ক্যাবল অপারেটর কে তাদের নাম অনুষ্ঠান কোড বিজ্ঞাপন কোড নথিভুক্ত করতে হয়। তাদের এ সংক্রান্ত একটি রেজিস্টর ব্যবহার করতে হয়। বিদেশি চ্যানেলগুলো সম্প্রচারের পাশাপাশি দূরদর্শন এর দুটি চ্যানেল প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়। এছাড়াও কেবিল টিভি ব্যবসায় ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার বিদেশি মালিকানায় রাখার সুযোগ এই আইনে দেওয়া হয়েছে। অতিসম্প্রতি ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কেবল টিভি আইনের নতুন সংশোধনী এনেছে। এর ফলে গ্রাহকদের পছন্দমত চ্যানেল দেখার ব্যবস্থা করা কেবল অপারেটরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩.৪.৬ ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন

ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতি নির্দেশিকা

ভূমিকা

২০০২ সালের ডিসেম্বরে, ভারত সরকার আইআইটি / আইআইএম সহ সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদানের নীতি অনুমোদন করে।

বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ও সামাজিক সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য সরকার এখন ''অলাভজনক'' সংস্থা যেমন সুশীল সমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহকে তার আওতায় আনার মাধ্যমে নীতি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিস্তারিত নীতি নির্দেশিকা এই বিষয়ে নীচে দেওয়া হল:

মৌলিক নীতি

একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন (সিআরএস) পরিচালনা করতে ইচ্ছুক একটি সংস্থা

নিম্নলিখিত নীতিগুলি সন্তুষ্ট করতে এবং মেনে চলতে সক্ষম হতে হবে:

ক) এটি স্পষ্টভাবে একটি ''অলাভজনক'' সংস্থা হিসাবে গঠন করা উচিত এবং হওয়া উচিত। স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে কমপক্ষে তিন বছরের পরিষেবা দেওয়ার প্রমাণিত রেকর্ড রয়েছে।

খ) এটি দ্বারা পরিচালিত সিআরএস নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ডিজাইন করা উচিত।

গ) এটির একটি মালিকানা এবং পরিচালনা কাঠামো থাকা উচিত যা সিআরএস পরিবেশন করতে চায় এমন কমিউনিটির প্রতিচ্ছবি।

ঘ) কমিউনিটির জন্য প্রোগ্রামগুলি শিক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত, সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন।

ঙ) এটি অবশ্যই একটি আইনী সত্তা হতে হবে অর্থাৎ এটি নিবন্ধিত হওয়া উচিত (সমিতি আইনের নিবন্ধনের অধীনে বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্য কোনও আইন)।

৩.৪.৬.১ কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি

নিম্নলিখিত ধরণের সংস্থাগুলি কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্সর জন্য আবেদনের যোগ্য হবে:

ক) সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থাগুলি, যা অনুচ্ছেদ ১ এ তালিকাভুক্ত মৌলিক নীতিগুলি পূরণ করে উপরে। এর মধ্যে নাগরিক সমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (এসএইউ), আইসিএআর প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নিবন্ধিত সমিতি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং পাবলিক ট্রাস্টস সোসাইটিস আইনের অধীনে নিবন্ধিত বা এই জাতীয় অন্য কোনো আইন যা এই কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক। আবেদনের সময় নিবন্ধন কমপক্ষে তিন বছরের হতে হবে।

খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নিম্নলিখিতগুলি কোনও সিআরএস চালানোর জন্য যোগ্য হবে না:

ক) ব্যক্তি;

খ) রাজনৈতিক দল এবং তাদের অনুমোদিত সংস্থা; ওছাত্র, মহিলা সহ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং এই দলগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অন্যান্য শাখাগুলিগ্নগ্ন

গ) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংস্থা;

ঘ) সংস্থা এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলি।

অ্যাপ্লিকেশনগুলির বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ

(ক) কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতি বছর একবার আই ও বি মন্ত্রক দ্বারা আবেদন করা হবে।তবে যোগ্য সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে মধ্যবর্তী সময়কালে আবেদন করতে পারে।। আবেদনকারীদের নির্ধারিত আবেদন ফর্মে আবেদন করতে হবে প্রসেসিং ফি সহ ২৫,০০০ / - টাকা এবং আবেদনগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া করা হবে:

i. বিশ্ববিদ্যালয়, ডিমেড বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার পরিচালিত শিক্ষাগত

অনুমোদনের জন্য সচিব (আইএন্ডবি) এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সামনে মামলাগুলি স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানগুলি একক উইন্ডো ছাড়পত্র পাবে। এমএইচএ এবং এমএইচআরডি থেকে পৃথক ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না।

ii. বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সকল আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এলওআই স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা ও এইচআরডি (বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ এবং যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রকের ডব্লিউপিসি শাখার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ সাপেক্ষে জারি করা হবে।

নীচের মতো ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সময়সূচী নির্ধারিত হইবে :

i. নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে, আই অ্যান্ড বি মন্ত্রনালয় আবেদনটি প্রক্রিয়া করবে এবং আবেদনকারীর ঘাটতিগুলি যদি হয় তা জানিয়ে দেয়া হবে আবেদনকারীদের। অনুচ্ছেদ ৩ (a)(i) (আই) এবং ৩ (a) (ii) এর বিধি অনুসারে ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের অনুলিপি অন্যান্য মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করবে।

ii. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলি আবেদন পাওয়ার পরে তিন মাসের মধ্যে তাদের ছাড়পত্রের কথা জানাবে। তবে, তিন মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, মামলাটি এলওআইয়ের ইস্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সচিবের (আইএন্ডবি) সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির কাছে প্রেরণ করা হবে।

iii. স্থানে একক ফ্রিকোয়েন্সি জন্য একাধিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, সফল আবেদনকারী তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে সচিবের (আইঅ্যান্ডবি) সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি দ্বারা আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে এলওআই জারির জন্য নির্বাচিত হবে।

iv. চিঠিপত্রের ইস্যু (এলওআই) ইস্যু হওয়ার এক মাসের মধ্যেই যোগ্য।

আবেদনকারীকে নির্ধারিত বিন্যাসে এবং প্রয়োজনীয় ফি সহ, ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও স্যাকফএ ছাড়পত্রের জন্য যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়, সঞ্চারভবন, নয়াদিল্লির ডব্লিউপিসি শাখায় আবেদন করতে হবে।

v. আবেদনের তারিখ থেকে ছয় মাসের সময়সীমা সাফফা ছাড়পত্র জারির জন্য নির্ধারিত হয়। ছয় মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ জাতীয় ছাড়পত্র না পাওয়ার ক্ষেত্রে মামলাটি সিদ্ধান্তের জন্য সচিবের (আইএন্ডবি) সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।

vi. স্যাকফা ছাড়পত্র পাওয়ার পরে (যার একটি অনুলিপি আবেদনকারীর মাধ্যমে জমা দেওয়া হবে), এলওআইয়ের ধারক নির্ধারিত ফরমেটে ২৫,০০০ / - টাকার বিনিময়ে একটি ব্যাংক গ্যারান্টি সরবরাহ করবেন। এরপরে, এলওআইয়ের ধারককে আই ও বি মন্ত্রণালয়ের একটি অনুদান চুক্তির (জিওপিএ) স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ

জানানো হবে, যা তাকে যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রকের ডব্লিউপিসি উইং থেকে ওয়্যারলেস অপারেটিং লাইসেন্স (ডাব্লুএল) সন্ধান করতে সক্ষম করবে। যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ডাব্লুএলএল প্রাপ্তির পরেই কমিউনিটি রেডিও স্টেশনটি চালু করা যেতে পারে।

vii. সমস্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে অর্থাতজিওপিএ-তে স্বাক্ষর করার পরে অনুমতিধারীরা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করবেন এবং আই ও বি মন্ত্রণালয়ে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন চালু করার তারিখটি ঘনিষ্ঠ করবেন।

viii. উপরে উল্লিখিত সময়সূচী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে এলওআই / জিওপিএ ধারক এর এলওআই / জিওপিএ বাতিল করার জন্য এবং ব্যাংক গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ।

৩.৪.৬.২ ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি

অনুমতি চুক্তির শর্তাদি মঞ্জুরি

i. অনুমতি অনুদান চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য হবে।

ii. অনুমতি চুক্তির অনুদান এবং অনুমতিপত্রটি হস্তান্তরযোগ্য নয়।

iii. অনুমতিধারীর উপর কোনও অনুমতি ফি নেওয়া হবে না। তবে

অনুমতি ধারককে ডাব্লুপিসিতে বর্ণালী ব্যবহারের জন্য ফি প্রদান করতে হবে, যা যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রকের শাখা।

iv. অনুমতি ধারক সমস্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে তার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু না করে বা অপারেশন শুরুর পরে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, তবে তার অনুমতি বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ এবং পরবর্তী যোগ্য প্রার্থীদের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ করা হবে।

v. একজন আবেদনকারী / সংস্থাকে এক বা একাধিক জায়গায় সিআরএস অপেরেশনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

vi. এলওআইয়ের ধারক কেবল অনুমতি চুক্তির সময়মত কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কেবল ২৫,০০০ / - (পঁচিশ হাজার টাকা) এর জন্য একটি গ্যারান্টি সরবরাহ করবেন।

vii. অনুমতিধারক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশন পরিষেবাতে ব্যর্থ হন তবে তিনি সরকারকে ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং সরকার তাকে প্রদত্ত অনুমতি বাতিল করতে পারবেন।

সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষণ

i) প্রোগ্রামগুলি সম্প্রদায়ের সাথে তাতণিক প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত। দ্য উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষামূলক, পরিবেশগত, সামাজিক কল্যাণ, সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামিং বিশেষ আগ্রহ এবং প্রয়োজন প্রতিফলিত করা উচিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের।

ii) স্থানীয়দের অংশগ্রহণে কমপক্ষে ৫০% সামগ্রী তৈরি করা হবে। সম্প্রদায়, যার জন্য স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

iii) প্রোগ্রামগুলি স্থানীয় ভাষা এবং উপভাষায় হওয়া উচিত।

iv) অনুমতিধারাকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর জন্য নির্ধারিত প্রোগ্রাম এবং বিজ্ঞাপন কোড বিধানাবলী মেনে চলতে হবে।

v) অনুমতিধারক সিআরএস দ্বারা প্রচারিত সমস্ত প্রোগ্রাম সম্প্রচারের তারিখ থেকে তিন মাস সংরক্ষণ করবে।

vi) অনুমতিধারক কোনও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবেন না, যা সংবাদ এবং বর্তমান বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যথায় রাজনৈতিক প্রকৃতির।

vii) অনুমতিধারক অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে এতে কোন কিছুই অন্তর্ভুক্ত নেই

প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত যা:

ক। ভাল স্বাদ বা শালীনতা বিরুদ্ধে আপত্তি;

খ। বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির সমালোচনা রয়েছে;

গ। ধর্ম বা সম্প্রদায় বা ভিজ্যুয়াল বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির অবমাননাকর শব্দগুলির উপর আক্রমণ রয়েছে বা যা সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বা অশোভন প্রচার করে বা ফল দেয়;

ঘ। অশ্লীল, মানহানি, ইচ্ছাকৃত, মিথ্যা এবং পরামর্শমূলক সহজাত এবং অর্ধেক সত্য থাকে;

ঙ। সহিংসতা উতাহিত বা উদ্দীপ্ত হতে পারে বা এর বিরুদ্ধে কিছু রয়েছে যা আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ বা যা দেশবিরোধী মনোভাব প্রচার করে;

চ। আদালত অবমাননার পরিমাণ বা জাতির অখণ্ডতা প্রভাবিত করে এমন কিছু রয়েছে;

ছ। রাষ্ট্রপতি / ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিচার বিভাগের মর্যাদার বিরুদ্ধে বিচক্ষণতা রয়েছে;

জ। ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, দেশের সামাজিক, পাবলিক এবং নৈতিক জীবনের বিভাগগুলিতে যে কোনও ব্যক্তিকে সমালোচনা, অপব্যবহার বা অপবাদ দেয়; কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসকে উত্সাহ দেয়;

ঞ। মহিলাদের অবমাননা;

ট। বাচ্চাদের অবমাননা করে

ঠ। অ্যালকোহল, মাদক ও তামাক সহ ওষুধের ব্যবহারকে উপস্থাপিত / চিত্রিত / পরামর্শ দিতে পারে বা জাতি, জাতীয়তা, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌনতার ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা বা উদ্দীপনা বা জালিয়াতি বা চিরকালের বিদ্বেষ বা চিরকুটকে ঘৃণা করতে পারে পছন্দ, ধর্ম, বয়স বা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা।

viii) অনুমতিধারক অবশ্যই ধর্মীয় কর্মসূচির প্রতি যথাযথ যত্ন নেবেন এবং নিশ্চিত করবেন:

ক) ধর্মীয় সংবেদনশীলতার শোষণ; এবং

খ) নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অপরাধ করা।

৩.৪.৭ আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড

ব্যক্তি দ্বারা অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন তে সম্প্রচারের নিশ্চিত করবেন যে এতে কোন কিছুই অন্তর্ভুক্ত নেই

১। বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির সমালোচনা;

২। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ;

৩। অশ্লীল বা মানহীন কিছু;

৪। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা যে কোনও কিছুতে উস্কানি

৫। আদালত অবমাননার পরিমাণ যেকোনও;

৬। রাষ্ট্রপতি, গভর্নর এবং বিচার বিভাগের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।

৭। নামে রাজনৈতিক দল আক্রমণ;

৮। যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রের বিরূপ সমালোচনা;

৯। সংবিধানের প্রতি অসম্মান দেখাতে বা সহিংসতার মাধ্যমে সংবিধানের পরিবর্তনের পক্ষে হওয়া যে কোনও কিছুই; তবে সাংবিধানিক উপায়ে পরিবর্তনের পক্ষে হওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।

১০। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল ব্যতীত, বহিরাগত জরুরী সময়ে বা যদি এই জাতীয় কোনও বন্যা, ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়, তবে অর্থ ব্যয়ের জন্য আবেদন করা।

১১। কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে বা পক্ষে সরাসরি প্রচার যা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি বা সংস্থাকেই উপকৃত হতে পারে।

১২। ব্রডকাস্টগুলিতে ব্যবসায়ের নাম যা সরাসরি বিজ্ঞাপন হিসাবে পরিমাণে (বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি বাদে)।

৩.৪.৮ বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

আজ নিউজ চ্যানেলগুলি স্ব-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনই একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছে নিউজ ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। এনবিএ টেলিভিশনের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালার একটি কোড তৈরি করেছে। এনবিএর নিউজ ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি (এনবিএসএ) কে সতর্কতা, উপদেশ, সেন্সর, অস্বীকৃতি প্রকাশ এবং ব্রডকাস্টারকে ১০,০০০ টাকা অবধি জরিমানা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোড লঙ্ঘনের জন্য ১ লাখ টাকা। এরকম আরও একটি সংস্থা হ"ল ব্রডকাস্ট এডিটরস অ্যাসোসিয়েশন। বিজ্ঞাপনের স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিও বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গাইডলাইন তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীগুলি চুক্তির মাধ্যমে পরিচালনা করে এবং কোনও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা রাখে না।

৩.৪.৯ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য সম্প্রচার কোড গুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

৩.৪.১০ অনুশীলনী

১. সিনেমাটোগ্রাফ আইনটি আলোচনা করুন।

২. আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড ব্যাখ্যা করুন।

৩.৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

- S. Kundra : Media Laws and Indian Constitution
- Jan R. Hakemulder, Fay A.C. de Jonge, P. P. Singh : Media, Ethics and Laws
- Durga Das Basu : Law of the Press
- Sama, Dr. Umar(2007) Law of Electronic Media, New Delhi : Deep & Deep Publications Pvt. Ltd.

মডিউল ৩ প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক ৫ ❐ বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগ

গঠন

৩.৫.১ উদ্দেশ্য

৩.৫.২ প্রস্তাবনা

৩.৫.৩ বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণা

৩.৫.৪ বিজ্ঞাপন ও আইন

৩.৫.৫ এএসসিআই এবং এর ভূমিকা

৩.৫.৬ জনসংযোগে নীতিমালা

৩.৫.৭ সারাংশ

৩.৫.৮ অনুশীলনী

৩.৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণা
- বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
- এএসসিআই এবং এর ভূমিকা
- জনসংযোগে নীতিমালা

৩.৫.২ প্রস্তাবনা

এই একক বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণাটি প্রবর্তন করবে। বিজ্ঞাপনে নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে লোকের মতামতগুলি বিভক্ত। এটি বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এএসসিআই এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের পরিচিত করে তুলবে। এককটি জনসংযোগে নৈতিকতার প্রয়োজনীয় প্রকৃতির আমাদের পরিচিত করে তুলবে।

৩.৫.২ প্রস্তাবনা

এই একক বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণাটি প্রবর্তন করবে। বিজ্ঞাপনে নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে লোকের মতামতগুলি বিভক্ত। এটি বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এএসসিআই এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের পরিচিত করে তুলবে। এককটি জনসংযোগে নৈতিকতার প্রয়োজনীয় প্রকৃতির আমাদের পরিচিত করে তুলবে।

৩.৫.৩ বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণা

- ✓ বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের সর্বাধিক দৃশ্যমান ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি এবং এটি কোনও শূন্যস্থানে কাজ করে না।
- ✓ বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মানুষের মতামত বিভক্ত, কেউ কেউ এর প্রশংসা করেন আবার কেউ কেউ এর ভূমিকার সমালোচনা করে।
- ✓ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিগুলির সভাপতি হিসাবে জন ও 'টোল(John O' Toole) বিজ্ঞাপনটিকে অন্য কিছু বলে বর্ণনা করেছেন।
- ✓ এটি পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে এটি শিক্ষিত করে। এটি সাংবাদিক নয়, কিন্তু সমস্ত তথ্য দেয়। এবং এটি একটি বিনোদনমূলক ডিভাইস নয় বরং সকলকে বিনোদন দেয়।
- ✓ "বিজ্ঞাপনে নীতিশাস্ত্র" শব্দটি একটি বিতর্কযোগ্য বিষয়। বিষয়টি একটি বিজ্ঞাপনের সামগ্রীর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।
- ✓ বার্তা
- ✓ বিষয় প্রদর্শিত হবে।
- ✓ অতিরঞ্জিতকরণ, বিভ্রান্তিকর তথ্য সন্দেহের দিকে নিয়ে যায়।

৩.৫.৪ বিজ্ঞাপন ও আইন

আমেরিকান বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের বিজ্ঞাপন নীতিমালা-

- ➢ **সত্য**- তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করুন।
- ➢ **জমা দেওয়া** - প্রমাণ সহ দাবী সমর্থন করা (উদাঃ আইএসও শংসাপত্র ইত্যাদি)
- ➢ **তুলনা**- মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর দাবি, প্রতিযোগীর পণ্য ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন
- ➢ আমেরিকান বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের বিজ্ঞাপন নীতিমালা-
- ➢ **গ্যারান্টি এবং ওয়্যারেন্টি**- উল্লেখযোগ্য তথ্যের সাথে স্পষ্ট।

- **মূল্য দাবি**- মিথ্যা / বিভ্রান্তিকর দামের দাবি বা সঞ্চয় দাবিগুলি এড়িয়ে চলুন যা সম্ভাব্য সঞ্চয় দেয় না।
- **স্বাদ ও বিবেচনা** - বিবৃতি, চিত্র বা প্রভাবগুলি থেকে মুক্ত যা ভাল স্বাদ বা পাবলিক ভদ্রতার জন্য আপত্তিজনক।

৩.৫.৫ এএসসিআই এবং এর ভূমিকা

- ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) ক্রেতাদের স্বার্থ, সুরক্ষা নিশ্চিত করে, বিজ্ঞাপনে স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- বিজ্ঞাপনের সাথে যুক্ত সমস্ত সেক্টরের সমর্থন নিয়ে এএসসিআই গঠিত হয়েছিল, যেমন বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলি, মিডিয়া (ব্রডকাস্টারস এবং প্রেস সহ) এবং পি.আর এজেন্সিগুলি, বাজার গবেষণা সংস্থাগুলি ইত্যাদির মতো অন্যান্য।
- এর মূল উদ্দেশ্যটি বিজ্ঞাপনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে দায়বদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

এএসসিআই লক্ষ্যসমূহ :

- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে করা প্রতিনিধিত্ব ও দাবির সত্যতা নিশ্চিত করাএবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা।
- সমাজের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচিত এমন পণ্য প্রচারে বিজ্ঞাপনের নির্বিচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষা করা।
- বিজ্ঞাপনগুলি সাধারণভাবে শালীনতার মান হিসাবে আপত্তিজনক নয় তা নিশ্চিত করার জন্য।
- বিজ্ঞাপনগুলি প্রতিযোগিতায় ন্যায্যতা পর্যবেক্ষণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য যাতে বাজারের পছন্দগুলি সম্পর্কে গ্রাহককে অবহিত করা উচিত।
- সাধারণ জনগণ এবং একজন বিজ্ঞাপনদাতার ,প্রতিযোগী উভয়েরই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সুষ্ঠু, স্বচ্ছলতা ও সংজ্ঞামূলকভাবে উপস্থাপনের আশা করার সমান অধিকার রয়েছে।
- কোডটি বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং মিডিয়াতে প্রযোজ্য।
- বিজ্ঞাপনে স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কোডটি পালন করার দায়িত্ব দায়িত্বে থাকা, কমিশন তৈরি, স্থাপন বা প্রকাশ বা যে কোনও বিজ্ঞাপন তৈরি বা প্রকাশে সহায়তা করা সকলেরই দায়বদ্ধ।

৩.৫.৬ জনসংযোগে নীতিমালা

একেবারে সাধারণভাবে দেখলেও মানুষের সব কাজেরই দু'টি দিক বা ফল আছে। একটি ভালো ফল এবং অবশ্যই, অপরটিমন্দ ফল। আবার এই সব ভালো-মন্দ ফলের মধ্যেও জটিলতা আছে। কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে বা কোনো সংস্থার পক্ষে যে কাজ সুবিধাজনক, অর্থাৎ ভালো, অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, অথবা সমাজের পক্ষে সেই কাজটিই অসুবিধাজনক, ক্ষতিকারক বা মন্দ হতে পারে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দ বিবেচনা ক'রে, ভারসাম্য বজায় রেখে যে মূল্যবোধের মাত্রা নির্ধারিত হয় সেইটিই নীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জন-সংযোগ এমন একটি পেশা যা জনমত প্রভাবিত করে। সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের আচরণ, প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা করে। জন-সংযোগের কাজে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিশেষ কাজ সুবিধাজনক হতে পারে। কিন্তু ঐ একই কাজ তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। আবার, এমনও হতে পারে, যে বিশেষ কাজটি তিনি করলেন, তার ফলে তাঁর সংস্থা লাভবান হলো কিন্তু সমাজের বহু মানুষের পক্ষে সেটি ক্ষতিকর হলো। বেশির ভাগ কাজেই এই ধরণের ভারসাম্য বা মূল্যবোধ জড়িয়ে থাকে। ভারসাম্য বজায় রেখে মূল্যবোধ রক্ষা করাই ''নীতি''। এই নীতি পালনের জন্য দেশে-বিদেশে নানা নির্দেশাবলী রচিত হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় জন-সংযোগ পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন নীতিনির্দেশ নির্ধারণ করেন। আবার সেই সব নীতিনির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও নজরদারী করেন। জনসংযোগ পেশায় নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থা নির্ধারিত নীতি নির্দেশ লঙ্ঘন করলে এই সব প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা যায়। সংগঠনের বিশেষজ্ঞ কমিটি অভিযোগের বিচার-বিবেচনা করেন।

ভারতে এখনও ঠিক এই ধরণের ব্যবস্থা চালু হয়নি। ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক রিলেশনস্ আমেরিকা (Institute of Public Relations, America) একটি বিস্তারিত নীতিনির্দেশাবলী রচনা করেছেন। এই নীতিনির্দেশাবলী প্রত্যেক সদস্যের পক্ষে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। প্রতি বছর এ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এ এই নির্দেশাবলী প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল পাবলি রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন (International Public Relations Associations) যে নীতি নির্দেশ রচনা করেছেন, সাধারণত সেই নির্দেশগুলিই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হয়। তবে, প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে, এই সব নীতি নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুড়িটি ভাষায় যে নীতি নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছেন, সেইটিই বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত এবং বিভিন্ন দেশে অনুসৃত জন-সংযোগের নীতি নিয়মাবলী।

রাষ্ট্র সংঘের মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে জন-সংযোগের কাজ করার জন্য ''আন্তর্জতিক নীতিনির্দেশাবলী'' (International Code of Ethics) রচিত হয়। এই নিয়মাবলীই ''এথেন্সের নিয়মাবলী'' নামে পরিচিত। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সভায় এই নীতি নির্দেশাবলী প্রথম গৃহীত হয়। এই অধিবেশন গ্রীসের এথেন্স শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণেই এই নির্দেশাবলী ''এথেন্স-এর নির্দেশাবলী'' নামে পরিচিত। পরে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই নির্দেশাবলীর কিছু সংশোধন হয়। সেই সংশোধিত নীতি নির্দেশাবলীই বর্তমানে সারা বিশ্বে এথেন্স-এর নির্দেশাবলী নামে পরিচিত এবং অনুসৃত। ফ্রান্স-এর লুসিয়েন মাতরাত (Lucien Matrat) এই নির্দেশাবলীর রচয়িতা।

এথেন্স-এর নির্দেশাবলী

- রাষ্টসংঘের (United Nations Organisation) সকল সদস্য দেশই রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে চলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সনদ ''মৌলিক মানবিক অধিকার'', মানুষের সম্মান (dignity) এবং মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন (worth)-এর উপর বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। জন-সংযোগ পেশার বিশেষ প্রকৃতির কতা বিবেচনা করে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলির জনসংযোগ বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্রসংঘের সনদের মূল নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠার এবং অনুসরণের জন্য সচেষ্ট হবেন।

- কেবল ''অধিকার'ই নয়, সকল মানুষেরই শারীরিক এবং বিভিন্ন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক আকাঙ্ক্ষাও আছে। এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি অপরিহার্যভাবে পূরণ হলে তবেই তাঁরা মানুষের ''অধিকার''-এর যথার্থ সুবিধা লাভ করবেন।
- জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা তাঁদের পেশাগত কর্তব্য পালনের সূত্রে এবং কর্তব্যপালনের বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা এই সব জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে পর্যাপ্ত সহায়তা করতে সক্ষম।
- এবং সর্বশেষে, যেহেতু জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োগে নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সমর্থ যেহেতু জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের এই ক্ষমতা কঠোর নীতি নির্দেশাবলীর দ্বারা সংযত করা প্রয়োজন।

এই সকল কারণে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য এই ''আন্তর্জাতিক নীতি নির্দেশাবলী'' পালন করতে একমত পোষণ করেন। দাখিল করা সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা যদি প্রতিপন্ন হয়—কোনো সদস্য তাঁর পেশাগত কর্তব্য পালনেরে সময় এই নির্দেশমালা লংঘন করেছেন, সেই সদস্যকে গুরুতর অন্যায় (serious misconduct) কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হবে।

এই মূল নীতি অনুসারে প্রত্যেক সদস্য অবশ্যই সচেষ্ট হবেন—

১. নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করবেন। যাতে মানুষ তার পূর্ণ গুরুত্ব (status) অর্জন করতে সমর্থ হয়, এবং রাষ্ট্রসংঘের ''আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণা''র (Universal Declaration of Human Rights) বলে প্রাপ্ত অপরাজেয় অধিকার ভোগ করতে (enjoy) পারে।

২. জ্ঞাপন পদ্ধতি এবং প্রণালী স্থাপনের দ্বাররা আবশ্যিক তথ্যের অবাধ প্রবাহ (flow) এবং বিনিময় যাতে সকল সদস্যকে অবহিত রাখতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক সদস্যই তাঁর ব্যক্তিগত সংস্রব (involvement) এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একাত্মবোধ বিষয়েও সজাগ হবেন।

৩. সর্বদা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে, সকল কাজে এমন ব্যবহার করবেন যাতে তাঁরা সংস্পর্শে যাঁরাই আসবেন তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের উপযুক্ত হবেন এবং তাঁদের নিশ্চিত করার পথও সুগম হবে।

৪. স্মরণ রাখতে হবে যে তাঁর পেশা এবং জনসাধারণের মধ্যে যে সম্পর্ক তার জন্য তাঁর ব্যবহার ও আচরণ, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের আচরণও, এই পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তির মূল্যায়ন (appraisal) প্রভাবিত করবে।

দায়িত্ব গ্রহণ করবেন—

৫. দৈনন্দিন পেশাগত কাজে নৈতিক মান রক্ষা করবেন এবং ''আন্তর্জাতিক মানব অধিকার ঘোষণা''র নির্দেশাবলী মেনে চলবেন।

৬. মানুষের মর্যাদার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং সমর্থন করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করবেন।

৭. যথার্থ আলোচনা এবং মত বিনিময়ের উপযুক্ত নৈতিক, মানসিক এবং জ্ঞানবুদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। অংশগ্রহণকারী সকলেরই নিজের বক্তব্য পেশ করার এবং মতামত জানানোর অধিকার স্বীকার করবেন।

৮. সকল রকম পরিস্থিতিতেই এমনভাবে কাজ করবেন যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। তিনি যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থার এবং জনসাধারণের, সকলের স্বার্থই যেন সংরক্ষিত হয়।

৯. নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য এবং সংকল্প রক্ষার জন্য যা কিছু রচনা করবেন তার রচনাশৈলী এবং শব্দপ্রয়োগ এমন ভাবে করতে হবে যেন কারো মনে কোনো ভাবে আঘাত না করে। সকল রকম পরিস্থিতিতেই আনুগত্য এবং সাধুতা যেন প্রমাণিত হয়, যাতে নিয়োগকর্তার তাঁর উপরে আস্থা বজায় থাকে। এই আস্থা, অতীত নিয়োগকর্তা ও বর্তমান নিয়োগকর্তা এবং তাঁর কাজ যে জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে, তাঁদেরে সকলের আস্থা।

অবশ্যই করবেন না

১০. অন্যান্য প্রয়োজনে সত্যের অবদমন করবেন না।

১১. প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষিত কোনো বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি না থাকলে কোনো তথ্য প্রচার করবেন না।

১২. এমন কোনো উদ্যোগ বা কাজে অংশগ্রহণ করবেন না, যা অনৈতিক, অসাধু এবং মানুষের মর্যাদার এবং সাধুতার পক্ষে ক্ষতিকর।

১৩. পদ্ধতি এবং কৌশলে এমন কোনো কারসাজি করবেন না, যার ফলে মানুষের অবচেতন মনে এমন কোনো সঞ্চালক শক্তি জাগ্রত হয় যা তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এবং এই প্রভাবে গৃহীত কর্মের জন্য তাঁকে দায়ী করা সম্ভব না হয়।

৩.৫.৭ সারাংশ :

বিজ্ঞাপন যেহেতু জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, সেই কারণে বিজ্ঞাপনের মান, রুচি, শালীনতা, স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞাপন যাতে বিভ্রান্ত না করে তার জন্য বিশেষ নিময়াবলী এবং নীতিমালা রচনা হয়েছে। এইসব নীতি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়ে নজরদারীর জন্য এ. এস. সি. আই. সংস্থা গঠিত হয়েছে।

জনসংযোগের ক্ষেত্রেওল (আই. পি. আর. এ) নীতিমালা গঠিত করে।

৩.৫.৮ অনুশীলনী :

(১) বিজ্ঞাপনের মান বজায় রাখা এবং রক্ষার বিষয়ে এম. সি. আই.-এর ভূমিকা কী?

(২) জনসংযোগের ক্ষেত্রে আই. পি. আর.-এর ভূমিকা কী?

৩.৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী :

1. INS Handbook

2. Reports of Audit Bureay of airculations.

মডিউল ৪ সাইবার আইন

একক ১ ❐ ডিজিটাল সময়ে প্রেসের স্বাধীনতা

গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ প্রস্তাবনা

৪.১.৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ভারতীয় সংবিধান

৪.১.৪ প্রেসের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল মাধ্যম

৪.১.৪.১ ডিজিটাল বিপ্লব

৪.১.৪.২ ডিজিটাল মাধ্যম

৪.১.৪.৩ ডিজিটাল গণ মাধ্যম

৪.১.৪.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ও বাক স্বাধীনতা

৪.১.৫ সারাংশ

৪.১.৬ অনুশীলনী

৪.১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১.১ উদ্দেশ্য

'ডিজিটাইজেশন' এবং 'ডিজিটালাইজেশন' দুটি ধারণামূলক নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং প্রায়শই ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ গুলি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি। তবে শব্দদুটির অর্থ ও ব্যবহার একই নয়।। ডিজিটাইজেশন বলতে বোঝায় "অ্যানালগ ডেটার (লেখা, চিত্র, ভিডিও এবং পাঠ্য) ডিজিটাল রূপান্তর।" বিপরীতে, ডিজিটালাইজেশন বলতে বোঝায় ডিজিটাল বা কম্পিউটার প্রযুক্তি গ্রহণ করে বা তার ব্যবহার বৃদ্ধি করে শিল্প সংস্থা, সমাজ ও দেশের কাজে প্রয়োগ করা। সংবাদমাধ্যমও এই ডিজিটালাইজেশনের আওয়াতার বাইরে নয়। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে গনমাধ্যম আজ দেশ, কাল, গন্ডীর সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। এই এককে সেই কারনে, সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডিজিটাল মাধ্যমের বিভিন্ন স্তরের ধারনা লাভ করা যাবে।

৪.১.২ প্রস্তাবনা

তথ্য ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে সাধারন মানুষের অস্তিত্ব ক্রমাগত কতগুলি ডিজিটে পরিনত হচ্ছে। তাঁর পরিচয়প্ত, যোগাযোগ নম্বর, ব্যাঙ্ক আকাউন্ট সবকটি বিষয়ের পরিচয় কেবলমাত্র কিছু নম্বর। কম্পিউটার চালিত

সভ্যতায় বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি যেমন পরিচালিত হয় কতগুলি বাইনারি ডিজিটের প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে, তেমনই বর্তমান সমাজ ডিজিটাল প্রযুক্তি চালিত হয়ে পরেছে। এই এককে সমাজ, গনমাধ্যম এবং ডিজিটাল পরিবর্তন নিয়েই আলচনা করা হবে।

৪.১.৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ভারতীয় সংবিধান

ভারতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারার অধীন নাগরিক অধিকার অনুযায়ী। ধারা ১৯ (১) (ক) তে বলা হয়েছে যে সকল নাগরিকের বাকও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকার ,ধারা ১৯ (২) এর অধীনে আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষ। অর্থাৎ নাগরিকের বাকও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়।

যাইহোক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পরম নয়, যেমনটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়। সংবিধানের ১৯ (১)(২) ধারায় জনস্বার্থকে যা প্রভাবিতকরে সেই বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার যুক্তিসংগত সীমাবদ্ধতার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে:

ক। সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা

খ। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

গ। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

ঘ। জনগণের আদেশ

ঙ। শালীনতা ও নৈতিকতা

চ। আদালত অবমাননার

ছ। মানহানি

জ। কোন অপরাধে উস্কানি

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও তাঁর প্রয়জনীয়তা প্রসংগে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিবৃত করেছে:

"আজকের সংবাদপত্র মুক্ত বিশ্ব স্বাধীনতা সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিবিধি এর হৃদয়। প্রেস এখন প্রকাশ্য বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, যেখানে টেলিভিশন এবং আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন সমাজের সব স্তরের জন্য উপলব্ধ , সেই কারনে সংবাদপ্ত একটি বড় মাত্রার জনগনের কাছে মধ্যে সাম্ভব্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী ভূমিকা বলে গৃহীত হয়েছে। সংবাদপত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য তথ্য ও মতামত তৈরীর মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচকমণ্ডলী তৈরী করা।"

সুপ্রিম কোর্টের উপরের বিবৃতি প্রকাশ করে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যথাযথ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য অপরিহার্য। কারন গণতন্ত্রে, সরকার জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। এটা সুস্পষ্ট যে প্রতি নাগরিকের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের জন্য এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের সংগে এক সুন্দর যোগাযোগ থাকা করা আবশ্যক। পাঠক কেবোলমাত্র সংবাদ গ্রহন করবেন না বরং

সেই সংবাদ প্রসঙ্গে অবাধ মত পোষণ করতে পারবেন। সেই কারনে সংবাদপত্রে সাধারণ জনগণের বিষয়ে আলোচনা একেবারে অপরিহার্য।

৪.১.৪ প্রেসের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল মাধ্যম

যতদিন মুদ্রন মাধ্যম বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমই গনমাধ্যমের ক্ষেত্রে এক চেটিয়া বাজার দখল করে রেখেছিল ততদিন সাংবাদিকতা অনেকটাই এক্মুখি ছিল বলা যেতে পারে। অর্থাৎ খবর বা বার্তা সংবাদ মাধ্যম থেকে পাঠক বা দর্শক — শ্রোতার কাছে পৌছাছে কিন্তু বিপরীত দিক থেকে প্রতিবার্তা পাবার জায়গাটা খুবই কম ছিল বলা যায়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সম্পাদকের কাছে চিঠি বা দূরদর্শনের ক্ষেত্রে "দর্শকের দরবারে" এর মত অনুষ্ঠাণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তি (Information & Communication Technology – ICT) নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর এখন সাংবাদিকগনই কেবলমাত্র সংবাদ তৈরী করেন না বরং উল্টো দিকে থাকা বার্তা গ্রাহকগনও সংবাদ তৈরী করেন। যে কারনে বর্তমানে নাগরিক সাংবাদিকতাকেও (Citizen Journalism) প্রথামাফিক সাংবাদিকতায় স্থান দেওয়া হচ্ছে। নাগরিক সাংবাদিকতায় একজন সাধারন পাঠক সংবাদ তৈরী করে পাঠাতে পারেন। আবার অনেক প্রথা মাফিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পাঠক বা দর্শক — শ্রোতা সরাসরি মতামত জানাতে পারছেন। যেমন ধরা যাক দৈনিকের ই- সংস্করণ রয়েছে। কম্পিউটার বা মোবাইল আপের মাধ্যমে পাঠক সংবাদ পড়তে পারেন। শুধু তাই নয় যে কোন সংবাদের নিচে পাঠক নিজের মতামত দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পাঠকের পরিচয় স্বরূপ ই-মেইল এর পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে সংবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়া এখন কেবল মাত্র একমুখী নয় বরং উভমুখী, পরিমানে কম হলে তা উভমুখী। এছাড়াও তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জনগন সামাজিক মাধ্যমে (social media), বিশেষ করে ফেসবুক, টুইটার বা নিজস্ব ব্লগে (blog) অনবরত খবর তৈরীর চেষ্টা করে চলেছে। এই চেষ্টা খূব সচেতন তা বলা যাবে না। কিন্তু কিছু খবর তো সচেতন ভাবেই করা হয়। এছাড়াও ইউটিউবেও কিছু মানুষ নিজের চ্যানেল চালিয়ে থাকেন বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রিক। সুতরাং বলা যায় নতুন ডিজিটাল মাধ্যম জনগনের মতপ্রকাশের পরিধিকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় জানা দরকার।

৪.১.৪.১ ডিজিটাল বিপ্লব

১৯৫০ - ১৯৭০ এর দশকে পৃথিবী জুড়ে বৈদ্যুতিন জগতে অ্যানালগ প্রযুক্তির পরিবর্তে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কৃষি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লবের মতন এই ডিজিটাল বিপ্লবের কেন্দ্রীয় বিষয় হল - ব্যাপক হারে ডিজিটাল লজিক, মস ট্রানজিস্টর (MOSFETs), এবং সমন্বিত বর্তনী (আইসি) চিপ, এবং তাদের উদ্ভূত প্রযুক্তির সহকম্পিউটার, মাইক্রোপ্রসেসর, ডিজিটাল সেলুলার ফোন, ইন্টারনেটের গণউৎপাদন ও ব্যবহার। এইসব প্রযুক্তিগত প্রবর্তিত ঐতিহ্যগত উৎপাদনও ডিজিটাল বিপ্লবে ব্যবসা - কৌশলে রুপান্তরিত হয়েছে। ১৯২০ সালের পর থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রায় সমগ্র ধারনাটাই কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই ডিজিটাল প্রযুক্তির একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে তথ্যের আদান প্রদান বা যোগাযোগ বিষয়টি। অর্থাৎ এই ডিজিটাল সময়ে সমাজে গন উৎপাদন বলতে আর বিভিন্ন রকম বস্তুকে বোঝায় না। বরং অনেক বেশী বোঝায় কম্পিউটার নির্ভর তথ্য উৎপাদনকে। বিশ শতককের শুরু থেকেই উৎপতপাদব্যাবস্থা ঐতিহ্যগত শিল্প থেকে দ্রুত স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছিল এবং যে শিল্প বিপ্লব একটি অর্থনীতির প্রাথমিকভাবে উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল সেই প্রথামাফিক শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় তথ্য প্রযুক্তি। ডিজিটাল মাধ্যমে খুব সহজেই কোন বার্তাকে কোডএ রূপান্তরিত করা যায় অর্থাৎ পাঠযোগ্য

ফরম্যাটের ডিজিটাল মিডিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে দেখা এবং সহজেই তার বিতরণ, পরিবর্তন এবং সংরক্ষিত করা যেতে পারে কোনও ডিজিটাল বৈদ্যুতিন যন্ত্রে। এই বার্তা বা তথ্য ডিজিটাল ইমেজ, ডিজিটাল ভিডিও, ভিডিও গেমস, ওয়েব পেজ এবংওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল তথ্যএবং ডাটাবেস, ডিজিটাল অডিও যেমন MP3 এবং ইলেকট্রনিক বই প্রভৃতি সব কিছুর মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে। ডিজিটাল যুগ (Digital Age) বা তথ্য যুগের (Information Age) সূত্রপাত ও উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ট্র্যান্সিস্টর প্রযুক্তি, বিশেষ করে MOSFET (মেটাল-অক্সাইড-অর্ধপরিবাহীক্ষেত্র-প্রভাব ট্রানজিস্টার), যা বৈপ্লবিক এবং মৌলিক বিল্ডিং ব্লক হয়ে ওঠে ডিজিটাল বৈদ্যুতিন তথ্য যুগে। এই ডিজিটাল বিপ্লব মুলত কম্পিউটার নির্ভর।

বৃহত্তর সমাজের মধ্যে কম্পিউটিং প্রযুক্তির এই ব্যবহার, আধুনিকীকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সামাজিক বিবর্তনের চালিকা শক্তি হয়ে উঠছে।

৪.১.৪.২ ডিজিটাল মাধ্যম

ডিজিটাল মাধ্যম, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর একটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশস্ত এবং জটিল প্রভাব ফেলেছে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেট এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটিং উভয়ে মিলে ডিজিটাল মাধ্যমে ঘটিয়েছে নতুনত্ব প্রকাশ। এই নতুন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে সাংবাদিকতা, জনসংযোগ, বিনোদন, শিক্ষা, বাণিজ্য ও রাজনীতিতেও। এছাড়াও ডিজিটাল মিডিয়া নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে কপিরাইট এবং মেধা সম্পত্তি আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে, কখনও কখনও এমন ও মনে হচ্ছে যে একজন কোনও বিষয়বস্তু লিখলেন কিন্তু তা সেই বিষয়বস্তু সৃষ্টিকারীদের স্বেচ্ছায় তাদের কাজ করার জন্য কিছু বা তাদের সকল আইনি অধিকার ছেড়ে দিতে হবে। ডিজিটাল মিডিয়া এবং সমাজের উপর তার সর্বব্যাপি প্রভাব শিল্প ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই যুগ তথ্যের যুগ। এই যুগ সমাজ কে কাগজহীন (ঞ্চথদ্মত্রন নত্রন্দন্দ) একটি পরিমন্ডলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বেশীরভাগ সামাজিক লেন দেন কোনও ডিজিটাল মাধ্যম দ্বারা উতাদিত এবং কম্পিউটারের দ্বারা পরিচালিত। ভারতের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল বিষয়টি অন্য মাত্রা নিয়েছে। কারন ভারত সরকারের একটি প্রধান কর্মসূচি হল “ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম” যা ভারতকে ডিজিটালি ক্ষমতায়িত সমাজ ও জ্ঞানের অর্থনীতিতে রূপান্তর করার দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবাদির উপর জোর দিয়ে বৃহত্তর বিভাগীয় প্রয়োগগুলির ক্ষেত্রে ভারতে ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগের যাত্রা বৃহত্তর মাত্রা নিয়েছিল ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। পরে, অনেক রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিভিন্ন ই-গভর্নেন্স প্রকল্প শুরু করে। যদিও এই ই-গভর্নেন্স প্রকল্পগুলি নাগরিককেন্দ্রিক ছিল, তারা কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের চেয়ে কম করতে পারে। ভারত সরকার ২০০৬ সালে জাতীয় ই-গভর্নেন্স পরিকল্পনা (এনইজিপি) চালু করেছিল। বিভিন্ন ডোমেনের আওতাধীন ৩১ টি মিশন মোড প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। যদিও দেশজুড়ে অনেকগুলি ই-গভর্নেন্স প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে ই-গভর্নেন্স পছন্দসই প্রভাব ফেলতে এবং তার সমস্ত লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। এটি অনুভূত হয়েছে যে দেশে ই-গভর্নেন্স ইলেক্ট্রনিক সেবা, পণ্য, ডিভাইস এবং চাকরির সুযোগগুলি অন্তর্ভুক্ত সহ অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির প্রচারকে নিশ্চিত করার জন্য আরও অনেক বেশি জোর প্রয়োজন। তদুপরি, দেশে বৈদ্যুতিন উতাদন আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের পরিষেবাগুলির পুরো ব্যবহারিক জীবনে রূপান্তর করতে, ভারত সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি চালু করেছে ভারতকে ডিজিটাল ক্ষমতায়িত সমাজ ও জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে।

দ্রূত পরিবর্তনশীল আজকের সমাজে মূল ভিত্তি হল জ্ঞান। জ্ঞান আহরণ করতে প্রয়োজন তথ্য এবং কম্পিউটারের দৌলতে তা এখন একটা ক্লিকের ওপর নির্ভর করে। ই-গভর্নেন্সকে আরও জোরদার করে তুলতে ২০১৫ সালের ১ জুলাই “ডিজিটাল ইন্ডিয়া” এ প্রোগ্রামটি চালু করে ভারত সরকার। ঘরে বসে ব্যাংকিং পরিষেবা, বিভিন্ন বিল মেটান,

স্কুল- কলেজ — বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন, কেনাকাটা সবই চলছে ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে।

যদিও ভারতে ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহারকারির সংখ্যা কত তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যভার করতে গেলে ন্যূনতম শিক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য ও বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।

৪.১.৪.৩ ডিজিটাল গণ মাধ্যম

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র রয়েছে এবং দেশে গণমাধ্যমের একটি শক্তিশালী উপস্থিতিও রয়েছে। গনমাধ্যম আজ সত্যই তার পরিধি বিস্তার করেছে। কেবল মাত্র ব্যক্তির বিনদনে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি সামাজিক অংশগ্রহণের একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে অনেকটাই এগিয়েছে। গণতন্ত্রকে সাধারণভাবে বোঝা যায় যে এটি একধরণের সরকার যা জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের সাপেক্ষে। এটি মূলত লোকেদের দ্বারা একটি নিয়ম যা রাজতন্ত্র বা অভিজাতদের বিপরীতে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ গৌরবগুলির মধ্যে একটি হ''ল মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্থানটি যা সমাজের বিভিন্ন বিভাগের মতামতগুলিকে সরবরাহ করা হয়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে পারে যখন সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে বিস্তৃত অংশগ্রহণ থাকে যা লোকেরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত না করে সম্ভব হয় না। নির্ভরযোগ্য তথ্য সংস্থান যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানেই গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে জনগনের প্রতি, গণমাধ্যম তার বিভিন্ন রূপে বর্তমান শতাব্দীতে মানবজীবনকে প্রভাবিত করেছে। তারা প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন দেশ জুড়ে তথ্য এবং বিনোদন সরবরাহ করেছে। মুদ্রন মাধ্যম, উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য শীর্ষস্থানএ থেকেছে। ভারতে ৮০ এর দশক থেকে টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতআয় নামতে হয়েছে, যা সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলির অনেকগুলি পুনঃনির্মাণ করে। সংবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ ব্যতীত রেডিওও বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি উদ্দীপনা তৈরি করেছে, যার ফলে প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায়।

যদিও চতুর্থ স্তম্ভ (Fouth Estate) দীর্ঘ সময়ের জন্য সুশৃঙ্খল ছিল, তবে মনে হয় যে এটি নতুন সহস্রাব্দে তার প্রকৃত সম্ভাবনা এবং উদ্দেশ্যটি কেবল গণতন্ত্রের সত্য চেতনায় উপলব্ধি করেছে যেমন আব্রাহাম লিংকনের দ্বারা জনগণের একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ার কল্পনা করা হয়েছিল, জনগণ এবং জনগণের পক্ষে ''। মতপ্রকাশের মাধ্যমে গন্তান্ত্রিক অংশগ্রহন সামাজিক মাধ্যম আবির্ভাবের মাধ্যমে সহজতর হয়েছে। ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা এবং দারোয়ানদের (ওথষ্ঠত্র জ্ঞত্রত্রদ্মত্র) অস্তিত্বের অনুপস্থিতির কারণে, সামাজিক মাধ্যম তথ্যের একটি মঞ্চ সরবরাহ করতে চায় — যা সমস্ত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সংগে ভাগ করে নেবে জ্ঞান, তথ্য, বিনোদন। এটি উল্লেখযোগ্য কারণ তথ্য এবং সামাজিক সচেতনতা হল মানব ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে মনে করা হয়। মাধ্যম সর্বদা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাগুলির প্রতিবেদন করা ছাড়াও এটি জনমত তৈরি করে। এটি গণতন্ত্রকে গনমাধ্যম একটি শক্তিশালী অবস্থানে রাখে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উত্থানের সাথে সাথে মাধ্যম ধারনাটি অনেক বদলে গেছে। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা সমাজের ধরন প্রতিফলিত করে। এমনকি প্রচলিত গনমাধ্যম চ্যানেলগুলি চলমান সামাজিক মাধ্যমের প্রবনতা গুলিতে ট্টন্দ্রদ্রত্ম) নজর রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে, এমন অনেকগুলি শীর্ষস্থানীয় সংবাদ আছে যা সামাজিক মাধ্যম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরার পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিও সরকার এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ উন্মোচিত করেছে। জনগণ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কী করবে তা সম্পর্কে আরও সচেতন। রাজনৈতিক ইস্যু এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা ব্যাপক এবং তাতণিক। সামাজিক মাধ্যমকে আমরা জন-মাধ্যম হিসেবে মনে করতে পারি। এই মাধ্যমে প্রতি মাধ্যমব্যবহারকারীর সক্ষমতা আছে যাতে তারা এক সাথে অনেক মানুষকে নিজের তৈরী করা বার্তা পাঠাতে পারে।

২০০৮ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পেইনে বারাক ওবামার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এবং আলোচিত হয়েছে। পিআর ফার্ম এডেলম্যানের একটি সমীক্ষা ওবামার 'ভূমিকম্পের বিজয়' প্রধানত তার সামাজিক যোগাযোগের সফল ব্যবহারের জন্য দায়ী করেছে (লুটজ, ২০০৯)। একইসাথে ওবামার আমেরিকান যুবাদের একত্রিত করার ক্ষমতা কেবল তার প্রচারকেই জোরদার করে তোলে নি, শেষ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী ভোটদান বিভাগে পরিণত হয়েছিল। যুব ভোটাররা বারাক ওবামার সাথে একটি অপ্রচলিত ভোটার-রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক তৈরি করতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছিলেন, কীভাবে প্রচারের সময় রাজনৈতিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল এবং রাজনীতিবিদ ও ভোটারদের মধ্যে এই নতুন, মধ্যস্থতা রাজনীতির ভবিষ্যতের জন্য কী বোঝাতে পারে। দিল্লিতে নির্বাচনের কাজ চলাকালীন, ভারতীয় গনমাধ্যম জানিয়েছে যে আম আদমি পার্টির (এএপি) প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০০৮ সালের বারাক ওবামার সামাজিক মিডিয়া কৌশল থেকে শিখতে চেয়েছিলেন কারন অনেকে বিশ্বাস করেন যে সামাজিক মাধ্যম ওবামাকে হোয়াইট হাউস জিততে সহায়তা করেছিল। সাত হাজার উতর্গীকৃত স্বেচ্ছাসেবক যারা ছাত্র, কর্মী এবং বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি এবং এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকদের নিয়ে এএপি দিল্লীতে ক্ষমতায় আসেন এবং এর পিছনে যে সামাজিক মাধ্যমের এক বড় ভূমিকা ছিল তা কেজরিয়াল স্বীকার করেন।

তবে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে কী এবং কীভাবে এটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি (এসএনএস) থেকে আলাদা? সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, ব্লগস এবং ইউটিউব অন্তর্ভুক্ত।

কাপলান অ্যান্ড হেইনলাইন (২০১০) এর মতে, সামাজিক মিডিয়া এমন প্রযুক্তি রয়েছে যা ব্যবহারকারীর সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তুত বিষয় (ড্ডন্সত্রে ওত্রদ্রত্রন্থষ্ঠত্রত্ম ঙ্খদ্রদ্রষ্ঠত্রদ্রষ্ঠ — ড্ডওঙ্খ), যা ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ এবং সামগ্রী তৈরিতে আলোকপাত করে। কাপলান এবং হেনলাইন (২০১০) এর মতে, সামাজিক মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ব্লগ, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি (যেমন ফেসবুক এবং টুইটার), সামগ্রী সম্প্রদায় (যেমন ইউটিউব), এবং সহযোগী প্রকল্প (যেমন উইকিপিডিয়া)।

ভারতীয় সামাজিক ও পেশাগত কর্মজীবনের বিষয়গুলি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। গত দু-তিন বছর ধরে সমস্ত লক্ষণ ছিল যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত জনপ্রিয়তা এই বিষয়গুলিকে দ্রুত রূপান্তরিত করছে। টুইটার এবং ফেসবুক অনিচ্ছুক তরুণ ভারতীয়দের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিয়ে অন্তত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার দুর্দান্ত সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে। মূলত মূলধারার গণমাধ্যমগুলি বেশ কয়েকটি কারণে আলোচনা বা প্রদর্শন করবে না এমন বিভিন্ন বিষয়ে কেবল আলোচনা নয় বরং সমালোচনা ও মতামত প্রচারের জন্য শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলিতে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং যুবকদের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি এবং এটিকে একটি উত্তীর্ণ পর্যায় হিসাবে উপেক্ষা করেছে যা ভোটদানের পদ্ধতি বা নির্বাচনের ফলাফলের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। তবুও কিছু রাজনৈতিক নেতা এটিকে ভারতের শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে সংযোগ স্থাপনের দুর্দান্ত হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছেন যারা ভোটের পরিবর্তে, উপভোগ করার জন্য ভোটের দিনটিকে অপ্রত্যাশিত ছুটির দিন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাফল্যের কারনে কিছু রাজনৈতিক দল ব্যাপকভাবে লাভ করেছে কারণ, ভারতের বেশিরভাগ যুবসমাজ, বিজ্ঞাপন সংস্থা, গবেষণা সংস্থা, আইটি সংস্থাগুলি, বিপিও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ কর্মীকে কাজ করে যাচ্ছেন পরিষেবা বা উতাদন সেক্টর টেলিভিশন দেখার সুযোগ পাবে না বা বরং সর্বব্যাপী টেলিভিশন

সেট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, তবে তাদের ল্যাপটপ, ওয়ার্কস্টেশন এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল বিশ্বে আরও অনেক কিছু জাগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আলোচনার একমাত্র ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা তথ্য প্রচার, এডভোকেসি, ভোটার নিবন্ধকরণ ড্রাইভ এবং ভোটারদের একত্রিত করার এক আশ্চর্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই যে প্রথমবারের মত ভোটার এবং বিপুল সংখ্যক সেই যুবক যারা অতীতে কখনও ভোট দেয়নি তারা ২০১৫ বিধানসভা নির্বাচনে খুব উতাহের সাথে ভোট দিয়েছিল। যে সমস্ত রাজ্য জরিপ করতে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই ভোটের শতাংশে ব্যাপক উতাহ দেখায় যা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে দেয়। অতীতে ভোট দেয়নি এমন বিপুল সংখ্যক ভোটারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এটি সম্ভব হত না। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিশেষত টুইটার এবং ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিজেপি এবং বিশেষত তার প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর একটি সূচনা হয়েছিল এবং তাদের জনপ্রিয়তার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পৌঁছানো অন্য কোনও দলের চেয়ে অনেক বেশি।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা এই মাধ্যমটিতে ন্যূনতম যা অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে। গনমাধ্যম আউটলেটগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের আন্তঃক্রিয়াশীলতা এবং নমনীয়তার মাধ্যমেও ব্যবহারকারীদের বৃহত্তর ক্ষমতায়ন রয়েছে। মাধ্যমের সম্ভাব্যতা ব্যবহারকারী-নির্মিত সামগ্রী সরবরাহ করার মাধ্যমে আরও ব্যক্তিগতকৃত হওয়ার দক্ষতার মধ্যে রয়েছে (চন্দ্রন্দ্র, ২০০৯)। তবুও, বিজ্ঞাপনের আয়গুলি ডিজিটাল মাধ্যম আউটপুটগুলিকে প্রভাবিত করার ঝুকিও রয়েছে। যাঁরা যথেষ্ট সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের কাছে গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মতামতকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। টুজি কেলেঙ্কারী মামলায় রাডিয়া টেপস বিতর্ক সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং শিল্প সংগঠন নেক্সাসকে কেন্দ্র করে নিয়ে আসে। এই জাতীয় উন্নয়ন গণতন্ত্রের জন্য হুমকি এবং গনমাধ্যমের সৌভ্রাতৃত্বকে ক্ষুন্ন করে।

৪.১.৪.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ও বাক স্বাধীনতা

আজ, বিভিন্ন শ্রেনীর ব্যক্তি যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন তারা বিভিন্নভাবে নয়া মাধ্যমের সুবিধা নেন। আজ যেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাইবার জগতে এক একটি প্রেস। ব্লগ স্পট এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির মাধ্যমে নিজের গণ্ডী বা তাঁর বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বের কাছেও গুরুত্বপুর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে প্রতি ৬ জনের মধ্যে অন্তত ১ জন করে ভারতীয়দের ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সম্পূর্ন ইন্টারনেট প্রয়োগকারীদের যদি এক বিশ্ব হিসেবে ভাবা যায় তাহলে তাঁর সংখ্যা বিপুল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা - তথ্য সরবরাহের স্বাধীনতা এবং তথ্য অনুসন্ধান এবং গ্রহণের স্বাধীনতা সহ - একটি নতুন যুগে রূপান্তরিত হচ্ছে যেখানে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি অন্যান্য জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে: ক) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে, এবং খ) সমস্ত সংযুক্ত নেটওয়ার্ক থেকে তথ্য অ্যাক্সেস করুন। ওয়েব ২.০ যুগে, ইন্টারনেট মার্শাল ম্যাক্লুহানের "বিশ্ব গ্রাম" শব্দবন্ধকে নতুন আকারে সত্যি প্রমান করছে যা ভৌগলিক সীমানা সত্ত্বেও অভূতপূর্ব তথ্যের সন্ধানের পাশাপাশি অ্যাক্সেসের সহজ অ্যাক্সেসকে সক্ষম করে।

ডিজিটাল যুগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেবল তার অভিগমনের মাত্রা প্রসারিত করে তাই নয়, তথ্য সংগ্রহ করার এবং ছড়িয়ে দেওয়ার অভিনব উপায়গুলি সক্ষম করে। তথ্য এবং মতামতের অনলাইন প্রচারে স্থান বা ভৌগলিক সীমানা

সম্পর্কিত, সময় বা ধরন সম্পর্কিত কোনও সীমাবদ্ধতা নেই এবং পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত অংশগ্রহনকারীদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়।

একাধিক অনলাইন যোগাযোগের সরঞ্জাম এবং চ্যানেলগুলি অনলাইন সমাবেশ এবং সমিতি কার্যক্রমগুলিকে সাহায্য করেছে ন আজকাল, ইন্টারনেট প্রয়োগকারীদের যে কেউ সাইবারস্পেসে অন্যের সাথে সংযুক্ত বা একত্রিত হতে পারেন, প্রায়শই শারীরিকভাবে সম্ভবের চেয়ে অনেক বেশি সহজেই। এই কার্যকারিতাটি অনলাইনে ভিডিও চ্যাট, অনলাইন সভা এবং সামাজিক মাধ্যম-ভিত্তিক সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সহ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে, আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক রূপান্তর ও অস্থিরতার সময়ে যেমন দেখা গেছে, অনলাইন সম্মেলনে মত প্রকাশের অধিকারের সুযোগকে ব্যবহার করে কিভাবে "মুক্ত সমাবেশ এবং সমিতি" সংগঠিত হয়েছিল এবং এই অধিকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল গণতন্ত্রকরণ প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৪ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে ইন্টারনেট গভর্নেন্সের ভবিষ্যতের বিষয়ে একটী সভায় ইন্টারনেট প্রশাসনের অন্যতম নীতি হিসাবে এই অধিকারকে জোর দেওয়া হয়েছে: " সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনলাইনে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সমিতির অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।" তবুও, ইন্টারনেট দ্বারা বর্ধিত এই মঞ্চ মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেও , ধারণাটি নতুন ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছে। প্রথাগত সামাজিক-আইনী গণ্ডির অস্পষ্টতা, গোপনীয়তা সম্পর্কিত বিষয় ও অন্যান্য মানবাধিকার, এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা উভয়কেই চ্যালেঞ্জের দিকে পরিচালিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন প্রসঙ্গে মত প্রকাশের অধিকারের অপব্যবহার অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার যেমন গোপনীয়তা, খ্যাতি এবং মর্যাদাবোধ এবং অন্যান্য জনস্বার্থ যেমন জননিরাপত্তা এবং গণশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সন্ত্রাসী ও ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলি মতাদর্শের পক্ষে, নতুন বিশ্বস্ত নিয়োগপদ্ধতি এবং প্রচুর ক্ষতি সাধনকারী কর্মকাণ্ডকে সংগঠিত করার জন্য ফেসবুক এবং টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে আসছে। একইভাবে, সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে ছড়ানো ঘৃণাত্মক বক্তব্য, লিঙ্গ এবং বর্ণ বৈষম্যমূলক বক্তব্য এবং অভিব্যক্তি ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মূল্যবোধকে ঘৃণা করতে পারে এবং সহিংসতা, বৈষম্য এবং বৈরিতা সম্ভাব্যভাবে উতাহিত করতে পারে। তেমনি, যদি স্পর্শকাতর ব্যক্তিগত তথ্য বিষয়টির সম্মতি ব্যতীত বা জনস্বার্থ ভিত্তিক ন্যায়সঙ্গততার অভাবে প্রকাশ করা হয় তবে অনলাইনে বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার করা যেতে পারে।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ও তার আইন এবং সংবিধানে বাক রক্ষা করে। তা সত্ত্বেও, ইন্টারনেট বিশ্বে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার কিছু যুক্তিসংগত কারনে বিতর্ক তৈরী করেছে। যেমন মানহানি, জাতীয় নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে কোন তথ্য এবং ধারনার অবাধ প্রবাহ প্রায়শই ভারতে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও প্রযুক্তিগত উপায়ে নিষেধাজ্ঞা বলবতকরার বহুল প্রচেষ্টা বর্তমান।, ২০০৮ স সালে মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার সময় থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের কারনে সামাজিক মাধ্যমে বাকরুদ্ধ করার একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু সুশীল সমাজে তার প্রতিরোধ শুরু করে।

ডিজিটাল স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতাসমূহ অনেক বিতর্কও ভারতে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং যেমন ওদ্রদ্রন্ত্রত্র, ইয়াহু এবং ফেসবুক, যেমন সবচেয়ে বড় ওয়েব হোস্ট কোম্পানি, কিছু ক্ষেত্রে 'আপত্তিকর' সামগ্রী সরাতে ব্যর্থ অপরাধের অভিযোগ আছে। প্রধান মুক্ত মত প্রকাশের ভারতের অনলাইন হুমকি নির্দিষ্ট আইনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইন হল ২০০০ সালে প্রণীত তথ্য প্রযুক্তি অ্যাক্ট (আইটি আইন) এবং ২০০৮ সালে এর পোস্ট মুম্বাই হামলার সংশোধনী যে অপরাধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা প্রায় নতুন নিয়মকানুন চালু।

২০১১ সালে প্রবর্তিত নতুন বিধিগুলি কোনও ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকারী সংস্থা কর্তৃক তৈরি করা, বা মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হওয়া, অভিযোগের ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের কন্টেন্ট সরিয়ে নিতে বাধ্য করে। এটি বিভিন্নভাবে ত্রুটি যুক্ত: কারন এটি মধ্যস্থতাকারীদের এমন বিষয়বস্তুর জন্য দায়বদ্ধ করে তোলে যা তারা ওয়েবসাইট এবং প্ল্যাটফর্মে লেখেননি, যা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না এবং অনলাইনে সেন্সর-পূর্ববর্তীভাবে সেন্সর করাতে উতাহিত করে, যা সামগ্রীর অতিরিক্ত সেন্সরশিপকে বৃদ্ধি করে।

এদিকে, 'মারাত্মক ক্ষতিকারক', 'হয়রানি করা' বা 'নিন্দাবাদী' হিসাবে লিখিত বিষয়বস্তু পোস্ট করা নাগরিকদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। অনলাইন বক্তৃতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে অপরাধীকরণের মাধ্যমে সেন্সরশিপ বিরক্তিকর, বিশেষত যখন এটি বৈধ রাজনৈতিক মন্তব্য বা ক্ষতিকারক সামগ্রীকে প্রভাবিত করে।

ডিজিটাল স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের একটি হ''ল জনগণের বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে নেটওয়ার্কের শাটডাউন ভারতের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা একটি জাতীয় চ্যালেঞ্জ। অনলাইনে আজ ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ, ভবিষ্যতে অনলাইনে এক বিলিয়ন নতুন ভারতীয় নেটিজন থাকতে পারে। ভারত কীভাবে এটি ঘটতে সক্ষম করে তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী খেলোয়াড়, এখন তার ঘরোয়া নিয়মকানুন এবং নীতি বিশ্লেষণের জন্য এখন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কারন এই পথটি কেবল ভারতের জনগণের জন্যই নয়, আঞ্চলিক প্রতিবেশী এবং উদীয়মান গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষেও রূপকে রূপ দেবে।

২০০৩ সাল থেকে ইন্টারনেট সেন্সরশিপ এবং ফিল্টারিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (আইসিইআরটি) কে কেন্দ্র করে আসছে, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের একটি বিভাগ যা একটি মনোনীত পুলের অনুরোধগুলি গ্রহণ ও পর্যালোচনা করার জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। সরকারী কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস ব্লক করতে।

"'অশ্লীলতা 'এবং ' উস্কানিমূলক' বিষয়গুলি আসলে কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়া উচিত তার কোনও সংজ্ঞা নেই। একদিকে আইনটির অস্পষ্টতা এবং অন্যদিকে আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে গুআপত্তিকর বিষয়বস্তু অবলম্বন করেগ্ন ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা এবং ধারনা তৈরীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে," - বলেছেন উচ্চপরিষদের সদস্য রাজী ব চন্দ্রশেখর, ভারতীয় সংসদ।

৪.১.৫ সারাংশ

মুদ্রন মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মত প্রকাশের অধিকারকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ফেলা গেলেও ডিজিটাল মাধ্যমে মত প্রকাশের বিষয়টিকে কোনও নির্দিষ্ট কাঠামোতে ফেলা এই মুহুর্তেই সম্ভব নয়। যতক্ষণ আমরা একটা ধারনা তৈরী করছি, সেই সময়ের মধ্যেই দেখাযাচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম অন্যরূপে আবর্ভাব হচ্ছে। 'টিকটক' নামক সামাজিক মাধ্যমের বারবাড়ন্ত ২০১৮ সালেও তেমন ছিল না, কিন্তু ২০২০ সালের মধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে মতপ্রকাশের জন্য সাধারন মানুষ এই মাধ্যমকেও বেছে নিয়েছে। সব থেকে ভয়ংকর বিষয় হল, প্রথামাফিক গণমাধ্যম গুলিতে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করা হত, যাতে প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে বা কোনও গোষ্ঠী সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানো না হয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু সেই বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সামাজিক মাধ্যম ব্যাবহারকারিরা অনেকেই নিজেদের গোপন হিংসা চরিতার্থ করছেন। আবার উল্টো দিকে আরব দুনিয়ার

গনভ্যুত্থান বা বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন যা দেশ, কাল, সীমানার উর্দে, তাও সম্ভব হয়েছে এই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমেই। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই ডিজিটাল মাধ্যমের মেটামরফসিস দশা চলছে, এখন শুধু পরিস্থিতি নজরে রেখে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়াই কাজ।

৪.১.৬) অনুশীলনী

১। ভারতে সংবাদপ্তের স্বাধীনতার ভিত্তি কি? উপযুক্ত সূত্রসহ ব্যাখা ক্রুন।

২। ডিজিটাল মাধ্যমে ড্ডও.ঙ্খ বলতে কি বোঝানো হয়?

৩। ডিজিটাল মাধ্যম কি তথ্যের প্রবাহে স্বাধীনতা দিয়েছে? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

৪। ইন্টারনেট সেন্সরশীপ বিষয়টি ব্যাখা করুন।

৫। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে কি জনমত তৈরী করা যায়? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

৬। "সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম স্বাধীনতা ও ব্যাপ্তি দিলেও ঝুকির প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে।" — মন্তব্যটির ব্যাখা দিন।

৪.১.৭) গ্রন্থপঞ্জী

International Journal on Emerging Technologies ŒSpecial Issue NCETSTéŸé2017Š 8(1)- 298-303(2017)

Reuters Institute India Digital News Report

https://www*f*indexoncensorship*f*org/wp-content/uploads/2013/11

https://digitalcommons.law.yale/edu/fss_papers.

একক-২ ❐ ডিজিটাল মাধ্যম ও সংপ্রশ্ন

গঠন

৪.২.১) উদ্দেশ্য

৪.২.২) প্রস্তাবনা

৪.২.৩) গোপনীয়তার অধিকার এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সরকারের এক্তিয়ার"

৪.২.৩.১) ডিজিটাল মাধ্যম ও গোপনীয়তা

৪.২.৩.২) গোপনীয়তার অধিকার ও ভারতের অবস্থান

৪.২.৪) ডিজিটাল মাধ্যম ও নজরদারী

৪.২.৫) সাইবার অপরাধ

৪.২.৫.১) সাইবার আইন

৪.২.৫.২) তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০

৪.২.৫.৩) তথ্য প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন,২০০৮

৪.২.৬ সারাংশ

৪.২.৭ অনুশীলনী

৪.২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.২.১) উদ্দেশ্য

ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসারের ফলে যোগাযোগ ব্যাবস্থায় যে পরিবর্তন এনেছে , তা অকল্পনীয়। সারা বিশ্ব প্রকৃতই এখন হাতের মুঠোয়, মুহূর্তে কোলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাওয়া যাচ্ছে এক ভিডিও কলের সাহায্যে। বন্ধু হয়ে যাচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। দেদার কেনাকেটা চলে অনলাইনে। আপে গাড়ি বুক করেই চলে যাওয়া যায় গন্তব্যে। কিন্তু এই সব সুবিধার মাঝেও ছোবল পড়ে অন্ধকারের , অপরাধের। এখন অপরাধীরাও সাইবার বিশেষজ্ঞ। মূহুর্তে ফাঁকা হয়ে যায় জমানো টাকা। অনলাইন গেমের অমোঘ আকর্ষণে প্রান যায় শিশুদের। ক্রমাগত সাইবার অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে তাদের মাত্রা। তাই প্রয়োজন হয়ে পরে নির্দিষ্ট আইনের তৈরী হয় সাইবার আইন।

৪.২.২ প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ে সাইবার আইন কি, তার প্রয়োজনীয়তা সহ বর্তমান পরিস্তিতি নিয়ে আলোচনা করব।

৪.২.৩ গোপনীয়তার অধিকার এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সরকারের এক্তিয়ার

গোপনীয়তার অধিকার হ''ল এমনই একটি অধিকার যা সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণিত হয় না। যাইহোক, ২১ নং ধারা এবং সংবিধানের রাষ্ট্রের নির্দেশিকার আরও কয়েকটি মূল নীতি থেকে সুপ্রিম কোর্ট এই জাতীয় অধিকার খর্ব করেছে।

গোপনীয়তার শব্দের অর্থ কী তা প্রথমে আমাদের একটু জানা প্রয়োজন। ব্ল্যাকের আইন অভিধান অনুসারে "একাকী থাকার অধিকার; কোনও ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রচার থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার; যে বিষয়গুলির সাথে জনসাধারণ স্বার্থ জড়িত নয় অগত্যা সে বিষয়ে জনগণের দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত বেঁচে থাকার অধিকার '।

ভারতের সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে 'আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যতীত কোনও ব্যক্তি তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না'। ২১ নং ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে "জীবন" শব্দটিতে জীবনের সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একজন মানুষের জীবনকে অর্থবোধক, পরিপূর্ণ ও মূল্যবান জীবনযাত্রায় পরিণত করে।

২১ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত জীবনের অধিকারকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে নিছক বেঁচে থাকা এবং নিছক অস্তিত্ব বা প্রাণীর অস্তিত্বের চেয়ে বেশি কিছু বোঝাতে পারে। সুতরাং এটি জীবনের সেই সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মানুষের জীবনকে আরও অর্থবহ, পূর্ণ এবং মূল্যবান জীবনযাপন এবং গোপনীয়তার অধিকার হিসাবে গ্রহণ করে। এই বিষয়টি প্রথমবার উত্থাপিত হয়েছিল খারাক সিংহ বনাম ইউপি রাজ্যের ক্ষেত্রে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল উত্তর প্রদেশ পুলিশী নিয়ন্ত্রণের ২৩৬ নং বিধিবিধানটি অসাংবিধানিক কারন তা সংবিধানের ২১ নং ধারার বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। আদালত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে গোপনীয়তার অধিকার জীবন রক্ষার অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি অংশ এখানে, আদালত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে গোপনীয়তার সমতুল্য ছিল।

গোবিন্দ বনাম মধ্য প্রদেশের রাজ্যে, বিচারক ম্যাথিউ, জে ১৯ (ক), (ঘ) এবং ২১ নং ধারা থেকে উদ্ধৃত করে গোপনীয়তার অধিকারকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে গোপনীয়তার অধিকার চূড়ান্ত অধিকার নয়। "ধরে নিই যে কোনও নাগরিকের স্পষ্টভাবে নিশ্চিত কয়েকটি মৌলিক অধিকার রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার নিজেই একটি মৌলিক অধিকার, তবে বাধ্যতামূলক ও জনস্বার্থের ভিত্তিতে মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে'। আঞ্চলিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সর্বদা নজরদারি করা হয় এমন বস্তু এবং সীমাবদ্ধতার অধীনে থাকা ব্যক্তির চরিত্র এবং পূর্বসূরীদের কারণে কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তার উপর অযৌক্তিকভাবে নজরদারি বা খবরদারি চালানো ঠিক নয়। গোপনীয়তার অধিকার ' কোন স্থানের নয় বরং ব্যক্তির' বিষয় নিয়ে কাজ করে।

শ্রীমতি মানেকা গান্ধী বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বনাম Anr., (১৯৭৮) এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ৭ জনের এক বিচারক বেঞ্চ বলেছেন, ২১ অনুচ্ছেদে "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" বিভিন্ন ধরণের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং কিছুকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদের অতিরিক্ত সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী কোনও আইনের ট্রিপল টেস্ট প্রয়োজন:

(১) এটি অবশ্যই একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে; (২) প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ১৯ নং ধারায় প্রদত্ত এক বা একের অধিক মৌলিক অধিকারের পরীক্ষা প্রতিরোধ করতে হবে যা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে এবং (৩) এটি অনুচ্ছেদ ১৪ এর পরীক্ষা প্রতিরোধ করতে হবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুমোদিত স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকার অবশ্যই সঠিক এবং ন্যায্য হতে হবে এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ আইন ও পদ্ধতি স্বেচ্ছাচারিতা, কল্পিত বা নিপীড়ক হলে চলবে না।

গোপনীয়তার অধিকার - অনুমতিযোগ্য বিধিনিষেধ

নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার গোপনীয়তায় আদালতের মাধ্যমে হস্থক্ষেপ করা যায়।

(১) আইনী বিধান - গোপনীয়তায় আইনী অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কষ্টিপাথর হিসাবে সংবিধান দ্বারা সঠিক যুক্তির উপস্থাপন করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে আইনের অনুপ্রবেশের চাওয়া তার আনুপাতিকতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(২) প্রশাসনিক / কার্যনির্বাহী আদেশ - প্রশাসনিক বা কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের বিষয়ে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

(৩) বিচারিক আদেশ বা পরোয়ানাঃ বিচারিক পরোয়ানা হিসাবে, আদালতের কাছ অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে যে ঠিক কি কারনে কোনো ব্যাক্তির বা সংস্থার গোপনীয়তায় হস্তক্কেপ করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

গোপনীয়তা বিল, ২০১১

বিল বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার গোপনীয়তার অধিকার থাকবে - যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা করা, বা, তার দ্বারা - তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, টেলিফোন কথোপকথন, টেলিগ্রাফ বার্তা, ডাক, ইলেকট্রনিক মেইল ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম সহ; তার ব্যক্তিগত বা তার পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা; তাঁর প্রতি সম্মান এবং সুনামের রক্ষার ক্ষেত্রে; কোনও ব্যক্তি তাঁর বৈধ যগাযোগ বা লেনদেনের ক্ষত্রে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার দ্বারা কৃত অনুসন্ধান নজরদারি থেকে গোপনীয়তা নীতি মেনে চলতে পারেন। ব্যক্তি তার ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেন, ঔষধ এবং আইনি তথ্য এবং স্বতন্ত্র তথ্য সুরক্ষা গোপন করার আধিকার রাখেন। '

- বিল নাগরিক পরিচয় হরণ, অপরাধমূলক পরিচয় প্রতারণা (যখন একটি অপরাধের জন্য আটক অন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় গোপন) সহ, আর্থিক চিহ্নিত চুরি, ইত্যাদি (অন্য ক্রেডিট, পণ্য ও সেবা প্রাপ্ত পরিচয় এর ব্যবহার করে) থেকে সুরক্ষা দেয়।

- বিল সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যোগাযোগের বাধাগুলি নিষিদ্ধ করে।

- বিল অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি যিনি ভারতে ব্যবসার কারনে অবস্থান করছেন কিন্তু ভারতে অবস্থিত সরঞ্জাম ব্যবহার , ডেটা সংগ্রহ করিবেন বা প্রসেসর ব্যবহার করবেন - এই ধরনের ব্যক্তির কোনো ব্যক্তিকে না জানিয়েই সরকার তাঁর পৃথক সংক্রান্ত কোনো তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে পারেন।

- এই বিল ভারতের একটি "ডাটা প্রটেকশন অথরিটি", ডাটা প্রক্রিয়াকরন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিতে উন্নয়ন নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত; আইন পরীক্ষা করা এবং ডেটা সুরক্ষা উপর তার প্রভাব মূল্যায়নের ও সুপারিশ দিতে এবং কোন বিষয় বা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বা সুপারিশ উপস্থাপনা করার দায় ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের।

৪.২.৩.১) ডিজিটাল মাধ্যম ও গোপনীয়তা

ইন্টারনেট একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী যোগাযোগ মাধ্যম এবং একটি বিস্তৃত তবে স্বতন্ত্র ভার্চুয়াল ক্ষেত্র যা মানব ক্রিয়াকলাপকে বিস্তৃত করে তাদের উভয়ই সরবরাহ করে মানব জীবন ও মানব সমাজকে নতুন আকার দিয়েছে। তবুও, কীভাবে ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তি (Information & Communication Technology-ICT)

মত প্রকাশের স্বাধীনতার মানবাধিকারের উপলব্ধি ও গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতার সামাজিক মূল্যকে প্রভাবিত করছে তা এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

তবে, এই বিকশিত ইন্টারনেট ই-সিস্টেমের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হ''ল ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির কারণে মানব জীবনে ঐতিহাসিকভাবে আবদ্ধ সীমানাগুলি ভেঙে যাওয়া। পূর্ববর্তী গোপনীয়তার সীমানার প্রকৃতি, নতুন গোপনীয়তা আক্রমণকারী প্রযুক্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন বডি স্ক্যানার; বক্তৃতা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া; রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) চিপস, যা মানব শরীরে প্রবেশ করানো হতে পারে; ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি); স্মার্ট মিটার; ক্যানভাস আঙুলের মুদ্রণ; এবং ব্রাউজার কুকিজ, যা একাধিক অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করতে সক্ষম। এমনকি আজকাল সর্বাধিক সুরক্ষিত বাড়িও গোপনীয়তায় বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না।

একবিংশ শতাব্দীতে 'গোপনীয়তার মৃত্যুর' অনুমান ১৫ বছর আগে প্রযুক্তির বিকাশে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও দাবিটি কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হচ্ছে, তবু তা সত্য। একইভাবে, বিগত দশকে স্বতন্ত্র গোপনীয়তার জন্য হুমকি মূলত ধীরে ধীরে অফলাইন বা পার্থিব বিশ্ব থেকে একটি অনলাইন, অপার্থিব (ঝত্রন্ঠস্তথন) বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়েছে। তিনটি স্তরে বিষয়টিকে ব্যাখা করা যায়ঃ

ক) ব্যক্তিগত পর্যায়েঃ

সাধারণ ভ্রমণ এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত তথ্য, আমরা ভ্রমণ করি, কেনা, হাঁটছি, বসে আছি, ঘুমাচ্ছি, পড়ছি বা কথা বলছি, পরবর্তী অ্যাক্সেস এবং বিশ্লেষণের জন্য ডিজিটাল আকারে ক্রমশ ক্যাপচার এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সিসিটিভি এবং ভিডিও ক্যামেরা, মাইক্রোফোনস, তাপীয় সেন্সর, নজরদারি উপগ্রহ, ড্রোনস সহ সরকারী এবং বেসরকারী উভয়ই মানুষের বাসস্থানগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণে অবদান রাখে এমন সমস্ত সংবেদনশীল ডিভাইসগুলির সংখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর বৃদ্ধি লক্ষ্য করছি, স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার, স্মার্ট টিভি, পরিধানযোগ্য ডিভাইস এবং অন্তর্নির্মিত আরএফআইডি চিপস। একইভাবে, আমরা জেনেটিক সিকোয়েন্স ডেটা সংগ্রহ, স্টোরেজ এবং প্রসেসিং জড়িত এবং আঙুলের ছাপ-, ফেসিয়াল-, আইরিস-, স্পিচ- এবং মানুষের সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত গাইট-স্বীকৃতিতে জড়িত ডেটা সহ বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির প্রসারণ প্রত্যক্ষ করি।

ফলস্বরূপ, এই জাতীয় ডেটা প্রায়শই ইচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাজনিত তথ্য সুরক্ষা লঙ্ঘনের মাধ্যমে যে কোনও প্রযুক্তি দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হতে পারে এবং তার ব্যাখ্যা করে ভুল কাজে ব্যাবহৃত হতে পারে। তা আবার কখনও কখনও সাধারণ জনগণ সহ অন্যদের কাছেও সরবরাহ করা হয়। স্বয়ংক্রিয় এবং বড় ডেটা প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে তুলনামূলকভাবে ডেটা প্রসেসিং প্রযুক্তিগুলিতে দ্রুত অগ্রগতির মাধ্যমে এ জাতীয় লঙ্ঘনের প্রভাবগুলি আরও বেড়ে যেতে পারে। - যেমন ব্যক্তিগত ডেটা হ্যাক করে ব্যাঙ্ক থেকে টকা হরন।

খ) রাষ্ট্র পর্যায়েঃ

উল্লেখযোগ্য গোপনীয়তা আক্রমণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি (এলইএ) দ্বারা বা জাতীয় সুরক্ষা এবং গনশৃঙ্খলার নামে গোয়েন্দা পরিষেবাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। ডিজিটাল যুগে, বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষগুলি সর্বাধিক সাম্প্রতিক তথ্য প্রযুক্তির দ্বারা সজ্জিত হয়েছে, এই প্রযুক্তি সুচারু পদ্ধতিতে পৃথক নাগরিকদের উপর নজরদারি চালানোর ও পরিচালনা করার জন্য সক্ষম করে তোলে। এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপগুলির অঙ্গ হিসাবে ধরা যেতে পারে বিভিন্ন প্রযুক্তির সংমিশ্রণ যেমন ডেটা ব্যবহারের সাথে জড়িত প্রোফাইলিং, সিসিটিভি সিস্টেম, ম্যালওয়্যার এবং ইনস্টল

করা সেন্সর, বায়োমেট্রিক্স, ডেটা অটোমেটিক্স এবং বড় ডেটা বিশ্লেষণ। জাতীয় সুরক্ষার কারণে গোপনীয়তা বৈধভাবে সীমাবদ্ধ হতে পারে তবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এর মানদণ্ড অনুসারে বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তার আনুপাতিকতার মানদণ্ডগুলি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক ক্ষেত্রে এই শর্তগুলি পূরণ হয় না।

তদ্ব্যতীত, ই-গভর্নেন্সের প্রযোগের কারনে রাষ্ট্র পরিচালকগন বৃহত পরিমাণে ব্যক্তিগত ডেটা পরিচালনা করে। কিন্তু এমন এক বৃহত্তম ডেটা হোস্ট এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ডেটা সর্বদা আক্রমণের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষিত নাও হতে পারে। এছাড়াও বলা যায় , যে সমস্ত ধরণের ব্যক্তিগত ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য রাষ্ট্রগুলির অবিচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব থাকে তা নাগরিকদেরকে খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রাখে যদি ,ডেটা প্রোফাইলের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত আইনী ব্যবস্থা প্রয়োগ না করা হয়।

কেস স্টাডি: আধার তথ্য ফাঁস

২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ঞ্চষ্টব্ধ 'দ্য ট্রিবিউন' নামক সংবাদপত্রের দ্বারা সংঘটিত স্টিং অপারেশনের একটি সংবাদকে ভারতের জনসমক্ষে নিয়ে আসে। সেখানে দেখা যায়, ভারতে "আধার" এর মতো দেশের এক বিরাট বায়োমেট্রিক ডাটাবেসে সুরক্ষাভেদ করা সম্ভব এবং এরফলে পরে শত লক্ষাধিকেরও বেশি ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় চুরি এবং গোপনীয়তার অনুপ্রবেশের সংক্রান্ত ঝুঁকির শিকার হতে পারেন, এতে প্রায় প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে। দ্য ট্রিবিউন পত্রিকা বলেছে যে তার সাংবাদিকরা একজন ব্যক্তিকে প্রায় ৮ ডলার (ভারতীয় মূদ্রার ৫০০ — ৬০০ টাকা) প্রদানের পরে সরকারের ডাটাবেসে ১২-সংখ্যার অনন্য পরিচয় নম্বর লিখে টাইপ করে নাম, ইমেল ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ডাক কোড সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন এই আধার নম্বরের সঙ্গে ভারতের নাগরিকের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, প্যান নম্বর (PAN - Personal Accaount Number) সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ন নথি যুক্ত থাকে।

গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

ইন্টারনেটের উন্মুক্ততা এবং সংযোগের কারণে, আন্তঃদেশীয় অনলাইন গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং সাইবার অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত আক্রমণগুলি যেমন- আন্তঃসীমান্ত অনলাইন জালিয়াতি, ফিশিং, স্ট্যাকিং এবং হয়রানি থেকে নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে হুমকির উদ্ভব হয়, যার ফলে আর্থিক ক্ষতি এবং মানুষের জীবন ক্ষতি সহ বিস্তৃত পরিমাণ ক্ষতির সম্ভাবনা জড়িত।

জাতীয় স্বার্থ জড়িত থাকায় চিত্রটি আরও জটিল হয়ে ওঠে, সেগুলি সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রকৃতির হতে পারে। ক্রমবর্ধমান তথ্য স্থানান্তর সম্পর্কিত আইন ও বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব ছাড়াও, রাষ্ট্রীয় গুপ্তচরবৃত্তির বিস্তৃত অনুশীলন এবং প্রযুক্তিগত সুবিধা ভোগ জাতীয় রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিচালিত বৃহত আকারের ডেটা লঙ্ঘনগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলি উদ্ভূত হয়েছে।

কেস স্টাডিঃ ভারত সরকার ও হোয়াটসাপ

ইস্রায়েলি সফটওয়্যার "পেগাসাসের" মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের উপর চালানো স্পাইওয়্যার হামলার বিবরণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ না করার জন্য ২০১৯ সালের ১লা নভেম্বর ভারত সরকার মার্কিন সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থা হোয়াটসঅ্যাপ এর সমালচনা করে, যদিও তার আগে কয়েক মাসে দু"পক্ষের মধ্যে কমপক্ষে দু"বার উচ্চ

পর্যায়ের বৈঠক হয়। ঐদিন গভীর রাতে জারি করা একটি বিবৃতিতে হোয়াটসঅ্যাপ ভারত সরকারকে পাল্টা বলে যে, তারা মে মাসেই এই সুরক্ষার বিষয়টি দ্রুত সমাধান করেছে এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সরকার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে। যদিও সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তারা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে হোয়াটসঅ্যাপ সিইআরটি-ইন বা ভারতীয় কম্পিউটার জরুরী প্রতিক্রিয়া দলকে মে মাসে জানিয়েছিল যে অ্যাপ্লিকেশনটি বিশ্বব্যাপী হ্যাক হয়েছে এবং তারা বিষয়টি ঠিক করেছে, তারা নয়াদিল্লিকে কী বলতে ব্যর্থ হয়েছে বা এ থেকে লুকিয়েছে যে যে ভারতীয় নাগরিকরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? ভারত সরকার আরওযোগ কর যে মে মাসে মার্কিন সংস্থাটির কাছ থেকে প্যাগাসাসের কথা বা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ফলে যে ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সে সম্পর্কে উল্লেখ না করে বা 'প্রযুক্তিগত দুর্বলতার বিষয়ে' বলা হয়েছিল।

৪.২.৩.২) গোপনীয়তার অধিকার ও ভারতের অবস্থান

এপ্রিল ২০১৩ সালে, ভারত একটি ৭৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সিস্টেম (Central Monitoring System -CMS) বাস্তবায়ন শুরু করে যা সরকারকে দেশের সমস্ত ডিজিটাল যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেবে। ৩২ সিএমএসের আওতাভুক্ত সামগ্রীতে সমস্ত অনলাইন কার্যক্রম, ফোন কল, পাঠ্য বার্তা এবং এমনকি সামাজিক মিডিয়া কথোপকথন। ২০০৯ সাল থেকে এই কর্মসূচির ক্ষেত্র বিকাশের ক্ষেত্রে এখনও নির্ধারিত রয়েছে, তবে এর বাস্তবায়নে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার অভাবের বিষয়ে কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইন্টারনেট এবং সোসাইটি সেন্টারের নীতি পরিচালক পরিচালক প্রনেশ প্রকাশ যুক্তি দেখিয়েছিলেন: 'ভারতে নজরদারি ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কথা বলতে গেলে আমাদের প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছতা এবং খুব কম জবাবদিহিতার মিশ্রণ ঘটে।'

ব্যবস্থার বিরোধী এবং মানবাধিকারের সমর্থকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে সরকার জাতীয় সুরক্ষাকে উন্নত করার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমালোচকদের নজরদারি বা গ্রেপ্তার করার জন্য সিএমএসকে অপব্যবহার করবে। অবশ্যই, ঙ্খণ্ডচ্ছ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করতে পারে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার' নিশ্চয়তা দেয়। উদ্বেগগুলি রয়ে গেছে যে ভারতে বিস্তৃত গোপনীয়তা আইন ব্যতীত সিস্টেমটি যথেষ্ট পরিমাণে দায়বদ্ধ হবে না এবং মুক্ত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে শীতল হতে পারে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সিনিয়র ইন্টারনেট গবেষক সিন্থিয়া ওয়াং বলেছেন: "রাষ্ট্রদ্রোহ ও ইন্টারনেট আইন ব্যবহারের বেপরোয়া ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ শীতল হচ্ছে। সমালোচক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের চিণহিত করতে বিশ্বজুড়ে নতুন নজরদারি ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে।"

এছাড়াও, এপ্রিল ২০১১ সালে পাস হওয়া নতুন আইনগুলি সাইবারক্যাফে ইন্টারনেট নজরদারি প্রসারিত করেছে, বেশিরভাগ ভারতীয় যারা ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা স্মার্টফোন বহন করতে পারে না তাদের অ্যাক্সেসের প্রাথমিক পয়েন্ট হিসেবে সাইবারক্যাফের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি, ভারতীয়দের সিম কার্ড সক্রিয় করতে তাদের প্রকৃত নামগুলি নিবন্ধন করতে হবে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবহারকারীর ডেটা অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য মোবাইল এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারী (আইএসপি) প্রয়োজন। অনলাইনে মুক্ত বক্তৃতাকে বিচারের জন্য এবং রাজনৈতিক সমালোচনা দমন করার জন্য ডেটা ব্যবহার করা হলে ব্যবহারকারীর ডেটা অনুরোধ করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাথমিকভাবে সংশয়বাদী হবার পর ভারত এখন বৈশ্বিক ইন্টারনেট পরিচালনার জন্য শীর্ষ-সরকার-নেতৃত্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বানকে প্রতিহত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং আমেরিকার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দুবাইতে আন্তর্জাতিক টেলিযোগযোগ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে, ইইউ সদস্য দেশসমূহ এবং আমেরিকার সাথে বর্তমান

মাল্টিস্টেকহোল্ডারের স্থিতিশীলতা সমর্থন করার ক্ষেত্রে খুব অল্প সংখ্যক দেশ গুলির মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম। এটি ভারতে একটি বিতর্কের ফলাফল ছিল, যেখানে ইন্টারনেটের স্বাধীনতা প্রয়োজন ছিল নাকি সুরক্ষার জন্য ইন্টারনেটে ভয়ঙ্কর হুমকির থেকে সুরক্ষার জন্য তাঁর নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন।

২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পরে ভারতের দ্বিধা আরও বেড়ে যায় যখন তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের সেক্রেটারি জায়েদার সিং ইন্টারনেটকে 'একটি বাহন এবং অপরাধী মনের লক্ষ্য উভয়ই' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। সুরক্ষা এবং স্প্যাম নিয়ে উদ্বেগ ভারতকে আরও জাতীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন করেছিল ইউনাইটেড নেশনস কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট পরিচালনার উপরে, এর শুরুর দিকে ভারতের নাইরোবিতে ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিল সহ - ইন্টারনেট পরিচালনার বিতর্কে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুইং রাষ্ট্র - একই ধরণের উদ্যোগের প্রস্তাব করেছিল।

চীন ও ইরানের মতো - যেমন ডিজিটাল স্বাধীনতার ঘরোয়া ট্র্যাক রেকর্ডধারী দেশগুলি - যেমন শীর্ষ-নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে দীর্ঘকালীন সমর্থন করা হয়েছে এবং ইন্টারনেটের উন্মুক্ততা এবং অনলাইনে মানবাধিকারের অনুশীলনের জন্য সরাসরি হুমকির উপর খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রক্রিয়া জাতীয় সরকারগুলির হাতে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর একটি কার্যনির্বাহী দলের যুক্তরাষ্ট্র একটি কার্যনির্বাহী দলের সাথে সম্মত হয়ে কূটনৈতিকভাবে ভারতের উদ্বেগের সমাধান করার চেষ্টা করেছিল।

এটা ইতিবাচক যে ভারত এখন আরও শীর্ষ-নিম্ন ষ্ট্রেদ্ম- ঈদ্রন্দ্রদ্র) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আহ্বানের বিরুদ্ধে ইন্টারনেট পরিচালনার মাল্টিসিস্টোল্ডার মডেলকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক। তবুও, এটি স্পষ্ট যে বিশ্বের জনসংখ্যাইয় ষষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের স্বাধীনতা রক্ষা করা ভারতের সরকারের পক্ষে কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে এটিও নিশ্চিত করে যে এর ঘরোয়া রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে দাঁড়িয়েছে এবং বাকী বিশ্বের কাছে তা একটি মডেল।

ভারত আজ কেবল তার ১০ শতাংশ ব্যবহারকারীর জন্য ইন্টারনেট নীতি নির্ধারণ করছে না, তবে এখনও তার ১ বিলিয়ন নাগরিকের জন্য অনলাইনে আসতে পারে না। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রেই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আঞ্চলিক প্রতিবেশী এবং অন্যান্য উদীয়মান গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে শক্তিশালী নজির স্থাপন করবে।

কেস স্টাডিঃ রতন টাটা ও নীরা রডিয়া বিতর্ক

ঘটনাটি ভারতের রাজনৈতিক ও কর্পোরেট লবিস্ট নীরা রাডিয়া, তদানীন্তন ভারতীয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ রাজা এবং প্রবীণ সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির মধ্যে টেলিফোনিক কথোপকথনের সাথে সম্পর্কিত, যা ২০০৮ — ২০০৯ সালে ভারতীয় আয়কর বিভাগ দ্বারা টেপ করা হয়েছিল। টেপগুলি সংবাদপত্রগুলিতে ফাঁস হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মিডিয়া আউটলেট দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলি দেখিয়েছিল। টেপগুলিতে প্রকাশিত সংবাদগুলি এই অনেক লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল। নীরা রাদিয়া বৈষ্ণবী কমিউনিকেশন' নামে একটি জনসংযোগ সংস্থা চালাতেন, যার ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল রতন টাটার 'টাটা টেলিসার্ভিসেস' এবং মুকেশ আম্বানির 'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ'। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়ার পরে, ভারতীয় আয়কর বিভাগ সম্ভাব্য অর্থ পাচার, সীমাবদ্ধ আর্থিক চর্চা এবং কর ফাঁকি দেওয়ার তদন্তের অংশ হিসাবে ২০০৮-২০০৯ সালে ৩০০ দিনের জন্য রাডিয়ার ফোন লাইনগুলি ট্যাপ করেছিল। ২০১০ সালের নভেম্বরে, ওপেন ম্যাগাজিন একটি খবরে প্রবীণ সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং কর্পোরেট হাউসগুলির সাথে নীরা রাডিয়ার কয়েকটি টেলিফোন কথোপকথনের প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ঘোষণা করে যে তাদের কাছে

রাডিয়ার ফোনের কথোপকথনের ৫,৮৫১ টি রেকর্ডিং রয়েছে, যার মধ্যে ২ জি স্পেকট্রাম বিক্রয় সম্পর্কিত রেডিয়া ব্রোকারের ব্যবসায়ের রূপরেখা বোঝা যায়। টেপগুলি প্রকাশ করে যে কীভাবে রাডিয়া টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী হিসাবে এ রাজাকে নিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কিছু মিডিয়া ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

ইতিমধ্যে রতন টাটা তাঁর কর্পোরেট সংযোগকারী হিসাবে নীরা রাডিয়ার সঙ্গে তার কথোপকথনের বিবৃতি প্রকাশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের গিয়েছিলেন। রতন টাটা তাঁর গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে তার পিটিশন জমা দেয়। কিন্তু রাডিয়া বিতর্ক এতদূর গড়িয়েছিল যে সেটি কেবলমাত্র রতন টাটার ব্যক্তিগত জীবনের আঙিনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহত্ত জনস্বার্থে তা প্রকাশ করার প্রাসংগিকতা ছিল। সেক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক প্রশ্ন যা জিজ্ঞাস্য ছিল তা হ"ল টাটার কথোপকথন তথ্যের অধিকার, ২০০৫ আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, বা তার কথোপকথনগুলি ধারা ৮ (জে)-তে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্যের ছাড়ের আওতায় আসবে ! এই ছাড়ের কাঠামোটি লক্ষ করা আকর্ষণীয়। 'বা' এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা আইনটি পরামর্শ দেয় যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপর অযৌক্তিক আক্রমণ আক্রমণ ছাড় পেতে পারে, এমনকি তথ্যের জনসাধারণের কার্যকলাপ বা আগ্রহের সাথে সম্পর্ক থাকলেও। এবং সতর্কবাণী বলছে যে বৃহত্তর জনস্বার্থ এমনকি নিখুঁতভাবে ব্যক্তিগত তথ্যের প্রকাশকেও ন্যায়সঙ্গত করতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞ আইনত মতামত অনুসারে, রতন টাটা এবং নীরা রাডিয়ার মধ্যে কথোপকথনের বিবরণ প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য ভারতের সর্বোচ্চ আদালত তার এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে।

৪.২.৪) ডিজিটাল মাধ্যম ও নজরদারী

আইনের অস্পষ্টতার কারণে মানুষকে নিরীহ পোস্ট ও টুইটের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তথ্য প্রযুক্তি আইন (আইটি আইন) এবং ২০০৮ এর সংশোধনীগুলি "কী আপত্তিকর" তা সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট আইনী সংজ্ঞা প্রদান করে না এবং অনলাইনে এবং অফলাইনে কী বলা যায় বা বলা যায় না সে সম্পর্কে সমাজে সাধারণ মতামত নেই, যা অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। এটি 'আপত্তিকর' বলে মনে করা এবং এটিকে অপসারণের দাবি জানানোর প্রতিবেদন করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার ফলস্বরূপ।

সামাজিক মাধ্যমের বিষয় অপসারনের অনুরোধ (Take Down Request):

তথ্য প্রযুক্তি আইনের ২০০৮ সংশোধনীতে, সরকার আইটি আইনের ৭৯ নং ধারার অধীনে মধ্যস্থতাকারীর দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধকরণ এবং নোটিশ এবং সরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে মান্যতা দেওয়া হয়। এটি আইনটি আপত্তি কমাতে এবং মধ্যস্থতাকারীদের সুরক্ষার জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। মানহানি এবং গণশৃঙ্খলা সম্পর্কিত অস্পষ্ট আইনগুলির কারণে ভারতে মধ্যস্থতাকারী দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি বিশেষত জটিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে" বাক স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুরক্ষাটিকে ২০১১ সালে তথ্যপ্রযুক্তি ওমধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকাগ্ন বিধিমালা জারি করার জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই পদক্ষেপের পিছনে একটি প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ২০১১ এর আইটি বিধি বলে অভিহিত - মধ্যস্থতাকারীদের যদি লঙ্ঘনকারীকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে বিষয়বস্তু অপসারণ করতে হয় যদি বিষড়বস্তু আপত্তিজনক হিসাবে চিনহত হয়।

এই প্রবণতাটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি মানদণ্ড হ"ল গুগল স্বচ্ছতা প্রতিবেদন, যেখানে আদালতের আদেশ ছাড়াই জারি করা টেকডাউন অনুরোধের সংখ্যায় ভারতে সব থেকে বেশী। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আদালতের আদেশ ছাড়াই তাদের অনেকগুলি বিষ্যবস্তু অপসারণের অনুরোধকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগকে উদ্ধৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় কম্পিউটার জরুরী প্রতিক্রিয়া দল জনসাধারণের আদেশ

হিসেবে এবং জাতিগত অপরাধ আইনকে সামনে রেখে 'একটি সংখ্যালঘু গষ্ঠীর নিরপরাধতা' সংক্রান্ত 'ভিডিও ক্লিপগুলি অপসারনের একটি অনুরোধ জারি করে। ভিডিও ক্লিপগুলি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল এবং গুগল স্থানীয়ভাবে ইউটিউব এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ইউটিউব ভিডিও এবং মন্তব্য থেকে রেখে 'একটি সংখ্যালঘু গষ্ঠীর নিরপরাধতা' ভিডিও ক্লিপগুলিকে সীমাবদ্ধ করেছিল।

গুগল একমাত্র সংস্থা নয় যেগুলি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিষয় অপসারনের অনুরোধগুলির সাথে কাজ করে। ছোট ছোট স্টার্ট-আপগুলি এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের জন্য, বিপুল সংখ্যক বিষয় অপসারনের অনুরোধগুলি জরিমানার ভয়ে অতিরিক্ত মেনে চলে। আইটি অ্যাক্টের ফলাফল হল গুগল, ফেসবুক বা মাউথশুট ডটকমের মতো বেসরকারী দলগুলিতে সেন্সর দেওয়ার এবং নাগরিকদের মুক্ত বক্তব্য সীমাবদ্ধ করার জন্য বা অন্যথায় ব্যবহারকারীর সামগ্রীতে আইনী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে

পরিশুদ্ধ ও অবরুদ্ধতা (Filtering & Blocking)

ভারতে ওয়েবসাইটগুলি ব্যাপক হারে অবরুদ্ধ এবং ফিল্টারিংয়ে জড়িত। ভারতীয় কম্পিউটার এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া টিম ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইটগুলি ব্লক করার জন্য নির্বাহী আদেশ দিতে সক্ষম। সেন্সর করা সাইটগুলির পরিসরটি বেশ বিস্তৃত এবং মানবাধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে উগ্রবাদ এবং অশ্লীলতার সম্পর্কিত বিষয় গুলি থাকে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, ভারতীয় কম্পিউটার এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া দল (Emergency Response Team-ICERT) এর সহায়তায় আদালতের নির্দেশনা ব্যতীত, ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের চিনহিত করে কন্টেন্ট ফিল্টার করার আদেশ দিতে সক্ষম।

সীমাবদ্ধ সংখ্যক নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ICERT -তে তদন্তের জন্য সরকারী অভিযোগ এবং সুপারিশ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ, সরকারী সংস্থা এবং "সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনও সংস্থা"। বিনিময়ে, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গুলিকে ICERT থেকে ব্লক করা আদেশ মেনে চলতে হবে। ২০০০ সাল থেকে, ব্লক করার অনুরোধগুলি ব্যক্তিগতভাবে আপত্তিকর বা অশ্লীল বলে বিবেচিত সামগ্রীর প্রতিবেদন করার ব্যক্তিদের থেকেও আসতে পারে। ফিল্টারিং নোটিশ জারির জন্য সরকার বা বিচার কর্তৃপক্ষের উপর চাপ তৈরি করার জন্য ব্যক্তিরা জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমার আবেদনটি পূরণ করে এটি করতে পারে। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে।

নেটওয়ার্ক বিঘ্ন (Network disruptions)

নেটওয়ার্ক বিঘ্ন ভারতের একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় আছে। ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বন্দধ ছিল। ভাবা হয়েছিল যে মোবাইল ফোনকে ব্যবহার করে বোমা বিস্ফওরন ঘটনো হতে পারে জম্মু ও কাশ্মিরে। সরকার নেটওয়ার্ক পরিষেবা সরাসরি স্থগিত করে। মিডিয়ার ও স্থানীয় টেলিভিশন স্টেশনের সঙ্গে মত প্রকাশেও সরাসরি সেন্সরশিপ নিযুক্ত হয়। কয়েকটি ফেসবুক পৃষ্ঠা সরিয়ে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে লিখিত বার্তা অবরোধ এবং স্থানীয় সংবাদপত্রেও নজরদারী চলে।

কেস স্টাডি: 'ফেসবুক গ্রেপ্তার'

রবিবার ১৮ নভেম্বর ২০১২, শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় মুম্বাইয়ের এক ২১ বছর বয়সী মহিলা শাহীন ধদা শহর বন্ধের বিষয়ে ফেসবুকে তার মতামত জানিয়েছেন। তার বন্ধু রেনু শ্রীনীবাসন তার পোস্টটি 'পছন্দ করেছে'। পরদিন সকাল ১০.৩০ টায় তারা দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আদালত তাদের ১৪

দিনের জেল খাটানোর আদেশ দিয়েছিল। কয়েক ঘন্টা পরে, তাদের শেষ পর্যন্ত জামিনে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার টাকার দুটি বন্ড প্রদানের পরে। ১৫,০০০ (১৪৫ ডলার) প্রতিটি।

ধদা পোস্ট করেছিলেন, 'শ্রদ্ধা অর্জিত হয়, দেওয়া হয় না এবং অবশ্যই বাধ্য হয় না। আজ মুম্বই ভয়ের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, শ্রদ্ধার কারণে নয় '। স্থানীয় শিবসেনার এক নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ধাদা ও শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ২৯৫-এর আওতায় মামলা করা হয়েছে, 'ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষমূলক কাজ করার জন্য, যার দ্বারা ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে ধর্মীয় অনুভূতি বা কোনও শ্রেণীকে বিক্ষোভ করার উদ্দেশ্যে। 'পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে' ক্লাসের মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা দুর্বলতা তৈরি বা প্রচার করার 'বক্তব্য দেওয়ার জন্য আইপিসির ৫০৫ (২) এর অধীনেও অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং পুলিশ অভিযোগ আইনে আইটি আইনের Section ৬৬ এ ধারা যুক্ত করেছে

৪.২.৫) সাইবার অপরাধ

সংজ্ঞাঃ

ইন্টারনেট কম্প্যুটারে তৈরি বিশ্ব সাইবারস্পেস হিসাবে পরিচিত এবং এই এলাকা নিয়ন্ত্রক আইন সাইবার আইন নামে পরিচিত এবং এই স্থান ব্যবহারকারীদের এই আইনের চৌহদ্দির অধীন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাইবার আইন কম্পিউটার ও ইন্টারনেট যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রক আইন। কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেট অপব্যবহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে তার আচরণ হল সাইবার অপরাধ। ''তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০'' এবং ''তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনী আইন'', ২০০৮ সালে বিস্তারিত এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক অপরাধের সঙ্গে তার আচরণ আইন সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে ও মোকাবেলা করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধ সংজ্ঞায়িত করতে আমরা বলতে পারি, এটা ঠিক অপরাধ এবং কম্পিউটার এর সংমিশ্রণ। সহজ শর্তে ''কোনো অপরাধ বা অপরাধ যা একটি কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় সাইবার অপরাধ'' থেকে এটা করা। মজার ব্যাপার এমনকি চুরি বা পকেট বাছাই মত একটি ক্ষুদ্র অপরাধ সাইবার অপরাধের বৃহত্তর আওতায় আনা সম্ভব যদি এই ধরনের কোন অপরাধে মূল ডেটা বা এইড একটি কম্পিউটার বা একটি কম্পিউটার ব্যবহার (বা অপব্যবহার) প্রতারণার দ্বারা সঞ্চিত একটি তথ্য। তথ্যপ্রযুক্তি আইনে একটি কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য, তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানের যে সাইবার অপরাধ, আকারে অংশ সম্পর্কে আমরা এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে সংজ্ঞায়িত করে। সাইবার অপরাধ, কম্পিউটার বা তথ্য নিজেই লক্ষ্য বা অপরাধ বস্তু বা, কিছু অন্যান্য অপরাধ যে অপরাধ জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদানে একটি হাতিয়ার হবে। অপরাধের সব ধরনের কাজ সাইবার অপরাধের বৃহত্তর সংজ্ঞার আওতায় আসতে হবে।

সাইবার অপরাধের ধরনঃ

কিছু সাধারণ সাইবার অপরাধ নিম্নরূপঃ

- হ্যাকিং

হ্যাকার এমন একটি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, যিনি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস অর্জন করতে নিজের জ্ঞান ব্যবহার করেন।

- ক্র্যাকিং

অন্যদিকে, ক্র্যাকারগুলি ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির জন্য নেটওয়ার্কটিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে তথ্য ব্যবহার করে।

- ভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাস এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা জ্ঞান ছাড়াই নিজেই অনুলিপি করতে পারে এবং একটি কম্পিউটারকে সংক্রামিত করতে পারে। ভাইরাসগুলি হ্যাকাররা ব্যবহারকারীর কম্পিউটারকে সংক্রামিত করতে এবং ক্ষতিকারক কোড বহনকারী ভাইরাসগুলিতে নদ্রথত্ম পেলোড দ্র ব্যবহার করে কম্পুরের সংরক্ষণ করা ডেটা ডেটা ব্যবহার করে।

- ডেটা ডিড্ডিলিং

এই ধরণের আক্রমণে কম্পিউটারের সাথে কম্পিউটারের প্রক্রিয়াজাত হওয়ার ঠিক আগে কাঁচা তথ্য পরিবর্তন করা এবং প্রক্রিয়াকরণটি কমপ্লিট হওয়ার পরে এটি আবার পরিবর্তন করা জড়িত রয়েছে ভারতের বিদ্যুৎ বোর্ডগুলি ডেটা ডিড্ডিলিং অগ্রগতির শিকার হয়েছে। বেতন নির্ধারণ, বা বুক-রক্ষণ এবং নিরীক্ষণের বিধি নিষ্ক্রিয় করা। প্রাইভেট পার্টিগুলি যখন তাদের সিস্টেমগুলি কম্পিউটারীকরণ করছিল, তখন মিশ্রণগুলি উদাঃ মোডি নিং গ্রেড, ক্রেডিট রেটিং পরিবর্তন করা, সুরক্ষা ছাড়পত্রের তথ্যের পরিবর্তন করা।

- ইমেল বোমা ফেলা

ইমেল বোমা ফাটলকে ভুক্তভোগীর ইমেল অ্যাকাউন্টে (কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে) বা মেল সেরে (কোনও সংস্থা বা কোনও ইমেল পরিষেবা সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে) দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে বিপুল সংখ্যক ইমেল প্রেরণকে বোঝায়।

- লজিক বোমা

প্রোগ্রামে যখন কোনও নির্দিষ্ট যৌক্তিক অবস্থা দেখা দেয় তখন ক্ষতির (পেডলোড) সরবরাহ করা হয়: উদাঃ বেতন তালিকাতে লেখকের নাম না থাকা। লজিক বোমা এক ধরণের ট্রোজান হর্স; টাইম বোমা এক ধরণের লজিক সমাধি। বেশিরভাগ ভাইরাস হ”ল লজিক বোমা।

- ফ্রেইক

একটি ফ্রেইক হ”ল এমন ব্যক্তি যিনি নিখরচায় দীর্ঘ দূরত্বের ফোন কল করতে বা ফোন লাইনগুলি ট্যাপ করার জন্য অবৈধভাবে টেলিফোন নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেন। সাইবার পদে। ফ্রেইক হ”ল যে কোনও ব্যক্তি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা ভঙ্গ করে বা ভাঙার চেষ্টা করে।

- সাইবার সন্ত্রাসবাদ

সম্পত্তির ক্ষতিগ্রস্থ বা ক্ষতিকারক প্রভাব তৈরির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ইচ্ছাকৃত নেতিবাচক এবং ক্ষতিকারক ব্যবহার, অন্যের স্পষ্ট বা অদৃশ্য নদ্রত্রঠত্র উদাহরণস্বরূপ, একটি কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করা এবং তারপরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগীদের দরকারী এবং মূল্যবান ব্যবসায়ের তথ্য মুছে ফেলা সাইবার সন্ত্রাসবাদের অংশ এবং অংশ। সাইবার সন্ত্রাস হ”ল শারীরিক, বাস্তব-জগতের ক্ষতি বা অবকাঠামোগত মারাত্মক ব্যাহত হওয়ার লক্ষ্যে একটি টার্গেটের কম্পিউটার এবং তথ্য, বিশেষত ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এটি কম্পিউটারের সিস্টেমগুলিতে হ্যাকিং, দুর্বল নেটওয়ার্কগুলিতে ভাইরাস

প্রবর্তন, ওয়েব সাইটকে তলান করা, পরিষেবা অস্বীকার-সংক্রান্ত আক্রমণ, ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী হুমকি, ই-গভর্নমেন্ট বেসকে ধ্বংস করা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে।

- স্প্যামিং

পণ্য বা পরিষেবা বিক্রয় করার জন্য (বা কখনও কখনও ভ্রষ্ট গ্রাহকদের প্রতারণা করতে) ইচ্ছুক ই-মেইলের একটি জনপ্রিয় নাম। আপনার দ্বারা তিনি ভুল সনাক্তকরণ ব্যবহার করে।

- স্পুফিং

সাধারণত কোনও টিসিপিআইপি প্যাকটিতে ভুল উতন্ন ঠিকানা রাখার মতো বৈদ্যুতিন অপ্রয়োজনীয়তার জন্য প্রয়োগ করা হয়। অনেক ব্যবহৃত

সেখানেঅস্বীকৃত-পরিষেবা (ডিওএস) এবং বিতরণ অস্বীকারের পরিষেবা (ডিডিওএস) আক্রমণে। একটি স্পোফড ই-মেইল এক হতে পারে, যা এর উতকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। এটি এর উতটি পৃথক হতে দেখায় যা থেকে এটি উতন্ন।

- ফিশিং

ভুয়া বা স্পোফড ই-মেইল বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যা ক্ষতিগ্রস্থদের অনুপ্রবেশ, আর্থিক জালিয়াতির পরিচয় চুরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা প্রকাশের লগনে বা সুরক্ষিত গোপনীয় তথ্যগুলিতে ভ্রান্ত করার জন্য কোনও অফিসিয়াল যোগাযোগ বা পৃষ্ঠা নকল করে বা নকল করে।

- ইন্টারনেট ফর্মিং

গ্রাহক দ্বারা ব্যবহৃত ওয়েবসাইটটিকে অন্য বোগাস ওয়েবসাইটে পুনর্নির্দেশ করা হচ্ছে ভুক্তভোগীর ডিএনএস সার্ভারকে হাইজ্যাক করে (তারা প্রকৃত ঠিকানাগুলিতে ইন্টারনেটের নামগুলি সমাধান করার জন্য দায়বদ্ধ কম্পিউটার) এবং তার আই। পি পরিবর্তন করে ডিএনএস সার্ভার চালাকি করে ভুয়া ওয়েবসাইটের ঠিকানা। এই অননুমোদিত তথ্য অর্জনের জন্য ব্যবহারকারীর আসল ওয়েবসাইটটিকে একটি মিথ্যা বিভ্রান্তিকর ওয়েবসাইটে পুনঃনির্দেশ করে।

- মহিলাদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ
- ই-মেল এবং এসএমএসের মাধ্যমে হয়রানিঃ

কিছু সাইবার অপরাধ রয়েছে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের লক্ষ্য করে করা হয়। তারা হ''ল, ই-মেল এবং এসএমএসের মাধ্যমে হয়রানি কোনও নতুন ধারণা নয়। এটি চিঠির মাধ্যমে হয়রানির সাথে খুব মিল। হয়রানির মধ্যে হুমকি দেওয়া, হুমকি দেওয়া, অশ্লীল ছবি ও বার্তা দিয়ে গালি দেওয়া এবং এমনকি প্রতারণা করা অন্তর্ভুক্ত। ই-হয়রানি চিঠি হয়রানির অনুরূপ তবে একটি নকল আইডি থেকে পোস্ট করার সময় প্রায়শই সমস্যা তৈরি করে।

- সাইবার স্টকিংঃ

কাউকে বিরক্ত করতে ইন্টারনেট বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার করা হচ্ছে সাইবার স্টকিং। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার।

বিশেষত ইন্টারনেট, কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তির একটি দল দ্বারা, অন্য কোনও ব্যক্তিকে, ব্যক্তিদের একটি দলকে বা

সংস্থাকে হয়রান করতে সাইবার স্টকিং নামে পরিচিত। সাইবার স্টকিংয়ের সাথে জড়িত, আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শ বুলেটিন বোর্ডগুলিতে বার্তা পোস্ট করে ইন্টারনেট জুড়ে একজনের চলন অনুসরণ করে।

চ্যাট-রুমে প্রবেশ করে ভুক্তভোগী প্রায়শই আসেন এবং প্রতিনিয়ত ইমেল সহ শিকারটিকে বোমা মারেন। প্রধান লক্ষ্যগুলি বেশিরভাগ মহিলা, শিশুরা গতিশীল দুর্বল বা অস্থির। সাইবার স্টকাররা ওয়েবসাইটগুলি, চ্যাট রুম, আলোচনার ফোরাম, উন্মুক্ত প্রকাশনা ওয়েবসাইটগুলি (যেমন ব্লগ) এবং ইমেলের মাধ্যমে তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের টার্গেট করে এবং হয়রান করে।

- সাইবার পর্নোগ্রাফিঃ

পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট, কম্পিউটার ব্যবহার করে উতাদিত অশ্লীল ম্যাগাজিনগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে (মেটালাল এবং ইন্টারনেট প্রকাশ এবং মুদ্রণ করার জন্য (পর্নোগ্রাফিক ছবি, ফটো, উইটিং ইত্যাদি ডাউনলোড এবং প্রেরণ করতে)। পর্নোগ্রাফিক সামগ্রীগুলি আরও দ্রুত এবং সস্তায় ওএস হিসাবে নতুন নতুন মিডিয়া পুনরুতাদন করা যেতে পারে ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক এবং সিডি-রোম।

- সাইবার মানহানি

মানবাধিকার ও মানহানি সহ সিবিআর নির্যাতন জালে নারীদের বিরুদ্ধে আরেকটি সাধারণ অপরাধ। এটি তখন ঘটে যখন কম্পিউটার এবং / অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যে মানহানি ঘটে, যেমন। কেউ ওয়েবসাইটে কোনও ব্যক্তিকে মানহীন বিষয় প্রকাশ করে বা মানহীন মাটিওযুক্ত ইমেলগুলি প্রেরণ করে।

- মরফিং

মূল ছবিটি সম্পাদনা করছে। এটি সনাক্ত করা হয়েছিল যে নারীদের ছবিগুলি ভুয়া ব্যবহারকারীরা ডাউনলোড করে এবং এডিট করার পরে ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে আবার অ্যাফেরেন্ট ওয়েলসাইটগুলিতে পুনরায় পোস্ট / আপলোড করা হয়। লঙ্ঘনকারীকে আইপিসির অধীনেও বুক করা যায

সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রঃ

১। কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ।

২। সম্পত্তির সাপেক্ষে সাইবার অপরাধ।

৩। সরকারের বিরূদ্ধে সাইবার অপরাধ,

৪.২.৫.১ সাইবার আইনের গুরুত্ব

ক। আমরা অত্যন্ত ডিজিতালাইসড বিশ্বে বসবাস করছি।

খ। সকল কোম্পানিগুলি তাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে এবং বৈদ্যুতিন আকারে তাদের মূল্যবান তথ্য রাখে।

গ। আয়কর রিটার্ন, কোম্পানি আইন ফরম ইত্যাদি সহ সরকার গঠন এখন ইলেকট্রনিক ফর্ম পূরণ করা হয়।

ঘ। উপভক্তাগনের ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

ঙ। অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্রেডিট কার্ড ইমেইল, সেল ফোন এবং ছ্বচ্ছ বার্তা ব্যবহার করছেন যোগাযোগের জন্য।

চ। অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা।

ছ। এমনকি 'অ-সাইবার ক্রাইম' ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ কম্পিউটারের পাওয়া যায় / সেল ফোন বিবাহবিচ্ছেদ, খুন, অপহরণ ক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধ, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম, জাল মুদ্রা ইত্যাদি।

জ। যেহেতু এটা লেনদেন এবং ক্রিয়াকলাপ সব দিক স্পর্শ উপর এবং ইন্টারনেট বিষয়ে, ওয়ার্ল ওয়াইড ওয়েব এবং সাইবারস্পেস তাই সাইবার আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪.২.৫.২) তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০

২০০০ সালের ১৭ অক্টোবর তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০, এর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। ভারতে সাইবার অপরাধ ও ইলেকট্রনিক বাণিজ্য নিয়ে কাজ করে এই আইনটি।

তথ্য প্রযুক্তি প্রযুক্তি আইন, ২০০০; সাধারণভাবে 'বৈদ্যুতিন বাণিজ্য' অর্থাৎ বৈদ্যুতিন তথ্য বিনিময় এবং বৈদ্যুতিন যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে পরিচালিত লেনদেনের জন্য আইনী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি আইন, যা কাগজ-ভিত্তিক বিকল্পগুলির(অন লাইন) ব্যবহারের সাথে জড়িত তথ্য এবং যোগাযোগের সংরক্ষণের পদ্ধতি, সরকারী সংস্থাগুলির কাছে নথিপত্র বৈদ্যুতিন ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ভারতীয় প্রমাণ আইন, ১৮৭২, ব্যাংকার্স বই প্রমাণ আইন, ১৮৯১ এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইন, সংশোধন করার জন্য ১৯৩৪ এবং এর সাথে যুক্ত বা ঘটনামূলক বিষয়গুলির জন্য প্রযোজ্য।

তথ্য প্রযুক্তি প্রেক্ষাপটঃ

১৯৯৬ সালে, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন (ইউনিসিট্রাল) বিভিন্ন দেশে আইনে অভিন্নতা আনতে বৈদ্যুতিন বাণিজ্য (ই-বাণিজ্য) সম্পর্কিত মডেল আইন গ্রহণ করে।

অধিকন্তু, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সুপারিশ করেছিল যে সমস্ত দেশকে তাদের নিজস্ব আইনে পরিবর্তন করার আগে এই মডেল আইনটি বিবেচনা করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ পাস করার পরে সাইবার আইন সক্ষম করতে ভারত দ্বাদশ দেশে পরিণত হয়েছিল।

প্রথম খসড়াটি ভারত সরকার বাণিজ্য মন্ত্রক, ইকমার্স আইন, ১৯৯৯ হিসাবে তৈরি করার সময়, এটি 'তথ্য প্রযুক্তি বিল, ১৯৯৯' হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং ২০০০ সালের মে মাসে পাস হয়েছিল।

তথ্য প্রযুক্তি আইনের উদ্দেশ্যসমূহঃ

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ তথ্য এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমের যোগাযোগের বা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য লেনদেনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লেনদেনের আইনি স্বীকৃতি সরবরাহ করে।

এর মধ্যে সরকারী সংস্থাগুলির সাথে কাগজপত্রের বৈদ্যুতিন ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে একটি কাগজ-ভিত্তিক যোগাযোগের তথ্য এবং তথ্য সংরক্ষণের বিকল্পের ব্যবহার জড়িত।

আইনের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

১। পূর্ববর্তী কাগজ-ভিত্তিক যোগাযোগের পদ্ধতির জায়গায় ডেটা বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যম বা ই-কমার্সের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন বিনিময়য়ের মাধ্যমে সম্পন্ন সমস্ত লেনদেনকে আইনগত স্বীকৃতি দান।

২। আইনি প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয় এমন কোনও তথ্য বা বিষয়গুলির প্রমাণীকরণের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলিকে আইনি স্বীকৃতি দান।

৩। সরকারী সংস্থাগুলি এবং বিভাগগুলিতে ইলেক্ট্রনিক ফাইলগুলি নথিপত্র সরবরাহ করার সুবিধার্থে আইনি স্বীকৃতি দান।

৪। ডেটার বৈদ্যুতিন স্টোরেজ সুবিধার্থে,

৫। এবং ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তহবিলের বৈদ্যুতিন স্থানান্তরকে সহজতর করার আইনী অনুমোদন দান।

৬। ইলেক্ট্রনিক আকারে অ্যাকাউন্টের বই রাখার জন্য প্রমাণ আইন, ১৮৯১ এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে ব্যাংকারদের আইনী স্বীকৃতি প্রদান।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক। সুরক্ষিত বৈদ্যুতিন চ্যানেলের মাধ্যমে করা সমস্ত বৈদ্যুতিন চুক্তি আইনত বৈধ।

খ। ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলির জন্য আইনী স্বীকৃতি।

গ। বৈদ্যুতিন রেকর্ড এবং সুরক্ষার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘ। আইনের অধীনে তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের একটি পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ঙ। আইনের অধীনে সাইবার নিয়ন্ত্রক আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান। আরও, এই ট্রাইব্যুনাল কন্টোলার বা অ্যাডজুডিশাইটিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে করা সমস্ত আপিল পরিচালনা করবে।

চ। সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল কেবল হাইকোর্টে সম্ভব।

ছ। ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলি একটি অসম্পূর্ণ ক্রিপ্টোসিস্টেম এবং হ্যাশ ফাংশন ব্যবহার করবে

জ। প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের কাজ লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্টোলার অফ সার্টিফাইজিং অথরিটিজ (সিসিএ) নিয়োগের বিধান। সমস্ত ডিজিটাল স্বাক্ষরের ভান্ডার হিসাবে কাজ করতে নিয়ন্ত্রক।

ঝ। আইনটি ভারতের বাইরে করা অপরাধ বা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

ঞ। সিনিয়র পুলিশ অফিসার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা যে কোনও সরকারী স্থানে প্রবেশ করতে পারেন এবং ওয়ারেন্ট ছাড়াই অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার করতে পারেন

ট। কেন্দ্রীয় সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারীকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি সাইবার রেগুলেশনস উপদেষ্টা কমিটি গঠনের বিধানসমূহ।

প্রযোজ্যতা

ধারা ১ (২) অনুসারে আইনটি পুরো দেশ পর্যন্ত প্রসারিত, যার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরও অন্তর্ভুক্ত। জম্মু ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনটি সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেছে। তদ্ব্যতীত, এটি নাগরিকত্বকে আমলে নেয় না এবং অতিরিক্ত-অঞ্চলীয় এখতিয়ার সরবরাহ করে।

ধারা ১ (২) এর সাথে ধারা ৭৫ এর সাথে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই আইনটি ভারতের বাইরেও যে কোনও অপরাধ বা লঙ্ঘনের জন্য প্রযোজ্য। এই অপরাধটি সংঘটিত ব্যক্তিদের আচরণে যদি কোনও কম্পিউটার বা কম্পিউটারায়িত সিস্টেম বা ভারতে অবস্থিত নেটওয়ার্ক জড়িত থাকে, তবে তার জাতীয়তা নির্বিশেষে, ব্যক্তি আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব এই বিধানের একমাত্র সীমাবদ্ধতা।

অ-প্রযোজ্যতা

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর ধারা ১ (৪) অনুসারে এই আইনটি নিম্নলিখিত নথিগুলিতে প্রযোজ্য নয়:

১। চেক ব্যতীত আলোচনা সাপেক্ষে আইন প্রয়োগ, আইন ১৮৮১ এর অধীন আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকর কার্যকরকরণ।

২। পাওয়ার অ্যাটর্নি আইন, ১৮৮২ এর অধীনে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি কার্যকর করা।

৩। ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর আওতায় ট্রাস্টের সৃষ্টি।

৪। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর অধীনে উইলের কার্য সম্পাদন, অন্য কোনও টেস্টামেন্টারি স্বভাব।

৫। অস্থাবর সম্পত্তি বা এই জাতীয় সম্পত্তির কোনও আগ্রহের বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন।

৬। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গেজেটে নোটিশ দেওয়া হতে পারে এমন কোন শ্রেণির দলিল বা লেনদেন।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর অধীনে জরিমানা, ক্ষতিপূরণ এবং অ্যাডজিকেশন

ধারা ৪৩: যেখানে মালিকের অনুমতি ব্যতীত বা অন্য কোনও দায়িত্বরত ব্যক্তি কম্পিউটার, বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে, সেই দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য দণ্ড ও ক্ষতিপূরণ দায়ী হবে।

ধারা ৪৪: যেখানে কোনও ব্যক্তি কোনও নথি জমা দিতে, কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন জমা করা বা কর্তৃপক্ষকে শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, সেখানে ব্যর্থতার জন্য তিনি প্রতি ১,১৫০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়াও যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও তথ্য কোনও বই, বই বা অন্যান্য কাগজপত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, তারপরে তিনি প্রতিদিন ৫,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন। আরও বলা হয়েছে যে যেখানে কোনও ব্যক্তি অ্যাকাউন্টের বই বা অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়, তারপরে তিনি প্রতি দিন ১০, ০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর অধীন অপরাধসমূহ

ধারা ৬৫: যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কম্পিউটার পরিচালিত নথিটির নকল, গোপন, ধ্বংস, বা পরিবর্তন করে, তবে তিনি ২,০০,০০০ / - টাকা, বা তিন বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় দায়বদ্ধ থাকবেন।

ধারা ৬৬: যে কোনও ব্যক্তি বেআইনিভাবে, বা প্রতারণামূলকভাবে ধারা ৪৩ এ উল্লিখিত যে কোনও কাজ করে, তারপরে তিনি ৫,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

বিভাগ ৬৬ খ: যদি কোনও ব্যক্তি অসাধুভাবে, বা প্রতারণামূলকভাবে কোনও চুরি হওয়া কম্পিউটার সংস্থান বা যোগাযোগ ডিভাইস গ্রহণ করেন বা সংগ্রহে রাখেন, তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দণ্ডে দায়বদ্ধ হতে পারবেন।

ধারা ৬৬ গ: যদি কোনও ব্যক্তি অসৎভাবে, বা প্রতারণামূলকভাবে অন্য কোনও ব্যক্তির বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর, পাসওয়ার্ড বা অন্য কোনও অনন্য সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর অবধি কারাদণ্ড দিতে বাধ্য থাকবেন, অথবা উভয়ই প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৬৬ ঘ: যে কোনও ব্যক্তি বেআইনীভাবে বা কোনও যোগাযোগ ডিভাইস বা কম্পিউটার রিসোর্সের মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতারণা করেন, তবে তিনি ১,০০,০০০ - টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা তিন বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দায়বদ্ধ হতে পারেন।

ধারা ৬৬ ঙ : যদি কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা অনুমতিতে যে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুহূর্তের চিত্র গ্রহন করে, প্রকাশ বা ছড়িয়ে দেয় করে, তবে তিনি ২,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দণ্ডে দায়বদ্ধ হবেন।

ধারা ৬৬ চ : যদি কোনও ব্যক্তি বৈদ্যুতিনভাবে বা কম্পিউটারের ব্যবহারের সাথে ঐক্য, অখণ্ডতা, সুরক্ষা বা ভারতের সার্বভৌমত্বকে হুমকির উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করেন, তবে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

ধারা ৬৭ : যে কোনও ব্যক্তি বৈদ্যুতিনভাবে এমন কোনও কিছু প্রকাশ করে বা প্রেরণ করে যা বৃহত সংখ্যক ব্যক্তিরা পড়তে, দেখতে বা শুনতে পারে এবং ঐ বিষয় ঐ ব্যক্তিদের পক্ষে অপমানকর বা ক্ষতি সাধন করে বা করার প্রবন্তা থাকে, তবে তিনি ৫,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা তিন বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত দায়বদ্ধ থাকবেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ১০,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন , বা ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা উভয়ই।

ধারা ৬৭ক : য কোনও ব্যক্তি যৌন স্পষ্টতামূলক আইন বা আচরণের উপাদান বৈদ্যুতিন আকারে প্রকাশ বা প্রেরণ করেন, তবে তিনি ১০,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা পাঁচ বছর বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারবেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, তিনি ১০,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৭ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৬৮: নিয়ামক, আদেশের মাধ্যমে কোনও শংসাপত্র কর্তৃপক্ষ বা এই জাতীয় কর্তৃপক্ষের যে কোনও কর্মীকে এই আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় হইলে আদেশে উল্লিখিত ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ বা বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারে, বিধি বা এর অধীন প্রণীত যে কোন বিধি বা আইন যদি কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনেশুনে আদেশটি না মানেন তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ২ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৬৯: যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা এর কোনও আধিকারিকের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত, এই পক্ষ হতে পারে, মনে করেন, ভারতের সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতার স্বার্থে, ভারতের প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রের সুরক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা বা কোনও অপরাধের তদন্তের জন্য উপরোক্ত সম্পর্কিত কোন জ্ঞানীয় অপরাধের কমিশনে উস্কানি দেওয়া রোধ করার জন্য, আদেশের মাধ্যমে, লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে উপযুক্ত সরকারের যে কোনও এজেন্সিকে কম্পিউটারের সংস্থায় উতন্ন, সঞ্চারিত, প্রাপ্ত বা সঞ্চিত যে কোনও তথ্য, বাধা বা পর্যবেক্ষণ বা ডিক্রিপ্ট করার জন্য উপযুক্ত সরকারের কোনও এজেন্সিকে নির্দেশিত বা ডিক্রিপ্ট করার নির্দেশ দিতে পারে। যে কোনও ব্যক্তি যিনি আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি জরিমানার পাশাপাশি ৭ বছরের কারাদণ্ডে দায়ী থাকবেন (জরিমানার পরিমাণ আইনটিতে নির্দিষ্ট করা হয়নি)।

ধারা ৭০: উপযুক্ত সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনও কম্পিউটার সংস্থান যা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সমালোচনামূলক তথ্য অবকাঠামোগত সুবিধাকে প্রভাবিত করে একটি সুরক্ষিত ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করতে পারে, যে কোনও ব্যক্তি প্রজ্ঞাপনের সাথে সম্মতি না জানাতে। তবে সে অবশ্যই জরিমানার পাশাপাশি ১০ বছরের কারাদণ্ডে দায়বদ্ধ থাকবেন (এই আইনে জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি)।

ধারা ৭১: যে কোনও ক্ষেত্রে লাইসেন্স বা বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর শংসাপত্র পাওয়ার জন্য নিয়ামক বা শংসাপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে যে কোনও বস্তুগত তথ্য বা মিথ্যা বিবরণ দেয় বা দমন করে, তবে তিনি ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন, বা ২ বছর বা উভয় পর্যন্ত কারাদণ্ড।

ধারা ৭২: যে কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও বৈদ্যুতিন রেকর্ড, বই, নিবন্ধন, চিঠিপত্র, তথ্য, নথি বা অন্যান্য উপাদানের অর্জন করে এমন বৈদ্যুতিন রেকর্ড, বই, নিবন্ধক, চিঠিপত্র, তথ্য, নথি বা অন্যান্য প্রকাশ করে অন্য যে কোনও ব্যক্তির কাছে উপাদান, তারপরে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ২ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৭২ ক : যদি কোনও ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত কোনও উপাদানের অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে থাকে, তবে কারণ সম্পর্কিত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই বা অন্যায়ভাবে ক্ষতি বা ভুল লাভের প্রকাশের কারণ হতে পারে বা জেনে রেখেছিলেন যে তিনি ভুল ক্ষতি বা ভুল লাভের কারণ প্রকাশ করতে পারেন আইনী চুক্তি লঙ্ঘন করা হলে, তারপরে তিনি ৫,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৭৩: যদি কোনও ব্যক্তি একটি বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রকাশ করে বা অন্য যে কোনও ব্যক্তির কাছে জ্ঞান সহ এটি উপলব্ধ করে

- প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ এটি জারি করেনি, বা
- গ্রাহক এটি গ্রহণ করেন নি, বা
- শংসাপত্র প্রত্যাহার বা স্থগিত করা হয়েছে

তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ২ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৭৪: যদি কোনও ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনও জালিয়াতি বা বেআইনী উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর শংসাপত্র তৈরি করে, প্রকাশ করে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে জোগাড় করে, তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদান করতে পারবেন, বা দুই বছর বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৭৫: যদি কোনও ব্যক্তি ভারতের বাইরে কোনও অপরাধ, আইন বা লঙ্ঘন করেছে, এবং যদি এই অপরাধ বা লঙ্ঘনকারী আইনটি পরিচালনা কারী ভারতে অবস্থিত একটি কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে এই আইনের বিধানগুলিও তার জাতীয়তার নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৭৬ : যে কোনও কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ, বা এর সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনও আনুষাঙ্গিক, এই আইনের বিধি, বিধি, আদেশ বা বিধিবিধানের যে কোনও বিধান রয়েছে বা এর বিপরীত হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করতে দায়বদ্ধ হইবে। তবে, যদি প্রমাণিত হয় যে এই জাতীয় সংস্থানগুলি প্রতারণা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি তবে কেবলমাত্র মূল দায়ী ব্যক্তিই গ্রেপ্তার হবে।

৪.২.৫.৩ তথ্য প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৮

তথ্য প্রযুক্তি বিল, ২০০৮ , ডিসেম্বর, ২০০৮ গত সপ্তাহে উভয় সংসদ কক্ষে পাস করা হয়েছে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত হয় এবং অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সংশোধনী আইন হয়ে ওঠে।

এই তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনী আইন ভারতী বিদ্যমান সাইবার আইন কাঠামোর মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর অর্থাত কোনো বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর কৌশল দ্বারা ইলেকট্রনিক রেকর্ডের প্রয়োজনীয় প্রমাণীকরণ নিগম তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

এই তথ্য প্রযুক্তি আইনের আওতায় সাইবার অপরাধের আরও অনেক বিষয় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এবং দ্রুতগামী বিধান সন্নিবেশ সম্ভব হয়েছে। ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত নতুন সংশোধনী বিভিন্ন বিধান এবং গোপনীয়তা পাশাপাশি ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল মাঝারি ব্যবহার ধারের সন্ত্রাসবাদ রোধ করার জন্য একটি বিধান আছে।

মূল আইন অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি আইন,২০০০; ই-কমার্স এবং ই-লেনদেনের জন্য আইনি স্বীকৃতি প্রদান, ই-গভর্নেন্স সহজতর, কম্পিউটার ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা অশীলন ও পদ্ধতি নিশ্চিত করার আইন প্রণয়ন করা হয়। সংশোধনী আইনটি (তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনী আইন, ২০০৮) 'মধ্যস্থতাকারী' হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে যাতে আইনটির বিষয়ে স্পষ্টতা আনতে পারে যখন অপরাধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি। এখন, মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন কারন প্রাপ্ত তথ্যের বেআইনী ডেটা বা বিষয়বস্তু অপসারনের প্রয়োজন হয়।

এছাড়াও "কমিউনিকেশন ডিভাইস" এবং "সাইবার ক্যাফে" এর সংজ্ঞা সংশোধনী আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেমের ইত্যাদি ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ সর্বোচ্চ সীমা এখন সরানো হয়েছে এবং বর্তমানে এই ক্ষতিপূরণ যে কোনও সীমা পর্যন্ত যেতে পারে।

৪৩ নং ধারা দুটি নতুন অপরাধকে যোগ করা হয়েছে। ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও কম্পিউটারের তথ্য উৎসের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য তথ্য মুছে ফেলা বা তথ্য উৎস পরিবর্তন করা এবং ক্ষতির উদ্দেশ্যে তথ্য উৎস কোড চুরি করা বা ধ্বংস করা। সংবিধিবদ্ধ সংস্থার ডেটা সুরক্ষার দায়িত্ব ব্যাপকভাবে সন্নিবেশ করার মাধ্যেমে জোরদার করা হয়েছে।

সংশোধন আইনের ধারা ৪৩ এ এর অধীনে কম্পিউটার সংস্থায় সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য পরিচালিত কর্পোরেট সংস্থাগুলি তার গোপনীয়তা বজায় বজায় রাখার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষা অনুশীলন এবং পদ্ধতি গ্রহণ নিশ্চিত করার একটি বাধ্যবাধকতা এই আইনের অধীনে রয়েছে। এই জাতীয় সংস্থা কর্তৃক এই ধরনের বাধ্যবাধকতা সম্পাদনে ব্যর্থতা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়বদ্ধ থাকবে।

সাইবার অপরাধ হিসাবে আরও ৮ টি অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ৬৬(ক) থেকে ৬৬ (চ) ধারাগুলিতে যুক্ত করা হয়েছে, যেমন - অপরাধের মধ্যে আপত্তিকর বৈদ্যুতিন বার্তা প্রেরণ, পরিচয় চুরি, কম্পিউটার সংস্থান ব্যবহার করে ছদ্মবেশে প্রতারণা, গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং সাইবার সন্ত্রাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৬৭ (ক) থেকে ৬৭ (গ) বিভাগের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ যৌন প্রকাশ্য আইন সহ ইলেকট্রনিক আকারে উপাদান প্রকাশ করা বা প্রেরণ করা, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যের সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতি বাধ্যবাধক করা হয়েছে।

৬৯ ধারাটি সরকারী সংস্থাগুলি গ্রাহকগণ, মধ্যস্থতাকারী বা কম্পিউটার সংস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সহায়তায় যেকোন বৈদ্যুতিন তথ্যকে বাধা, মনিটরিং বা ডিক্রিপ্ট করতে সক্ষম করে।

সংশোধিত অধ্যায় ৭৯ এ বলা হয়েছে, মধ্যস্থতাকারীরা তৃতীয় পক্ষের ডেটাগুলির জন্য দায়বদ্ধ নয় যদি তারা প্রমাণ করতে পারে যে তারা কেবলমাত্র ডেটাগুলি গ্রহন করতে পারে বা তা করার সুবিধা আছে কিন্তু সেই ডেটা নিয়ে তারা সঞ্চালন করে না বা কোনও অপব্যবহার করে না , তাহলে তা সমস্যাজনক নয়।

'প্রকৃত জ্ঞান' প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সামগ্রী বেআইনী ভাবে অন্যের কাজ আহরন করার ক্ষেত্রে বাধা আছে। আইনের ৮১ ধারায়, বলা হয়েছে কোন কিছুই, যা কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ বা পেটেন্টস অ্যাক্ট, এর আওতাভুক্ত রয়েছে সেই বিষয় গুলির কোনও কিছুর অপব্যাবহার করা যাবে না বা নিজের নামে চালানো যাবে না। সুতরাং, পেটেন্টস আইন এবং কপিরাইট আইনের অধীন অধিকারগুলি এই ক্ষেত্রেও অনুশীলনযোগ্য।

৪.২.৬) সারাংশ

মানব সভ্যতা যত বেশী ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পরছে তত বেশী অপরাধের ধরনও তার চরিত্র বদলাচ্ছে। প্রয়োজন পরছে সাইবার আইনের। ভারতে ২০০০ সালে প্রণীত তথ্যপ্রযুক্তি আইন বর্তমান। পরবর্তী সময়ে তার সংশোধন হয়েছে। কিন্তু দিন যত এগুচ্ছে সাইবার অপরাধ নতুন নতুন রূপে হাজির হচ্ছে। শুধু মূদ্রার লেনদেন নয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নতুন মঞ্চ হিসেবে সামাজিক মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ন জায়গা করে নিচ্ছে। এখন তথ্য গ্রহীতা শুধু আর গ্রহীতা নন বরং নতুন তথ্যের প্রকাশে গ্রাহীতাও জোরদার ভূমিকা নিচ্ছে। স্মার্ট ফোনের যুগে মুহুর্তে ভাইরাল হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিসর। তথ্য জানার অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকারের মাঝের সীমারেখা ক্রমাগতই ধূষর হচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্যাকিং কেও "Ethical" বলে ঘোষনা করা হয়েছে।

নতুন পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন পরছে প্রতিনিয়ত এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সচেতনতা।

৪.২.৭) অনুশীলনী

১। সাইবার আইন কি? সাইবার অপরাধ কি?

২। তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। তথ্য প্রযুক্তি আইন সংশোধনীর কাওর কি ছিল?

৪। সাইবার স্টকিং কি?

৫। মরফিং কি?

৬। গোপনীয়তার অধিকার বলতে কি বোঝেন? ভারতে এই আধিকার কি চূড়ান্ত?

৭। "ডিজিটাল যুগে গোপনীয়তা ভংগের অভিযোগ বারে বারে এসেছে, আমজনতার বিরূদ্ধে এমনকি সরকারের বিরূদ্ধেও এসেছে।" মন্তব্যের সঙ্গে কি আপনি সহমত? যুক্তিসহ ব্যাখা দিন।

৮। "ডিজিটাল যুগে অদৃশ্য নজরদারীতে সাধারন জনগন রয়েছেন।" — মন্তব্যটি ব্যাখা করুন।

৪.২.৮) গ্রন্থপঞ্জীঃ

Indian Express Newspaper vs Union of India (1985)1SCC 641

Maneka Gandhi v. Union of India– (1978) 1 SCC 248

Global Media Journal - Indian Edition– Summer Issue/June/2016/Vol. 7/No. 1

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)–2015– Vol 2– No.7– 49- 54.

Media Law and Ethics — N. Neelamar

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontgent.cgi?article=1407&context=btli

একক - ৩ ❐ মুক্ত মাধ্যম ও সংপ্রশ্ন (চ্যালেঞ্জ)

গঠন

৪.৩.১) উদ্দেশ্য

৪.৩.২) প্রস্তাবনা

৪.৩.৩) উইকিলিক্স এবং কিছু প্রশ্ন

৪.৩.৪) সাইবার ট্রোলিং

৪.৩.৫) ইন্টারনেট স্বাধীনতা ও বর্তমান প্রবনতা

৪.৩.৬) জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি, ২০১৮

৪.৩.৭) সারাংশ

৪.৩.৮) অনুশীলনী

৪.৩.৯) গ্রন্থপঞ্জী

৪.৩.১)উদ্দেশ্য

নয়া মাধ্যমের যুগে তথ্যের স্বাধীনতা, তথ্যের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও তথ্য প্রবাহে রাষ্ট্রের ভূমিকা এক বিষয়গুলির সীমা একে অন্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সমাজ প্রত্যেকদিন এক এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। উইকিলিকসের ঘটনা অনেক কারণেই চোখে পরার মতন। এটি দেখিয়ে দিয়েছে যে যখন কোনও বৃহত শক্তিকে চ্যালেঞ্জ হয়, তখন সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।, কীভাবে বা কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, তা মহান শক্তির পক্ষে কোনও বিবেচ্য বিষয় নয় কারণ বৃহৎ শক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক দূর যেতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, চ্যালেঞ্জটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিকবাহিনীকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি, তবে উইকিলিকস কর্তৃক ফাঁস হওয়া গোপনীয় তথ্যগুলি 'উচ্চ শ্রেণির তথ্য' হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

৪.৩.২) প্রস্তাবনা

সাইবার আইন চর্চার ক্ষেত্রে আমরা বারে বারেই বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা শুরুই করবো দুনিয়া কাঁপানো একটি ঘটনা নিয়ে। যে ঘটনা সমাজ ও প্রযুক্তিকে এক্কেবারে অনেকগুলি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

৪.৩.৩) উইকিলিকস এবং কিছু প্রশ্ন

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও উইকিলিকস

অ্যাসাঞ্জ হলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান, ১৯৭১ সালে কুইন্সল্যান্ড প্রদেশে জন্ম।। তাঁর যাযাবর জীবনযাপনে, অ্যাসাঞ্জ ছিলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষিত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। ২২ বছর বয়সে, তার বিরুদ্ধে ৩১ টি কম্পিউটার

হ্যাকিং এবং সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং অবশেষে দোষী সাব্যস্ত করে এবং একটি ন্যূনতম জরিমানাও দিয়েছিল। তিনি পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের মতো বিস্তৃত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষিত।

অ্যাসাঞ্জ, তথ্যের অবাধ গতিবিধিতে বিশ্বাসী এক ব্যক্তি। ১৯৯৯ সালে 'উইকিইলিক্স.কম' ডোমেন নামটি নিবন্ধভুক্ত করেছিলেন। তবে তিনি ২০০৬ পর্যন্ত এই সাইটের ব্যবহার সক্রিয়ভাবে শুরু করেননি। সেই বছর, তিনি তথ্য ফাঁসকারীদের (হুইস্ল-ব্লোয়ারদের) জন্য ওয়েবসাইটটিকে একটি ভীষণরূপে নির্ভরযোগ্য স্থানে পরিনত করেছিলেন, বিশেষত যারা গোপন নথিগুলি জনসাধারণকে প্রচার করতে চান, তাঁদের জন্য। যেমনটি তাঁর বৈশিষ্ট্য, অ্যাসাঞ্জ জানান, উইকিলিকস হ''ল 'অবৈধ কাজ জনিত দলিল ফাঁস এবং প্রকাশ্য বিশ্লেষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা।' ডিসেম্বর ২০০৬ সালে প্রথম তাঁর ওয়েবসাইটে প্রকাশ পায় সোমালির বিদ্রোহী নেতার দ্বারা সরকারী কর্মকর্তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল (যদিও তথ্য যাচাই করা হয়নি)। ২০০৭ সালে, অ্যাসাঞ্জ সাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার ঘোষণা করেন।

২০০৭ সালের শুরু থেকেই অ্যাসাঞ্জ 'দ্য গার্ডিয়ান'' প্রত্রিকার সাথে একটি সম্পর্ক রাখতে শুরু করেছিলেন। ২০০৭ সালের প্রথম দিকে, প্তিকার সম্পাদক রসব্রিডগার স্মরণ করে বলেন তিনি উইকিলিক্সের 'সম্পাদক-ইন-চিফ' অ্যাসাঞ্জের নিয়মিত ইমেল পেয়েছিলেন, , মাঝে মাঝে সেখানে লেখা থাকতো- ''একটি ভাল খবর বলার আছে''।

২০০৭-এর ৩১ আগষ্ট, দুটি সংস্থা প্রথমবারের মতো কাজ করেছিল। কেনিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল আরাপ মোয়ের কথিত দুর্নীতির বিষয়ে বেসরকারী তদন্ত সংস্থা ক্রোলের একটি প্রতিবেদনটি উইকিলিকস পুরো প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে পোস্ট করেছিল এবং গার্ডিয়ান পত্রিকাও লিখেছিল। কেনিয়া সরকার এই প্রতিবেদনটি গোপন রাখতে চেয়েছিল। উইকিলিকস এর কিছু নথি ব্যবহার করার জন্য এই দ্য গার্ডিয়ানটি ছিল ব্রিটিশদের একমাত্র কাগজ।

২০০৮ এবং ২০০৯ সালে, উইকিলিক্স এবং দ্য গার্ডিয়ান আবার সীমা অতিক্রম করেছে। দুটি উপলক্ষে - প্রথমে বার্কলে ব্যাংকের কর এড়ানোর কৌশল সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আইভরি কোস্টে পণ্য ব্যবসায়ী ট্রাফিগুরা দ্বারা বিষাক্ত বর্জ্য ফেলা। যুক্তরাজ্যের উচ্চ আদালত কাগজপত্রের জঘন্য নথি প্রকাশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

উইকিলিকস ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র

উইকিলিক্সের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটিতে ঘোষিত আছে যে এটি যুদ্ধ, গুপ্তচরবৃত্তি এবং দুর্নীতির সাথে জড়িত বিধিনিষেধযুক্ত সরকারী উপকরণগুলির বৃহত ডেটাসেটগুলির বিশ্লেষণ এবং প্রকাশে বিশেষীকরণ করেছে। এটি এ পর্যন্ত দশ কোটিরও বেশি নথি এবং সম্পর্কিত বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে।

- উইকিলিকস ওয়েবসাইটটি অনেকগুলি বিশিষ্ট তথ্য ফাঁসের সাথে জড়িত রয়েছে, যার বেশিরভাগই মার্কিন সরকারের নীতিগুলিকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে।
- আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম, জামানত হত্যা, আফগান যুদ্ধের বিবরণ, ইরাক যুদ্ধের বিবরণ, গুয়ান্তানামোর ফাইল এবং এনএসএর ওয়ার্ল স্পাইয়ের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় তথ্য ফাঁস করে উইকিলিকস।
- উইকিলিক্স বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নথি প্রকাশ করেছে যা প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদে পরিণত হয়েছে।
- ২০১০ সালের এপ্রিলে, উইকিলিক্স একটি ভিডিও প্রকাশ করে যেখানে দেখা যায় এএইচ-৬৩৮ অ্যাপাচি হেলিকপ্টার দ্বারা ২০০২ সালের ১২ জুলাই বাগদাদ বিমান হামলার বন্দুকের দৃশ্য, যেখানে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইরাকি সাংবাদিকরা ছিলেন, যাঁকে জামানত হত্যা হত্যা ভিডিও হিসাবে ইতিমধ্যে পরিচিত ছিল।

- ২০১০ সালের জুলাই মাসে উইকিলিক্স আফগান যুদ্ধ ডায়েরি প্রকাশ করে, এটি আফগানিস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কিত ৭৬,৯০০ টিরও বেশি নথির সংকলন যা জনসাধারণের জন্য আগে উপলভ্য ছিল না।
- ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে উইকিলিকস বড় বাণিজ্যিক গনমাধ্যম সংস্থার সাথে সমন্বয় করে 'ইরাক ওয়ার লগস' নামে প্রায় ৪০০,০০০ নথির প্রকাশ করেছিল।
- ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উইকিলিকস জনসমক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোপন তথ্যের বিশাল আর্কাইভের এনক্রিপ্ট করা সংস্করণ প্রকাশ করে যা কয়েক মাস ধরে বিটোরেন্টের মাধ্যমে উপলব্ধ ছিল এবং সেই সঙ্গে ডিক্রিপশন কী (যা পাসওয়ার্ডের অনুরূপ) উপলব্ধ ছিল।

বিতর্কিত ঘটনাপ্রবাহঃ

- এই ঘটনার ফলে ব্যাপকভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে প্রকাশিত তথ্য নিরীহদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।
- অনেক গণমাধ্যম সূত্র অ্যাসাঞ্জকে একটি 'নৈরাজ্যবাদী' বলেছিল কারণ তিনি কোনও ব্যক্তির করা দাবী বা তথ্য গুলি কোনও সম্পাদনা, বস্তুনিষ্ঠা, কোনও ব্যাখ্যা, কোন চিন্তাভাবনা, কোনও পরিণতি বিবেচনা না করেই প্রকাশ করেছিলেন।
- অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে হ্যাকার এবং প্রোগ্রামাররা এখনও অ্যাসাঞ্জ এবং উইকিলিক্সের ব্যাপক সমর্থন ছিল।
- মার্কিন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিশ্লেষক চেলসি ম্যানিং যিনি আগে ব্র্যাডলি ম্যানিং নামে পরিচিত ছিলেন তিনি উইকিলিকসকে কয়েক হাজার শ্রেণিবদ্ধ নথি সরবরাহ করার জন্য দায়ী ছিলেন বলে দাবী করা হয়। এই নথি গুলির মধ্যে ২০০৭ সালের, বাগদাদ স্ট্রাইক, ২০০৯-এর আফগানিস্তানের এয়ারস্ট্রাইক এবং হাজার হাজার মার্কিন কূটনৈতিক তার- যোগাযগের ভিডিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পরবর্তীতে "ইরাক যুদ্ধ লগ" হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। শ্রেণিবদ্ধ নথি ফাঁস করার জন্য, ম্যানিংয়ের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করার জন্য ২২ টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
- ম্যানিংয়ের সমর্থনকারী প্রতিরক্ষা আইনজীবীদের দ্বারা "শত্রুকে সাহায্য করার" অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। অন্যতম আইনজীবী হার্ভার্ড আইন স্কুলের প্রফেসর, বেনক্লারও মত প্রকাশ করেছিলেন, 'উইকিইলিক্স ম্যানিংয়ের ফাঁস হওয়া উপাদান প্রকাশ করা শুরু করা অবধি পেন্টাগন গোপনীয়তাবিরোধী ওয়েবসাইটটিকে বৈধ, কারন এটি ছিল একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ।" এই পরেই মার্কিন জনসাধারণ, সামরিক ও ঐতিহ্যবাহী সংবাদমাধ্যমগুলি উইকিলিকসকে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনকারী একটি দল হিসাবে প্রস্তাব করে।
- কারাগারে প্রেরণের আগে, প্রকাশিত হয়েছিল যে ম্যানিং নিজেই বলেছিলেন যে তিনি যে তথ্য ফাঁস করেছেন সেগুলি হ"ল "ঐতিহাসিক তাৎপর্য পূর্ণ" বিষয়" যা একবিংশ শতাব্দীর অসম যুদ্ধের 'সত্য প্রকৃতি' প্রকাশ করেছিল। তবে চূড়ান্ত শুনানি চলাকালীন ম্যানিং তার অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাদের অনিচ্ছাকৃত পরিণতির জন্য তিনি দুঃখিত।
- ঘটনায় প্রধান মোড়টি তখন আসে যখন সুইডিশ আদালত দুজন সুইডিশ মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এই দুই অভিযোগকারীনি উইকিলিকসের প্রাক্তন কর্মচারীও ছিল। অ্যাসাঞ্জ নিজেকে লন্ডন পুলিশের হাতে সমর্পন করেছিলেন এবং বিচারের জন্য সুইডেনে হস্তান্তর করার

মামলা করা হয়েছিল। অন্যদিকে, অ্যাসাঞ্জ জামিনে মুক্তি পান এবং গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় তিনি ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন যে মামলাটি রাজনৈতিকভাবে তাকে দুর্বল করার জন্য সাজানো হয়েছিল।

- অ্যাসাঞ্জ আশঙ্কা করেছিলেন যে সুইডেনে তাকে সুষ্ঠু বিচার দেওয়া হবে না সেই কারনে তিনি আদালতের প্রত্যর্পণের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন। ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এর পরেই অ্যাসাঞ্জ আদালতের আদেশ মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন এবং লন্ডনে ইকুয়েডোর দূতাবাসে আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। এটি বোঝা যায় যে অ্যাসাঞ্জ ভয় পেয়েছিলেন যে যদি তাকে সুইডেনে প্রত্যর্পণ করা হয় তবে তিনি প্রত্যর্পণ করা হতে পারে।
- ব্রিটেন ইকুয়েডরকে হুমকি দিইয়ে মার্কিন সহযোগী হিসাবেই তার ভূমিকা পালন করেছিল।
- এই আচরণটি আন্তর্জাতিক আইনগুলির সম্পূর্ণ অসম্মান প্রদর্শন করেছিল যার জন্য বিশ্বব্যাপী নাগরিক অধিকার সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্রিটেনের সমালোচনা হয়েছিল। ইকুয়েডরও এই হুমকির নিন্দা করেছিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা অ্যাসাঞ্জকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
- তার পর থেকে, অর্থাৎ ২০১২ সালের আগস্ট মাস থেকে অ্যাসাঞ্জ ইকুয়েডর দূতাবাসের অভ্যন্তরে আবদ্ধ এবং সময়ে সময়ে তাকে দূতাবাসের চত্বর থেকে গণমাধ্যম এবং তার সমর্থকদের উদ্দেশে দেখা যায়।

জাতীয় সুরক্ষা বনাম বাক স্বাধীনতা

উইকিলিকসের ঘটনাটি এক সঙ্গেই অনেকগুলি দিকের উন্মোচন করে -

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বাক স্বাধীনতার বিষয়টি সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পরে এবং "বিল অফ রাইটস"-এ তালিকাভুক্ত প্রথম সুরক্ষিত অধিকার। আমেরিকানরা এই অধিকারটিকে ঐতিহাসিকভাবে লালন করেছেন এবং অনেকে যুক্তিও দিয়েছে যে এটি মার্কিন মূল্যবোধকে চিত্রিত করে। উইকিলিক্স মামলায় জাতীয় সুরক্ষা এবং বাক স্বাধীনতার বিষয়টির দ্বন্দ্বের স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে।
- দ্য গার্ডিয়ান এর মতে, মার্কিন সরকার ফেডারেল কর্মীদের জন্য উইকিলিক্সের অ্যাক্সেস ব্লক করেছিল। কংগ্রেসের মার্কিন গ্রন্থাগার, মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলিও এই ওয়েবসাইটটি নিষিদ্ধ করেছিল।
- ম্যাথিয়াস স্পিলক্যাম্প নামক এক সাংবাদিক বলেছিলেন যে উইকিলিকসকে তথ্য প্রকাশে বাধা দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের প্রচেষ্টাগুলি প্রেসের স্বাধীনতা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার একটি দিক।
- বৃহৎ শক্তির স্বার্থ বা রাষ্টার্থগুলিকে অনেক সময় 'জাতীয় স্বার্থ বলে অভিহিত করা হয় যা বাস্তবে কখনই জাতীয় স্বার্থ নয়, মূলত রাষ্ট্রের স্বার্থ। উইকিলিকসের দ্বারা ফাঁস করা তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ হিসাবে উপ্সথাপিতকরার জন্য একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার পর্দা ফাঁস করেছিল।
- এর সাথে বিশ্বমানবিকতার দিকটিও জড়িয়ে ছিল। যে সাংবাদিকগন বাগদাদে মারা যান, তাঁদের তথ্য জানাবার অধিকারের বা পেশার দিকটিও জড়িত। আমেরিকার মতো দেশ যা বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের লালন করে, সেই রাষ্ট্র কিভাবে সাংবাদিক এবং নাগরিক সমাজের দলগুলির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে রাষ্ট্রের স্বার্থ সর্বজনীন এবং তার কাছে বাক-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মতো সমস্ত আদর্শগুলি একটি গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

- এর উল্টো দিকটি হল, যেখনে মার্কিন প্রশাসন তাঁদের গোপন নথিগুলি গোপন রাখতে ব্যার্থ হয়েছেন, সেখানে সাধারন মানুষের নথি চুরি যাবার ভয় অনেক বেশী।
- আবার জনগনের জানার এক্তিয়ার কতখানি, রাষ্ট্র যেখানে কোনও বিষয়কে অন্য মোড়কে উপস্থাপন করে তখন গনমাধ্যমের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ !

এই অনেক গুলি বিষয়কেই মিলিয়ে এক নতুন অনিশ্চিত নয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ তার নিজের ভাষায় উইকিলেক্সকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাচারিত দলিলগুলির একটি বৃহদাকার গ্রন্থাগার।" কিন্তু বর্তমানে এটি এক নিষিদ্ধ গ্রন্থাগার।

৪.৩.৪) সাইবার ট্রোলিং

উৎসঃ

১৬১০ সাল নাগাদ তিনি ইংরেজী বিশেষ 'ট্রোল' শব্দটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোককাহিনী এবং শিশুদের গল্পগুলিতে পাওয়া যায়। 'ট্রোল' শব্দটি প্রাচীন নর্স শব্দ 'ট্রল' থেকে এসেছে যার অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। ট্রোলগুলি সাধারনত অসামাজিক ও ঝগড়া প্রবন এবং ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত উদ্দীষ্ট ব্যক্তির স্বাভাবিক যাপনকে কঠিন করে তোলে। আধুনিক ইংরেজি ব্যবহারে, 'ট্রোলিং' শব্দটির অর্থ হল চলন্ত নৌকা থেকে আস্তে আস্তে লোভ বা টোপযুক্ত টুকরো টেনে এনে মাছ ধরার কৌশলটি। ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে গণ-যোগাযোগের জন্য "ট্রোল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। "ট্রোল" শব্দটি অর্থ হল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অন্যদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা। ইন্টারনেট ব্যবহারের অনেক আগেই, 'ট্রোলিং' শব্দটি তৈরি হয়েছিল এবং বর্তমানে সাইবার ট্রোলিং এর উৎস হিসেবে বলা যেতে পারে।। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভিয়েতনামের মার্কিন নৌবাহিনীর বিমান চালকরা তাদের 'কুকুর-লড়াইয়ে' ট্রোলিং শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং পরবর্তী সময়ে টম ক্রুজ অভিনীত 'টপ গান' ছবিটিতে এই বিষয়টি দেখানো হয় ও তা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ইন্টারনেটের যুগে প্রতিটি ইন্টারনেট ট্রোলের ব্যবহার আলাদা আলাদা গল্প থাকে এবং তাই ইন্টারনেটে কোনও সম্প্রদায়কে ট্রোল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পিছনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যারা ট্রোল করেন তাঁরা বেশিরভাগ সময় হতাশাগ্রস্ত, রাগান্বিত, দু: খিত, ঈর্ষা বা অন্য কোনও আবেগ দ্বারা তাড়িত হল যা তাঁরা বাস্তব জগতে ব্যক্ত করতে পারেন না , কিন্তু অনলাইনে সহজেই সেই কথাগুলি ব্যক্ত করেন ট্রোলিং এর মধ্যমে। ট্রোলিং রাগ — ক্ষোভ প্রকাশের জাওয়গাটা এত সহজ করে তোলে যে এটি যে কেউ করতে পারে, এবং কম্পিউটার বা মোবাইলের মত নিরাপদ জায়গা থেকে করতে পারে, সামনা সামনি কোনও খারাপ কথা বলতে হয় না। ট্রোলিং অনেকটা নিরিহ মানুষকে আরও শক্তিশালী বোধ করে।

নিম্নে আমরা কয়েক ধরনের ট্রোলিং বিষয়টি আলোচনা করবোঃ

ক্লাসিকাল বা চিরায়ত ট্রোলিং বনাম বেনামে ট্রোলিং (Classical trolling vs anonymas trolling)

- ক্লাসিকাল ট্রোলিংটি সাধারনত পরিচিত মানুষজন বা সম্প্রদায়ের সম্মতিতে বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর ফলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে বন্ধন তৈরি হতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেনামে ট্রলিং কোন ব্যক্তির নিজস্ব অসুস্থ উপভোগের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বাইরের কাউকে কেন্দ্র করে করা হয় বা ট্রোলিংকে উতাহিত করা হয়।

- খ্যাতি সূচক ট্রোলিং বনাম অপমানকর ট্রোলিং (Kudos trolling vs flame trolling)

  যিনি বেশিরভাগ আপাতদৃষ্টিতে বৈধ প্রশ্ন বা কথোপকথনের সূচনা দিয়ে থ্রেড শুরু করেন তবে অন্যরা নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে ট্রোলকে এমন হিসাবে বর্ণনা করেন যাতে মূল আলোচনাটি অকেজো আলোচনায় পরিনত করার চূড়ান্ত লক্ষ্য করা যায়। ”ট্রোলিং”-এর এই অবমাননাকর রূপটি”ত্রনথদ্বত্র ঠন্দ্রনহ্লদ্রঔ্বহিসাবে গন্য করা আবার তুলনায় যে ট্রোলিং অন্যকে বিনোদন দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, ” কুডোস ট্রোলিং ”হিসাবে বলা হয়। তুলনাকরভাবে “জ্ঙ্ডত্মদ্রন্ ঠন্দ্রনহ্লদ্রঔ্ব এ হাস্যকর করে তোলা উদ্দেশ্যে নয়।

- ইন্টারনেট ট্রোলিং

  অনলাইন সামাজিক মাধ্যমগুলি কয়েক মিলিয়ন ব্যবহারকারীর কাছে মূল্যবান তথ্য নিয়ে আসে বা আলাপচারীতার সূচনা করে,- তবে তাদের উপযোগিতা নির্ভর করে তাদের ব্যবহারকারীর উপর।অনলাইন সম্প্রদায়ের সাফল্যের জন্য, পোস্ট, মন্তব্য এবং ভোট আকারে ব্যবহারকারীর অবস্থানের গুরুত্ব থাকে।

- একটি ইন্টারনেট ট্রোলের মাধ্যমে একটি অনলাইন সামাজিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মন্তব্য, ফটো, ভিডিও, জিআইএফ বা অনলাইন সামগ্রীর কোনও ফর্ম পোস্ট করে সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে, আক্রমণ করতে, অপরাধ করতে বা সাধারণত সমস্যার সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

- এক জন সামাজিক মাধ্যম ব্যাবহারকারী পুরো ;ইন্টারনেট অন ম্যাসেজ বোর্ডের’ উপরে, ইউটিউব ভিডিও মন্তব্যে, ফেসবুকে, টুইটারে, ব্লগ মন্তব্যে এবং অন্য যে কোনও জায়গায় যেখানে উন্মুক্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে লোকেরা তাদের চিন্তাভাবনা এবং মতামত প্রকাশ করার জন্য পোস্ট করতে পারে তা ব্যবহার করতে পারেন

- একটি ট্রোলে সাধারণ জ্ঞানের বোকামি, মতবিরোধ, কোনও গোষ্ঠী বা মেলিং তালিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আপত্তিকর অবমাননা বা তুচ্ছ ফলো-আপ পোস্টিংয়ের জন্য অনুরোধ থাকতে পারে।

- ট্রোল কারও অনলাইন সুনামের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকারক। অপমানকর ট্রোল হ”ল বিদ্বেষপূর্ণ, সরল এবং সাধারণ। এমনকি কারও কাছে তাদের ঘৃণা বা অপমান করার কারণও নেই। এই ধরণের ট্রলগুলি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট জিনিসগুলির জন্য অভিযুক্ত করবে এবং তাদের কাছ থেকে নেতিবাচক মানসিক প্রতিক্রিয়া পেতে তারা যা কিছু করতে পারে।এই ধরণের ট্রোলিং এতটাই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে যে এটি সাইবার বুলিংয়ের একটি গুরুতর রূপ নিয়ে যেতে পারে বা এটি বিবেচনা করতে পারে। প্রায়শই ক্ষোভের সংস্কৃতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে ভয়, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ বপন করা হয়।

- ট্রোলিং এমন একাধিক অসামাজিক অনলাইন আচরণের সাথে সম্পর্কিত থাকে যা অনলাইন সামাজিক মাধ্যমগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। ট্রোলিং প্রতিরোধ অনলাইন বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

আমাদের আচরণ সর্বদা নিখুঁত নয়। সমালোচনার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অনেক সময়েই আমরা সচেতন থাকতে পারি না। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদটি আমাদের মতামত রাখার স্বাধীনতা দেয়, তবে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যেখানে কোনও স্বাধীন মতামত কোনও ব্যক্তির আত্ম-সম্মান এবং সুনামকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। অযথা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠলে সমালোচনা তার মান হারাতে থাকে। ইন্টারনেট ট্রলিং হ”ল এমন একটি ঘটনা, সামাজিক মাধ্যমের মঞ্চ যেখানে প্রচণ্ড তর্ক - বিতর্ক ও ভয় দেখানোর কারণে স্বাধীন মতপ্রকাশের নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কেসস্টাডিঃ রানু মন্ডলঃ হঠাত জনপ্রিয়তা ও ট্রোল

পশিমবঙ্গের রানাঘাট রেলস্টেশনে ভবগুড়ে পৌঢ়া রানু মন্ডলকে গান গাইতে দেখে এক পথচারী তার ভিডিও রেকর্ড করেন এবং ফেসবুকে আপলোড করেন। খুব জলদি তা অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারীর কাছে পৌচ্ছে যায়। হোয়াটসাপের মাধ্যমেও ছড়িয়ে পরে এবং চারিদিকে প্রচন্ড ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বলিউডের গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক হিমেশ রেশমিয়া রানু মন্ডলের কথা জানতে পেরে তাঁর একটি সিনেমায় গানের সুযোগ করে দেন। সেখানে গান করার পর রানু মন্ডলের ভাইরাল ছবিগুলি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্লাবিত হয় ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই, একদল মানুষের মনে হতে শুরু করে রানু মণ্ডল প্রয়োজনের অতিরক্ত প্রশংসা পেয়ে গেছেন। ফলে সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ট্রোল শুরু হয়। মন্তব্যগুলিকে ফাঁসানোর পথ দিয়েছিল। মন্ডলের জন্য জনপ্রিয়তা থেকে সক্রিয় অপছন্দের রূপান্তরটিও সমানভাবে বিস্মিত করে। রানু মন্ডলের "মিম" বানিয়ে খোঁচা দিয়ে করে মজা ভাগ করে নিয়েছে এবং অবমাননাকর বা ঘৃণ্য মন্তব্য করছে।

প্রশ্ন উঠছে যে রানু মণ্ডল এর প্রাপ্য কী হল - রাতারাতি খ্যাতিতে ওঠার পরে নির্মমভাবে তাঁর সম্মাঙ্কে নামানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া নৈতিকতা সম্পর্কে কী বলে? ট্রোলগুলি দেখভাল করার জন্য কোনও সেলিব্রিটি বা রাজনৈতিক নেতা- মন্ত্রীদের সাধারনত জনসংযোগ দল থাকেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই চিত্র এক নয়। এই ধরনের আক্রমণ খ্যাতির অবক্ষয় হিসাবে নিরাপত্তাহীনতা এবং মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে। স্পষ্টতই, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা এই মাধ্যমগুলির আচরন মেনে নিয়ে সচেতন থাকা উচিৎ ও যত্ন নেওয়া উচিৎ যেন অপর ব্যাবহারকারীর সম্মান রক্ষিত হয় জন্য এবং মত প্রকাশের নৈতিক দিকগুলি প্রতিফলিত হয়।

৪.৩.৫) ইন্টারনেট স্বাধীনতা ও বর্তমান প্রবনতা

২০১৯ সালের জুন মাসে ফ্রিডম হাউস কর্তৃক প্রকাশিত "ফ্রিডম অন নেট" নামক প্রতিবেদনে ইন্টারনেটের স্বাধীনতা প্রসংগে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে, সেগুলি হলঃ

১। যদিও সামাজিক গনমাধ্যমগুলি অনেক সময়ই নাগরিক আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা করেছে, তবু তাদের ব্যাবহার বিপজ্জনক উদারপন্থার দিকে ঝুঁকছে।

২। এই প্রবনতার ফলস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের স্বাধীনতা ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা নয় বছর ধরে হ্রাস পেয়েছে।

৩। চীন, ইরান, সৌদি আরব এবং ক্রমবর্ধমান অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষগুলি গত ২০১৭- ১৮ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে অনলাইন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে বিদেশী রাজনৈতিক ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করেছে।

৪। ফ্রিডম হাউসের গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে সরকারের স্বার্থবিরোধী মতামত দমনকারী সরকারগুলি সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি করার সরঞ্জামগুলি অর্জন করছে এবং ঐ মাধ্যমগুলিতে অনুভূত হুমকিগুলি সনাক্ত করতে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অভিব্যক্তি চুপ করাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিয়োগ করে।

৫। প্রতিবেদনে মূল্যায়ন করা ৬৫ টি দেশের মধ্যে ৪৭টি দেশের নথি অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় বক্তৃতার জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৬। যদিও চীন ও রাশিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদী শক্তি বৃহত্তর মানবাধিকার সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনাগুলিকে সীমিত রাখতে বিশাল ভূমিকা রেখেছে তবে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং অগনতান্ত্রিক বাহিনী দ্বারা মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে মার্কিন অবহেলার কারনে।

৭। বিভিন্ন দেশের সরকার অস্থায়ীভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বিঘ্নিত করেছে, এক ডজনেরও বেশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ ওয়েবসাইটগুলিকে অবরুদ্ধ করেছে, এবং সক্রিয় কর্মীদের নীরব করার জন্য এবং ডিজিটাল গতিবদ্ধতা রোধ করার জন্য সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলির সহজল্যতাকে সীমাবদ্ধ করেছে।

৮। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি কর্তৃক বিভিন্ন সময় অভিনেতা সাংবাদিক, সরকারী আমলা এবং রাজনৈতিকভাবে জড়িত ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সাইবার আক্রমন হয়েছে।এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারসাজিতে তা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

৯। জনগনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং প্রতিকূল তথ্যের বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করতে, সরকার স্বাধীন সংবাদ ওয়েবসাইটগুলি অবরুদ্ধ করে, মোবাইল নেটওয়ার্ককে সীমাবদ্ধ করে, এবং সাংবাদিক এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের একইভাবে গ্রেপ্তার করে।

১০। কোনও কারন বশত কোনও রাষ্ট্রে নাগরিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, কর্তৃপক্ষগুলি নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী সহিংস পদ্ধতিতে তা দমন করার চেষ্টা করেছে এবং সেই সঙ্গে যোগাযোগকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং সামাজিক মাধ্যমকে অবরুদ্ধ করেছে।

১১। সরকারী আধিকারিকরা ক্রমবর্ধমান সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলি পর্যবেক্ষণ করে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সমালোচনামূলক প্রতিবেদনের মতো সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ভ্রমণকারীদের বৈদ্যুতিন ডিভাইসের ওয়্যারলেস অনুসন্ধানও চালিয়ে থাকে।

১২। অল্প কিছু সংখ্যক দেশের কর্তৃপক্ষগুলি পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক আরোপিত জরুরি অবস্থা তুলে নিয়েছে, যা মুক্ত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনী বিধিনিষেধকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয় এবং অনলাইন ক্রিয়াকলাপের জন্য কারাবন্দী মানুষের সংখ্যা হ্রাস করেছে। অনলাইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে এবং ডিজিটাল নিউজ মিডিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ থেকে বৃহত্তর স্বাধীনতা উপভোগ করেছে।

১৩। আইসল্যান্ড ইন্টারনেটের স্বাধীনতার বিশ্বের সেরা রক্ষক হয়ে উঠেছে, ২০১৮-১৯ সাল সময়কালে অনলাইনে মত প্রকাশের জন্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি।

৪.৩.৬) জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি, ২০১৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নতুন টেলিযোগাযোগ নীতিটি এখন "জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি ২০১৮" (National Digital Communication Policy, 2018) নামে অনুমোদন করেছে এবং টেলিকম কমিশনকে 'ডিজিটাল যোগাযোগ কমিশন' হিসাবে পুনঃনির্ধারণ করেছে।

নতুন জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি -২০১৮ টেলিকম সেক্টরে আধুনিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেমন ৫ও, IoT ŒInternet of ThingsŠ – M2M Œ Mechine to MechineŠ ইত্যাদির চাহিদা পূরণে বিদ্যমান জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি -২০১২ প্রতিস্থাপন করবে।

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি প্রয়োজন:

১। টেলিযোগাযোগ এবং সফওয়্যার উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। ভারত উতাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মঞ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি অনাবিষ্কৃত ও নিম্নস্তরের বাজারগুলিতে পৌঁছানোর সুবিধার্থে প্রস্তুত রয়েছে। প্রযুক্তিগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিকাশ, নতুন যুগের কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্বাহ এবং তার নাগরিকদের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের পরিষেবাগুলিতে পৌচ্ছে দেওয়া নিশ্চিত করা।

২। সাক্ষরতা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং নগরায়ণের মতো বিভিন্ন সূচকে ভারতের জনসংখ্যার ধরন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। নীতিগুলি যে তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ বাড়ায় তা প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ। তদনুসারে, এই নীতিটির লক্ষ্যমাত্রা সর্বাধিককরণের পরিবর্তে সর্বজনীন কভারেজের জন্য।

৩। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যমগুলির দ্রুত এবং অভূতপূর্ব বিস্তার এবং ভারত জুড়ে ডিজিটাল পেমেন্ট, ডেটা ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ ইঙ্গিত দেয় যে একশ কোটির চেয়ে বেশী ভারতীয় জনসংখ্যার ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের কাছে ডেটা অর্থনীতি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং পরিষেবাগুলি আরও বেশি পরিমানে পৌচ্ছে দিতে হবে।

৪। এটি ব্যাপকভাবে অনুমান করা হয়েছে যে, দেশে ব্রডব্যান্ড অনুপ্রবেশে 10% বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে জিডিপিতে সম্ভাব্য 1% এরও বেশি বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। অতএব, ভারতের একটি সুষ্ঠূ প্রতিযোগিতামূলক টেলিকম বাজার তৈরি করার প্রয়োজন এবং একটি সুসংগত নীতি এবং নীতি কাঠামোর প্রয়োজন।

৫। সারাদেশে মোবাইল এবং ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রসারিত করার জন্য, ৫ও এবং উপগ্রহ যোগাযোগের মতো পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা উপস্থাপিত সুযোগগুলি অন্বেষণ এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৬। বিশ্ব যেমন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, ৫ জি, ক্লাউড, IoT এবং ডেটা অ্যানালিটিকাসহ বিপ্লবী প্রযুক্তির গুচ্ছের রূপান্তরিত করে, ভারতকেও তেমন এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

৭। যোগাযোগ ও ডিজিটাল অর্থনীতি খাত জুড়ে ভারতের সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা প্রচার ও সুরক্ষা করা দরকার।

৮। ডিজিটাল ক্ষেত্রটি মূলধন- বিনিয়োগের জন্য উত্তম। সেই কারনে এর প্রকৃতি নির্ধারন, নীতিটি নিয়ামক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াগুলির প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহি প্রয়োজন এবং আগামীর বিষয়টি নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদী, উচ্চমানের এবং টেকসই বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা।

৯। এছাড়াও, বর্তমান নীতিটি বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং ভোক্তার আগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বাধাগুলি হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়েছে। নীতিটি ডিজিটাল খাতটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং আইন কাঠামোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপগুলিও চিহ্নিত করে।

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতির বৈশিষ্ট্যঃ

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি তিনটি লক্ষ্যের উল্লেখ করেঃ ক। সংযুক্ত ভারত (Connect India), খ। প্রোপেল ভারত (Propel India), গ।সুরক্ষিত ভারত (Secure India)।

তিনটি লক্ষ্য সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল-

ক। সংযুক্ত ভারত (Connect India)ঃ শক্তিশালী ডিজিটাল যোগাযোগের অবকাঠামো তৈরি করা —

১। জাতীয় ব্রডব্যান্ড মিশন (রাষ্ট্রীয় ব্রডব্যান্ড প্রচার) - ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি নাগরিককে ৫০ এমবিপিএসে সর্বজনীন ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করুন।

২। ভারতনেট- ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ১ জিবিপিএস এবং ২০২২ সালের মধ্যে দশটি জিবিপিএস সংযোগ প্রদান।

৩। গ্রামনেট — ১০ এমবিপিএস আপগ্রেডযোগ্য ১০০ এমবিপিএসের সাথে সমস্ত মূল গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থাকে সংযুক্ত করা।

৪। নগরনেট - শহরাঞ্চলে ১ মিলিয়ন জন- ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন করা।

৫ ।জান ওয়াই-ফাই - গ্রামীণ অঞ্চলে ২ মিলিয়ন ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন।

৬। ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত মূল উন্নয়ন সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী ১০০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড সক্ষম করুন।

৭। সর্বাগ্র -ফাইবার উদ্যোগ ঃ ঘরে ঘরে, গ্রামীন উদ্যোগগুলিতে এবং মূল উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে ফাইবার সংযোগের মাধ্যমে উন্নতিসাধন।

৮ ।জাতীয় ফাইবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি জাতীয় ডিজিটাল গ্রিড প্রতিষ্ঠা।

৯। স্যাটকমের নীতি পর্যালোচনা করে, নতুন স্পেকট্রাম ব্যান্ড তৈরি করা, নিয়োগ ও বরাদ্দের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে সহজতরকরণ, উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ছাড়পত্র এবং অনুমতি ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতে স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রযুক্তি জোরদার করা।

১০। গ্রাহক সন্তুষ্টি, পরিষেবার গুণমান এবং কার্যকর অভিযোগ নিরসন নিশ্চিতকরণ টেলিকম ওম্বডসম্যান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, পরিবেশ ও সুরক্ষা মান গ্রহণের জন্য উতাহিত করার জন্য একটি বিস্তৃত নীতিমালা প্রণয়ন এবং যোগাযোগ খাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রযুক্তির ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধকরণ

খ। চালিকা ভারত (Propel India) ঃ বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং IPR প্রজন্মের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি ও পরিষেবাদি প্রদানে সক্ষম করা।

১। ডিজিটাল কমিউনিকেশনস সেক্টরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করন, জ্জন্ধ বাস্তুতন্ত্রকে ৫ বিলিয়ন সংযুক্ত ডিভাইসে প্রসারিত করুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রযুক্তিকে ৪.০.-তে রূপান্তর ত্বরান্বিত করন।

২। ডিজিটাল যোগাযোগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকারী স্টার্ট-আপগুলি তৈরী করা।

৩। ভারতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার (Intelectual Property Right) তৈরি করা।

৪। ডিজিটাল যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এসেনশিয়াল পেটেন্টস (এসইপি) এর বিকাশ।

৫। নতুন বয়স দক্ষতা তৈরির জন্য প্রশিক্ষন।

গ ।সুরক্ষিত ভারত (Secure India) ঃ সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা এবং ডিজিটাল যোগাযোগের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

১। ডিজিটাল যোগাযোগের জন্য একটি বিস্তৃত ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা গোপনীয়তা, স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তিদের নিজেস্ব পছন্দকে রক্ষা করে এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল অর্থনীতিতে ভারতের কার্যকর অংশগ্রহণকে সহায়তা করে।

২। ইন্টারনেট নিরপেক্ষতা নীতিগুলি পরিষেবা প্রয়োজনীয়তা, ব্যান্ডউইথ প্রাপ্যতা এবং পরবর্তী প্রজন্মের অ্যাক্সেস প্রযুক্তি সহ নেটওয়ার্কের ক্ষমতাগুলির সাথে সংযুক্তকরন নিশ্চিত করা।

৩। শক্তিশালী ডিজিটাল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্কগুলি বিকাশ এবং স্থাপন করা।

৪। সুরক্ষা পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা তৈরি এবং যথাযথ সুরক্ষা মান স্থাপন করা।

৫। এনক্রিপশন এবং সুরক্ষা ছাড়পত্র সম্পর্কিত সুরক্ষা - সমস্যাগুলি সমাধান করা।

৬। নাগরিকদের সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত ডিজিটাল যোগাযোগের অবকাঠামো এবং পরিষেবাদির আশ্বাস দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জবাবদিহি জোরদার করা।

৪.৩.৭) সারাংশ

ইন্টারনেটের ব্যবহার তথ্যের আদান প্রদানকে সহজসাধ্য করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। জুলিয়ান আসাঞ্জের দ্বারা তথ্য ফাঁস করার ঘটনা গোটা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে আমেরিকার মত শক্তিধর দেশের তথ্য সুরক্ষা প্রযুক্তি নিয়েও। আবার অন্যদিকে দেখলে দেখা যায় যে 'শক্তিধর রাস্ট্র যে সবসময় গন্তান্ত্রিক পথেই সব কাজ করে ' — সেই ধারনাটি ভুলও হতে পারে। সেদিক থেকে অনেকে মনে করেন যে সাধারন নিরপরাধ মানুষের পাশে আসাঞ্জের মতন মানুষেরও দরকার রয়েছে।

ইন্টারনেট একদিকে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে তেমনই স্বাধীনতার নামে হিংসা ছড়ানোর বড় মাধ্যম হবেও কাজ করে ইন্টারনেট। ভারত — পাকিস্তান বিরোধী হিংসা ফেসবুক ও টুইটারের নিত্য ঘটনা। পূর্বে রাজনৈতিক কার্টুন প্রকাশ পেতো সংবাদপত্রে,যারা প্রকাশ করতেন তাঁরা সংবাদ জগতের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে সাধারন ব্যাক্তিই মানহানী বা অন্যান্য আইনগুলি না যেনেই বিভিন্ন রাজনৈতিক 'মিম' তৈরী করছেন, এবং বিপদে পরছেন। নরেন্দ্র মোদী, রাহুল গান্ধী, কেজরীয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই বাদ যাচ্ছেন না ইন্টারনেট ট্রোল থেকে। সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'ফেক নিউজ' এর মতন মারাত্মক ঘটনাগুলিও। ফলে গোটা বিশ্বজুড়েই সাইবার সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতও তার থেকে বাদ নয়। অনলাইন টাকার আদান প্রদান থেকে শুরু করে তথ্যের আদান প্রদান সব ক্ষেত্রেই নতুন নীতির প্রয়োজন পরেছে।

৪.৩.৮) অনুশীলনী

১। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কে? ইউকিলিকসের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?

২। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র স্বার্থ কিভাবে পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়? উদাহরন সহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। " ডিজিটাল মাধ্যম ব্যাক্তির গোপন ঈর্ষা চরিতার্থ করার বিপজ্জনক স্বাধীনতা দেয়" — মন্তব্যটির যথার্থ ব্যাখা করুন।

৪। ব্যক্তিগত ট্রোলিং এবং ডিজিটাল ট্রোলিং এর পার্থক্য কি?

৫। "ডিজিটাল মাধ্যম ব্যাক্তিকে মত প্রকাশে স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু তা আদপে নির্ভর করে রাষ্টের ওপর"- ব্যাখা করুন।

৬। "জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি " উদ্দেশ্য গুলি কি? এই নীতির প্রয়োজনীয়তা কেন?

৭। ট্রোলিং কি?

৮। সাইবার বুলিং কি?

৯। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে "সুরক্ষিত ভারত" এর ধারনা টি কি?

৪.৩.৯) গ্রন্থপঞ্জী

Int. J. Web Based Communities– Vol. 10– No. 1– 2014

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies ŒIJIMSŠ– 2015– Vol 2– No. 7– 49-54

2015 DOI- 10.1089/cyber.2014.0670 Source- PubMed

http://www.rug/nl.research/portal.

https://www.freedomonthenet.org

http-//dot.gov.in/sites/default/files/EnglishPolicy